আসকার রচনাবলী

৪

আসকার রচনাবলী

৪

www.pathagar.com

ISBN : 984-455-028-9
শিপ্র ঃ ১৭৯ ঃ ১৯৯৩
আসকার রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড) সম্পাদনাঃ আবিদ আজাদ প্রকাশ ঃ ভাদ্র ১৪০০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ স্বত্ব ঃ লেখক। প্রকাশক শিল্পতরু প্রকাশনী ২৯১ সোনারগাঁও রোড, ঢাকা- ১২০৫, পোষ্ট বক্স নং ৫১১৮ ফোনঃ ৫০৮৩৫২, ৮৬৪২৬৪ মুদ্রণ ঃ শিল্পতরু প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড এ্যাডভার্টাইজার্স ২৯১ সোনারগাঁও রোড, ঢাকা- ১২০৫, পোষ্ট বক্স নং ৫১১৮ ফোনঃ ৫০৮৩৫২, ৮৬৪২৬৪ কম্পোজঃ দেলোয়ারা শাহজাহান, প্রচ্ছদ ঃ মৃণাল নন্দী
মূল্য ঃ ২০০ টাকা মাত্র।

ISBN : 984-455-028-9
SP : 179 : 1993
Askar Rachanabali (4th Vol) : Edited by Abid Azad Date of Publication : Bhadra 1400 / September 1993 Published by Shilpatoroo Prakashani 291 Sonargaon Road Dhaka 1205 Post Box No : 5118 Phone : 508352, 864264 Printed by Shilpatoroo Printers & Advertisers 291 Sonargaon Road Dhaka 1205 Post Box No : 5118 Phone : 508352, 864264 Copyright : Author Compose: Delowara Shahjahan Cover Design : Mrinal Nandi
Price : $ 10 Only

www.pathagar.com

আসকার রচনাবলী ৪

সম্পাদনা
আবিদ আজাদ

শিল্পতরু প্রকাশনী

www.pathagar.com

আসকার ইবনে শাইখকে প্রশ্ন করেছিলাম — আজকের দিনে সামাজিক নাটক থেকে অনেকটাই মুখ ফিরিয়ে আপনি ইতিহাসের প্রতি এত মনোযোগী হয়ে উঠলেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ "ইতিহাসের একটা অর্থ যদি 'প্রাচীন বা অতীতের কথা' হয়, তাহলে আজকের কথার সঙ্গে অতীতের কথার একটা যোগসূত্রকে অস্বীকার করা যায় না। আজকের সমাজের নানা সমস্যার কথা, বিশেষ করে আমাদের দেশে বিরাজমান সম্প্রদায়গত সম্পর্কের কথা, ভাবতে গিয়েই আমাকে অতীতের পানে তাকাতে হল। আমার জীবনের প্রথম অনেকটা অংশই কেটেছে হিন্দু সমাজের নিবিড় সাহচর্যে। তখনই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন আমার মনে জাগে। বৃদ্ধি পায় এ দেশের সামাজিক ইতিহাসের প্রতি আমার আগ্রহ। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে স্বনামখ্যাত ভারতীয় চিন্তাবিদ মানবেন্দ্রনাথ রায়-এর The Historical Role of Islam পুস্তিকাটি এবং আরও কয়েকজন প্রগতিশীল লেখকের বই-পত্র আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

তারপর কেটেছে বেশ কিছু সময়। জীবনের অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পরিণত বয়সে পা' রেখেছি। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ব্যাপারে রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, তাকে যতটা সম্ভব ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যাচাই করে দেখার চেষ্টা করেছি। তার সঙ্গে আরও জানার প্রয়োজন অনুভব করেছি। এর থেকেই প্রধানত আমার এই ইতিহাস মনস্কতা। তবে পারি যদি, তাহলে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার প্রতি সচেতন থেকে বর্তমানের একজন সাহিত্যকর্মী হিসাবেই আমি কাজ করে যাব বলে আশা রাখি।"

রচনাবলীর এই চতুর্থ খণ্ডে আসকার সাহেবের সন্ধানী মনকেই আঠার শ' সাতান্ন-আটান্ন'র 'সিপাহী অভ্যুত্থানের' মহা আয়োজনে সঞ্চরণশীল দেখতে পাই। তাঁর 'রক্তপদ্ম', 'অনেক তারার হাতছানি' নাটকে ও 'কালো রাত তারার ফুল' গল্পসমষ্টিতে এর প্রমাণ সুস্পষ্ট। এ সন্ধানী মন জন্মভূমির স্বাধীনতা কামনায় অধীর, এ মন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে মুক্তি-পিয়াসী, এ মন দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতাভিত্তিক ঐক্যে বিশ্বাসী।

এ রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত 'তাহ্‌মিনা' কাব্যনাটকে আসকার সাহেবকে আমরা অন্য এক চিন্তা-স্তরে উপনীত হতে দেখি। এ নাটকে তিনি এক যুদ্ধবিরোধী শিল্পী। মানুষের বীরত্ব-শক্তিকে যেসব স্বার্থবাদী রাষ্ট্রশক্তি নিজ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করে এই মাটির পৃথিবীকে নিঃস্ব করে দিতেও কুণ্ঠিত নয়, 'তাহ্‌মিনা' নাটকে আমরা তারই এক সর্বনাশা রূপ প্রত্যক্ষ করি। এ নাটকের মা তাহ্‌মিনা এই মাটির পৃথিবীরই প্রতীক। মহাবীর রুস্তম ও সোহ্‌রাব মানুষের দু'টি বীরত্ব-রূপ। দুই স্বার্থবাদী রাজশক্তি মানুষের এই বীরত্ব-শক্তিকে ধ্বংস করে মা তাহমিনাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। মা তাহ্‌মিনার চোখে ভেসে উঠেছে শুধু অসহায়া ফেটে-চৌচির মাটি! ..... অনুভব করতে পারি, আসকার সাহেবের মন বিষাদাক্রান্ত। তাই হয়তো পরবর্তীতে তাঁকে রূপকথা 'বাঁশী' রচনায় ব্যাপৃত দেখি।

ভাদ্র ১৪০০ আবিদ আজাদ

www.pathagar.com

উৎসর্গ

সেপ্টেম্বর ৪, ১৯৫৩ থেকে সেপ্টেম্বর ৪, ১৯৯৩
চল্লিশটি বছর সংগ্রামশীল বন্ধুর পথে চড়াই-উৎরাই পার হয়ে এলাম
যাঁর হাতে হাত রেখে, সেই জীবন-সাথী বেগম হাজেরা আখতার খাতুনের
নামে উৎসর্গীত হল 'আসকার রচনাবলী'র এই চতুর্থ খণ্ড

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

রক্তপদ্ম
(মঞ্চ নাটক)

রচনাকাল ঃ ১৯৫৭; প্রথম প্রকাশঃ চৈত্র ১৩৬৮; এপ্রিল ১৯৬১
প্রকাশক ঃ বাংলা একাডেমী; প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ কামরুল হাসান

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ বৈশাখ ১৩৭৬; মে ১৯৬৯

প্রকাশক ঃ সোসাইটি ফর পাকিস্তান ষ্টাডিজ, ঢাকা; মূল্য ১·৫০ টাকা

উৎসর্গ ঃ চলচ্চিত্র পরিচালক জনাব মহিউদ্দিন–কে

অনেক তারার হাতছানি
(মঞ্চ নাটক)

রচনাকাল ঃ ১৯৫৭; প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৫

প্রকাশক ঃ বাংলা একাডেমী; প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ আবদুর রউফ

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ জুন ১৯৮০; জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ; মূল্য ৬·০০ টাকা

কালো রাত তারার ফুল
(ঐতিহাসিক গল্পসমষ্টি)

রচনাকাল ঃ ১৯৫৭; প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ১৯৮২

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৪; জুলাই ১৯৮৭

প্রকাশনায়ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ সৈয়দ ইকবাল; মূল্য ঃ ২৩·০০ টাকা

তাহ্‌মিনা
(কাব্যনাটক)

রচনাকাল ঃ ১৯৫৯। মহাবীর রুস্তম ও সোহ্‌রাবের অমর কাহিনী ইরানের মহাকবি ফেরদৌসীর বিশ্বখ্যাত মহাকাব্য 'শাহ্‌নামা'র অন্যতম এক করুণ গাথা। আমাদের দেশে সুপরিচিত এ-কাহিনী নিয়ে ১৯৫৯ সালে রচনা করি 'সোহরাব-রুস্তম' কাব্যনাটক। ১৯৮৯-৯০ সালে 'শাহ্‌নামা' রচনার হাজার বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর 'সাপ্তাহিক অগ্রপথিক' বিশেষ সংখ্যায় সে-নাটক কিছুটা পরিবর্তিত আকারে 'তাহ্‌মিনা' শিরোনামে মহাকবির প্রতি আমার শ্রদ্ধার নিদর্শন রূপে প্রথম প্রকাশিত হয়।

গল্প শোন
ও
গান

রচনাকাল ঃ ১৯৫৭ থেকে ১৯৬০

বাঁশী
(রূপকথা)

রচনাকাল ঃ ১৯৬০

www.pathagar.com

সূচীপত্র

মঞ্চ নাটক

রক্তপদ্ম ৯

অনেক তারার হাতছানি ৬৬

কাব্যনাটক

তাহ্‌মিনা ২৫৮

ঐতিহাসিক গল্পসমষ্টি

কালো রাত তারার ফুল (১১৭) ঃ সংকেত ১৩২, মুহূর্তের ভুল ১৩৮, বিদ্রোহী বাংলাদেশ ১৪৪, একটি প্রাণ ১৪৮, এক বৃদ্ধ বিপ্লবী ১৫২, এক প্রিয় গুপ্তচর ১৫৭, বীরের কৌশল ১৬৬, বেগম হাসরত মহল ১৭১, নাম তার জানা নাই ১৭৮, উজনালার অন্ধকূপ ১৮৩, একজন বিদেশী ১৮৭, একটি জীবন-চরিত ১৯১, এক ছিল শাহ্‌যাদী ১৯৭, দীপক সন্ধ্যার রূপ–কাহিনী ২০৩, রক্তের ডাক ২১৮, পরিশিষ্ট ক, খ, গ / ২২৫, ২৩০, ২৩৯, গ্রন্থপঞ্জী ২৪৮

কবিতা

গল্প শোন ৩০৫

গান ৩০৯

রূপকথা

বাঁশী ৩১৩

আত্মজীবনী

আমার 'জীবন-কথা'র কিছু কথা ২৪৯

জীবন বৃত্তান্ত ৩২৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আঠার শ' সাতান্ন'র মুক্তি-সংগ্রাম আমাদের অতীতকে স্মরণীয় করেছে। সে সংগ্রামের আহবান ছিল এমনি বিস্তৃত, এমনি মন-মাতানো-যে তাতে সাড়া দিয়েছিল আমীর-বণিক, সেপাই- শ্রমিক, ছোট বড় সকল শ্রেণীর লোক। এমন কি আজিজনের মত সাধারণ নর্তকীও।

শতাব্দীরও আগে রাষ্ট্র-রূপের যে ধারণা তখন সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল, বর্তমানের চলতি ধারণার সঙ্গে তার পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। হয়তো সময়ের প্রভাবকে তার থেকে আলাদা করে শতাব্দীর দুই প্রান্তের দুই সংগ্রামী মনের পরিচয় নিলে দেখা যাবে, দুই মনে একই স্বপ্ন, একই সংগ্রাম-চেতনা।

দুই মনের পরিচয় হোক, 'রক্তপদ্ম' রচনার পেছনে এই উদ্দেশ্যই কাজ করেছে। সিপাহীরা লড়াই করেছিল। সম্পূর্ণ জয়ী হতে পারেনি। তবু তারা চেষ্টা করেছিল। 'রক্তপদ্ম'-এ অতীতের এই পরিচয়কে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি অন্ততঃ এই স্বীকৃতিই আমাকে আনন্দ দেবে।

আসকার ইবনে শাইখ

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

১৯৫৭ সালে রচিত "রক্তপদ্ম" প্রথমে প্রকাশিত হয় বাংলা একাডেমী থেকে, ১৩৬৮ সালের (১৯৬২ সন) চৈত্রমাসে। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই "রক্তপদ্ম"র পুনর্মদ্রণের প্রয়োনীয়তা দেখা দিলেও নানা কারণে তা' সম্ভব হয়ে ওঠেনি। শেষতক সে প্রয়োজন মেটানোর সাহায্যে যিনি এগিয়ে এলেন, তিনি আমার সহকর্মী সহৃদয় ডঃ হাসান জামান। বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্কে ঋণ-স্বীকারের কথাটা বেখাপ্পা লাগে বলেই সে দিকে আর গেলাম না।

"রক্তপদ্ম"র এটা ঠিক পুনর্মুদ্রণ নয়, দ্বিতীয় সংস্করণ। সংস্কার কিছুটা করেছি। সেটা ইংরেজ-চরিত্রের ডায়লগ "ইংরেজী-উর্দু মেশানো ভাঙ্গা বাংলা"র পরিবর্তে চলিত বাংলার রূপান্তরিত ক'রে।

এ-নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ইচ্ছার পেছনে আর একটা অনুপ্রেরণা কাজ করেছে। মনে হয়েছে, আমাদের দেশে নাটক যাঁরা মঞ্চস্থ করেন, তাঁদের প্রীতি থেকে আমি খুব বঞ্চিত নই। সেটাই বড় অনুপ্রেরণা, আমার মস্ত এক সম্বল।

চব্বিশে বৈশাখ, ১৩৭৬ সাল। বিনীত

আটই মে, ১৯৭০ সন। আসকার ইবনে শাইখ

www.pathagar.com

পরিচিতি

স্থান ঃ কানপুর

কাল ঃ আঠার শ' সাতান্ন

আজিমুল্লাহ খান	নানাসাহেবের মন্ত্রণাদাতা, বিপ্লবের অন্যতম নায়ক
রাকীব ও শামসুদ্দিন	কানপুরস্থিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজের সুবেদার
হুইলার	কানপুরস্থিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজের মেজর-জেনারেল
বিবার্ট	ঐ মেজর
শের খান	কানপুরের এক সর্বহারা রইস
কিলীচ খান	কোম্পানীর অনুগত এক রইস
আকবর	কোম্পানীর এক গুপ্তচর সিপাহী
ব্লেনম্যান	কোম্পানীর এক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সিপাহী
আজিজন	কানপুরের এক নর্তকী
বিব্বু	আজিজনের সহকারী

শের খানের ছেলে, সিপাহীগণ

www.pathagar.com

রক্তপদ্ম

।।প্রথম দৃশ্য।।

[কানপুরের রাস্তা। রাতের অন্ধকার। সিপাহীরা অবসর সময়টা উপভোগ করার জন্য এখানে ওখানে যাচ্ছে। শের খান আসে, সঙ্গে ছেলে। হাতে একটা বড় পোটলা, অন্য হাতে একটা ছোট পোটলা]

শের খান ঃ ভাই সিপাহী! শোন। (একজন সিপাহী দাঁড়ায়) নাও। আল্লা'র ওয়াস্তে দিলাম।

[ছোট পোটলাটা বাড়িয়ে দেয়]

সিপাহী ঃ কি এটা?

শের খান ঃ খুললেই বুঝতে পারবে।

[পোটলাটা খুলে দেখে সিপাহী]

সিপাহী ঃ চাপাতি আর রক্তপদ্ম!

[শের খানের মুখে রহস্যময় হাসি। সিপাহী অল্পক্ষণ ভেবে নিয়ে বলে ওঠে-]

ইনকিলাব!

শের খান ঃ ইনকিলাব। তোমার আমার দেশ আজ বেনিয়া কোম্পানীর করায়ত্ত। সময় এসেছে। বিদেশীকে তাড়াবার উপযুক্ত সময়। হ্যাঁ, জান তো, এই চাপাতি আর রক্তপদ্ম হাতে পেয়ে নিজের কাছে রাখা যায় না? বিলিয়ে দিতে হয় অন্যের কাছে?

সিপাহী ঃ জানি। (অদূরে পদশব্দ) ওই কারা আসছে!

[দু'জনেই ত্রস্ত পায়ে চলে যায়। আসে আকবর আর ব্লেনম্যান। ব্লেনম্যান কিছুটা মাতাল। আকবর ওদের গমন পথের দিকে সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে]

আকবর ঃ হুঁম্!

ব্লেনম্যান ঃ ওসব বাদ দাও। আজিজনের জলসায় চল।

[ওরা চলে যায়। একটু পরেই খুশী মনে আসে শামসুদ্দিন। হাতে ফুল। আজিজনের ঘরের দিকে চলতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায়। তারপর কি ভেবে নিয়ে বলে-]

শামসুদ্দিন ঃ নাহ্, আজ বলবই। লুকোচুরি নয়, শত কথার ইশারা নয়। খোলাখুলি, স্পষ্ট। আমি সুবেদার শামসুদ্দিন, যার হুকুমের অপেক্ষা রাখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক অশ্বারোহী বাহিনী।

www.pathagar.com

যার ঝিকিমিকি তলোয়ারের আস্ফালনে, লকলকে বর্শার ফলকে জীবনের উদ্দামতা গতিময় হয়ে ওঠে। আর তুমি? নাচওয়ালী আজিজন। সামান্য এক নারী। তোমাকে এই সহজ কথাটা বলতে পারব না যে, আজিজন— আমি তোমাকে ভালবাসি?—কিন্তু পারব তো? এখানেই যত মুস্কিল! দূর থেকে সব কিছু ঠিকঠাক, কিন্তু কাছে গেলেই কেমন করে সব যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। আচ্ছা, তুমিও তো বলতে পার যে তুমি আমাকে চাও! তাহলেই তো সব গোলমাল মিটে যায়! কিন্তু তোমরা নাকি সচরাচর তা বল না। নাহ্, এ হচ্ছে সেই চিন্তা, চিন্তা করে যার ইতি দেওয়া যায় না। এ মাকড়সার জাল। যতই এদিক ওদিক ঘুরবে, ততই জড়িয়ে পড়বে। তার চেয়ে কোন রকমে বলেই ফেলি, তারপর যা হয়।

[পা বাড়ায়। পেছন দিক দিয়ে ফকিরের ছদ্মবেশে রাকীব আসে]

রাকীব ঃ আল্লাহ্ মালিক!

শামসুদ্দিন ঃ কে?

রাকীব ঃ কিছু খয়রাত পাই বাবা?

শামসুদ্দিন ঃ কিন্তু বাবা তুমি-

রাকীব ঃ এক ফকির।

শামসুদ্দিন ঃ তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এ সময়টায়— মানে যখন আমি-

রাকীব ঃ হ্যাঁ, বিবি আজিজনের কাছে যাচ্ছ কিনা, তাই হাত পাতলাম। আল্লাহ্ মনোবাঞ্ছা পুরা করবেন।

শামসুদ্দিন ঃ বাবাকে যেন বেশ গুণী লোক বলে মনে হচ্ছে!

রাকীব ঃ কিছুটা জ্যোতিষী জানা আছে কিনা, তাই-

শামসুদ্দিন ঃ হুঁম্, বুঝতে পেরেছি। এই নাও। (টাকা দেয়) কিন্তু একটা কথা বলতে পার? ওই আজিজনের মনের অবস্থাটা কেমন?

রাকীব ঃ হুঁম্। (ভেবেনিয়ে) গুমোট মেরে আছে। মনের আকাশে কিছু কিছু মেঘ।

শামসুদ্দিন ঃ মেঘ! ঝড়ো মেঘ বাবা?

রাকীব ঃ না, হাওয়ার কিছুটা জোর পেলেই উড়ে যাবে।

শামসুদ্দিন ঃ হাওয়া! তা শুধু হাওয়া কেন, বুকের মাঝে ঝড়ই বইছে। কিন্তু তার প্রবাহটা ওদিকে ফেরানোই যে মুস্কিল!

রাকীব ঃ মুস্কিল আসান করার চেষ্টা অবিশ্যি করা যায়।

www.pathagar.com

শামসুদ্দিন ঃ তাবিজ কবচ দিয়ে? না বাবা, এই তাবিজী প্রেম আমার মন ভরে দেবে না, শুধু কাতুকুতু দেবে।

রাকীব ঃ বড় ভাল, বড় ভাল ছেলে। তা এতটুকু বুদ্ধি নিয়ে তুমি বাবা এই নাচওয়ালীর দুয়ারে কেন?

শামসুদ্দিন ঃ এই কেন'র উত্তর নাকি দুনিয়ায় কেউ দিতে পারে না।

রাকীব ঃ বুঝেছি বাবাজী, সাধ করে ফাঁদে ঠেকেছ।

শামসুদ্দিন ঃ আর খাদেও কিছুটা পড়েছি, বলতে পার।

রাকীব ঃ কিন্তু তুমি শরীফ খান্দানের ছেলে, বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। নাচওয়ালী আজিজনকে তুমি– মানে সমাজ, সংসার–

শামসুদ্দিন ঃ বর্তমানে মিছে সব। প্রথম প্রথম ভাবলে না হয়–

রাকীব ঃ (রহস্যভরা কণ্ঠে) সময়টাও যে অন্য রকম! সনটা হল আঠার শ' সাতান্ন। স্থানটি কানপুর। হ্যাঁ, এখানেও বিপ্লব হবে, সিপাহীরা জিতবে, বেনিয়া কোম্পানী হেরে যাবে। হ্যাঁ, তুমিও সে বিপ্লবে যোগ দিচ্ছ। সুবেদার শামসুদ্দিন– স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

শামসুদ্দিন ঃ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ? আমি বুঝি আজিজনকে ফেলে ওসব গোলমালে মেতে গেছি?

[চোখ বন্ধ করে রাকীব বলে–]

রাকীব ঃ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি, তোমার চোখেমুখে দেশপ্রেমের এক অপূর্ব মাধুরী! তোমার হাজারো দুঃখী মা বোন, তোমার লাঞ্ছিত দেশ, তাদের মিলিত দাবী এক আজিজনের দাবীকে তলিয়ে দিয়েছে!

শামসুদ্দিন ঃ শুনছ বাবা, ধ্যানটা তোমার ভেঙ্গে ফেল। আর স্পষ্ট দেখতে হবে না। আমি ওসবের মধ্যে নেই। তার চেয়ে স্পষ্ট দেখতে চেষ্টা কর, সুবেদার শামসুদ্দিন আর আজিজন দুজনে মিলে–

[অদূরে গান শোনা যায়]

গানঃ কোথায় তুমি সুপ্তিমগন
আলোর লগন এল।
রাতের পাখী জাগল নীড়ে
আঁখি তোমার খোল।।

[আবহাওয়াটা থমথমে হয়ে যায়]

রাকীব ঃ শুনতে পাচ্ছ নওজোয়ান! ভবিষ্যদ্বাণী আছে। পলাশীর সেই প্রহসনের ঠিক এক শ' বছর পর কোম্পানী–রাজত্বের অবসান

www.pathagar.com

হবে। এক শ' বছর পর এসেছে আঠার শ' সাতান্ন। তাই আজ দিকে দিকে সাতান্ন'র আহবান!

শামসুদ্দিন ঃ এ আহবান শোনার সময় আমার নেই। আমি চললাম!

রাকীব ঃ কোথায়?

শামসুদ্দিন ঃ আজিজনের ঘরে।

রাকীব ঃ কিন্তু আমি ঠিক জানি, কোম্পানীর জুলুমের ইতিহাস তোমাকে চঞ্চল করে তুলবে, লাঞ্ছিতা দেশের ডাক তোমাকে পাগল করে দেবে। ছুটে আসবে তুমি আজিজনের ঘর থেকে, ঝাঁপিয়ে পড়বে মুক্তি সংগ্রামে।

শামসুদ্দিন ঃ না না, তা হয় না!

[চলে যেতে পা বাড়ায় আজিজনের ঘরের দিকে। কিন্তু থেমে যায়। তারপর কি ভেবে নিয়ে বিরক্ত কণ্ঠে বলে–]

তুমি যাও।

রাকীব ঃ যদি আরও কথা জানতে চাও, আমাকে খুঁজে পাবে এ পথেই, রাত্রি শেষে।

[গান ভেসে আসছে। শামসুদ্দিন বিরক্ত। রাকীব ফিরে চলে। শামসুদ্দিন কি করবে ভেবে না পেয়ে আজিজনের ঘরে যেতে গিয়েও সেখানে না গিয়ে অন্য দিকে চলে যায়। রাকীব যেতে যেতে দাঁড়ায়। শামসুদ্দিনকে অন্য দিকে যেতে দেখে হাসতে থাকে। রহস্য ভরা হাসি]

।।দ্বিতীয় দৃশ্য।।

[আজিজনের ঘরের অঙ্গন। রাত হয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ব্লেনম্যান ও আকবর]

ব্লেনম্যান ঃ না না, আমি আর এখানে থাকতে চাই না। সারাটা দিন কুচকাওয়াজ, বন্দুক— কুচকাওয়াজ, বন্দুক। শুধু রাতটাই আমাদের জীবনে যা কিছু খুশহাল নিয়ে আসে। তাই তো এই নাচওয়ালীর জলসায় আসা। বিবি আজিজন নাচবে, গাইবে। দিলখুশ রাগরঙ্গে রঙ্গীন হয়ে উঠবে আজিজনের এ ঘর, সিপাহীদের এ জলসা। কিন্তু আজিজন নাচে না, গায় না। ভাল করে কথাটি পর্যন্ত কয় না। বিবুবুর ঢং দেখতে এখানে আসি নি। আমি চললাম আকবর।

(পা বাড়ায়। আকবর তাকে ধরে)

www.pathagar.com

আকবর ঃ আহা! রাগ করছ কেন ব্লেনম্যান? দিলখুশ রাগরঙ্গের স্বপ্ন দেখা ভাল। কিন্তু স্বপ্নটা যে রইস লোকদের! তোমার আমার জলসায় তা থাকবে কেন?

ব্লেনম্যান ঃ কেন থাকবে না? কোম্পানী সব কিছুরই বন্দোবস্ত করছে, আর একটু ভাল করে করলেই হয়ে যায়।

আকবর ঃ কিন্তু কেন ভুলে যাও, শুধু নাচগানের জন্যই আমরা এখানে আসি নি?

ব্লেনম্যান ঃ হ্যাঁ, এসেছি তো সাহেবদের কাজেই! তাই তো সব রকম বন্দোবস্ত করে রাখা উচিত। লড়াই হবেই। আমরা থাকব সাহেবদের পাশে। আমিও তো সাহেব।

আকবর ঃ এক শ' বার। কালো হলেও তুমি সাহেব। আমাদের ব্লেনম্যান সাহেব। আমাদের সাদা রাজার জাত, কালো মানিক।

ব্লেনম্যান ঃ লেকিন আমি সবার সঙ্গে মিশি। কাউকে ঘেন্না করি না। ওরা করে। সব সিপাহী ঘেন্না করে আমাকে। বলে, আমি দোঁ-আসলা।

আকবর ঃ কিন্তু আমি তো বলি না।

ব্লেনম্যান ঃ না, তুমি যে আমার দোস্ত্ আকবর। কিন্তু ওদের ঘেন্নায় মেজাজটা আমার গরম হয়ে ওঠে। ভাবি, সবাইকে শেষ করে দিই। কিন্তু আমার মা ছিল এ দেশেরই মেয়ে। তাই সবটুকু রাগ নিভে যায়। হাজার হোক, আমার মায়ের দেশ, আমার মায়ের দেশবাসী। ওরা বোঝে না, কিন্তু আমি তো কিছু কিছু বুঝি!—কি আশ্চর্য আকবর! এদেশ আমার মায়ের ভূমি— অথচ আমার যেন মাতৃভূমি নয়। আমি যে আমার মাতৃভূমিকে ভালবাসতে পারি, দোঁ-আসলা বলে সিপাহীরা তাও বিশ্বাস করতে চায় না। এ্যাঁ, তুমি হাসছ দোস্ত্? হাস। আমিও হাসি। কিছুক্ষণ শুধু এসব কথা ভাবি। তারপরই হেসে উঠি।—এই দেখ না, কিছুক্ষণ ঠান্ডা থেকেই আবার দিলটা চাঙ্গা হয়ে উঠল।

আকবর ঃ হবারই কথা। একটু বেশি টেনেছ, তাই কথার সঙ্গে দিলটাও একটু রাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

ব্লেনম্যান ঃ হ্যাঁ আকবর, আমারও তাই মনে হয়। বাইরে রাতের আঁধি, অথচ আমার মালুম হচ্ছে— সব কিছু রাঙ্গা।

আকবর ঃ তাই বলছি বিব্বুর নাচই দেখ। তোমার চাঙ্গা মনের রাঙ্গা আগুন নেভানোর জন্য যাকে পাবে, সেই ওই বিব্বু, আজিজন নয়। বস এখানে।

www.pathagar.com

[একজন সিপাহী এসে হেসে ভিতরে যায়। আকবর তার সাথে হাসি বিনিময় করে]

ব্লেনম্যান ঃ ভেবে দেখলাম আকবর, এ, দুনিয়াটা এক সরাইখানা। কোন কিছুই কিছু নয়।

আকবর ঃ সাচ্ বাত। এই তো এলেমদারের মত কথা বলছ পেয়ারে!

ব্লেনম্যান ঃ হ্যাঁ, মাঝে মাঝে বলি। কিন্তু কেউ শোনে না। সবাইকে পেয়েছে সাহেব তাড়ানোর নেশায়। লেকিন, আমরা সাহেবদের সঙ্গে আছি। কি করব, আমার বাবার জাত!

আকবর ঃ চুপ, কেউ শুনবে।

ব্লেনম্যান ঃ না, শুনবে না। আমার তো ভাই লড়াই ভাল লাগে না। আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায় জরিদার ঘাগড়া, তারা ঝিকমিক ওড়না, শীষমহল—কিন্তু আজিজনের দিলে কি মুহব্বত নেই?

আকবর ঃ আছে। তবে তা তোমার জন্য নয়। সেই মুহব্বত যে লুঠতে পারে, তার নাম শামসুদ্দিন।

ব্লেনম্যান ঃ আকবর! ওই নাম বলো না। দিল বেকারার হয়ে যায়। লেকিন শামসুদ্দিন আমারই মত সিপাহী। সে ওসব করবে, আমি তা সহ্য করব না।

আকবর ঃ কিন্তু তোমার পা টলছে যে!

ব্লেনম্যান ঃ টলুক। মুখে বলব। শামসুদ্দিন আমার চেয়ে বড় কিসে? হিম্মত? আমারও আছে। কিম্মত? আমারও আছে। রূপাইয়া?

আকবর ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, সবই তোমার আছে। শুধু একটি জিনিষ নেই।

ব্লেনম্যান ঃ সেটা কি?

আকবর ঃ আয়না। ওটা থাকলে দেখতে পেতে, কি তোমার নেই।

ব্লেনম্যান ঃ নিজের চেহারায় যেদিন ওটা নেই বুঝতে পারব, সেদিন তো আমার শেষ! তাছাড়া আয়নাতে বাইরের চেহারাটা ধরা পড়ে, ভেতরের চেহারা তো ধরা পড়ে না ভাই!

আকবর ঃ আমাদের ভেতরের চেহারা যে কি, সিপাহীদের হাতে ধরা পড়লে তাও ধরা পড়বে। আর কথা বলো না।

[কয়েকজন সিপাহী ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে]

কি দোস্ত, আজ আর নাচ গান হবে না?

সিপাহী ঃ হবে। ওরা এখানেই আসছে।

www.pathagar.com

ব্লেনম্যান ঃ তাই নাকি? এ বারান্দায়? তা-ই ভাল। চাঁদনী রাত মোহিনী হয়ে দেখা দিক।

আকবর ঃ তা দিক, কিন্তু রাতটা চাঁদনী মোটেই নয়। ওই দেখ, আসমানে কালো মেঘ।

ব্লেনম্যান ঃ থাক না মেঘ---এই যে ওরা আসছে।

সকলে ঃ আজিজন, বিবি আজিজন!

[আজিজন নেমে আসে। আসে বিব্‌বু। চাকর এসে বাদ্যযন্ত্র দিয়ে যায়]

আকবর ঃ বিবি আজিজনের হাসি ছাড়া কানপুরের রাতের আঁধি কাটে না।

[হেসে ওঠে আজিজন]

আজিজন ঃ বহুত শোকরিয়া।

আকবর ঃ আর পাপিয়ার পিউ পিউ বোল ছাড়া চ্যমনের নীরবতাও ভাঙবার কথা নয় আজিজন!

ব্লেনম্যান ঃ লেকিন আকবর, আমাকে বলতে দাও।

[নাচ আরম্ভ করে বিব্‌বু। সবাই হেসে ওঠে। আজিজন সেতার বাজায়। সিপাহীরা আনন্দে মত্ত। সবার দিকেই চেয়ে আজিজন নিঃশব্দে হাসে। সিপাহীরা কৃতার্থ হয়]

সকলে ঃ বহুত আচ্ছা আজিজন। বহুত আচ্ছা বিব্‌বু।

(শামসুদ্দিন এসে অদূরে দাঁড়ায়। কেউ তাকে দেখতে পায় নি। ক্রমে তার চিন্তা কেটে গিয়ে মুখে নামে হিংসামাখা ক্রোধ। কতক্ষণ পর শামসুদ্দিন চীৎকার করে ওঠে-)

শামসুদ্দিন ঃ আজিজন!

[নাচ থেমে যায়। সবাই চুপচাপ। কিছুটা বিরক্ত]

আকবর ঃ শামসুদ্দিন যে! এত দেরী কেন দোস্ত্?

ব্লেনম্যান ঃ উঁ! দেরী কোথায়? এই তো মাত্র জমেছিল? কিন্তু হঠাৎ এমন চীৎকার --- কেমন যেন বেসুরো বাজল?

শামসুদ্দিন ঃ (আকবরকে) হ্যাঁ, আমার কিছুটা দেরীই হয়েছে আকবর।

ব্লেনম্যান ঃ কিন্তু এমন মেজাজ দেখানোর কোন মানে হয় না। বিবি আজিজনের জলসায় সবাই আসতে পারে। কারও একার জন্য—

শামসুদ্দিন ঃ ব্লেনম্যান!!

আকবর ঃ চল ব্লেনম্যান। বাইরে চল। আসি দোস্ত্।

শামসুদ্দিন ঃ আমার কিছুটা ভুলই হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

আকবর ঃ না না দোস্ত্। আমরা সিপাহী। আমাদের মেজাজের কি কোন মাথামুণ্ডু আছে? চল ব্লেনম্যান।

ব্লেনম্যান ঃ না না, আমি যাব না। কেন যাব? আমরা পয়সা দিই না? আমাদের সবার জন্যই আজিজন!

আকবর ঃ তা হোক···তবু চল।

ব্লেনম্যান ঃ না না, আমি যাব না।

[আকবর তাকে টেনে নিয়ে চলে যায়। অন্যান্য সিপাহীরাও তাদের অনুসরণ করে। বিবৃবু ঘরে যায়]

শামসুদ্দিন ঃ আজিজন! তুমিও বলবে না, আমি ভুল করেছি?

আজিজন ঃ তোমরা যদি এখানে এমনি ভুল করেই ফেল, আমার তেমন বলবার কি আছে শামসুদ্দিন?

শামসুদ্দিন ঃ ও! এমনি ভুল তোমাকে সহ্য করতেই হয়, এই-ই তুমি বলতে চাও?

আজিজন ঃ তুমি কি আশা কর, আমি আরও কিছু বলতে পারি?

শামসুদ্দিন ঃ এমন অবস্থায় আমার এমনি ভুল তোমার যখন প্রত্যাশিত নয়, তখন আমার আশাও আর এগোয় কি করে বল?

আজিজন ঃ সেতার শুনবে?

শামসুদ্দিন ঃ বাজাও।

[আজিজন সেতারে ঝংকার তোলে। কিন্তু কেমন যেন বেসুরো]

থাক আজিজন, আজ আর পারবে না তুমি।

আজিজন ঃ তোমার আজ কি হয়েছে বল তো?

শামসুদ্দিন ঃ একটু আগে যখন আসছিলাম এখানে, মনের পাখী তখন নীড়ের স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু তারপরই সে স্বপ্ন ভেংগে দিয়ে ভুলই হয়তো করেছি। এখন আর তোমার সেতার ঠিক সুরে বাজবে না।

আজিজন ঃ ভুল শামসুদ্দিন। সবাই এখানে টাকা খরচ করে। আমি তাদের খুশী করতে চেষ্টা করি। কিন্তু তোমার বেলায়-

শামসুদ্দিন ঃ বল। বলতে বলতে থামলে কেন?

আজিজন ঃ অনর্গল কথা বলার সাহস কি আমার আছে? না, থাকা উচিত? কথা তো বলবে তুমি, আমি শুনব।

শামসুদ্দিন ঃ বলতে আজ চেয়েছিলাম। কিন্তু যখন আসছি এখানে, এক

www.pathagar.com

ফকীর এসে কি সব বলে গেল।··· জান আজিজন, মানুষ স্বস্তি চায়, শান্তি চায়। প্রিয়জনকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায়। কিন্তু রাকীব টিকা সিং ওরা বলছে···আচ্ছা আজিজন, দেশের যা অবস্থা, তাতে তোমার কি মনে হয়?

আজিজন ঃ আমার আবার কি মনে হবে? তবে কথা যা বলছ, সবই খাপছাড়া!

শামসুদ্দিন ঃ কিন্তু আমার কি হল আজিজন?

আজিজন ঃ এমনভাবে কথা বলছ, যেন আমি তোমার মনের সব খবরই রাখি।

শামসুদ্দিন ঃ রাখাই তো উচিত তোমার।

আজিজন ঃ কিন্তু সব খবর রাখা কি আমার পক্ষে সম্ভব?

[বাইরে থেকে গান ভেসে আসে। শামসুদ্দিন উৎকর্ণ হয়ে শোনে]

গান ঃ কোথায় তুমি সুপ্তিমগন—
আলোর লগন এল।
রাতের পাখী জাগল নীড়ে
আঁখি তোমার খোল।।

আজিজন ঃ কি শুনছ শামসুদ্দিন?

শামসুদ্দিন ঃ না, ও কিছু না?···আজিজন! আমার সবকিছু যেন এলোমেলো হয়ে গেল।

আজিজন ঃ কিন্তু কেন?

শামসুদ্দিন ঃ জান আজিজন, রাকীব টিকা সিং ওরা বলে— মানে ওরা পেয়ারের লোক কিনা, তাই বলে— অবিশ্যি ঠাট্টা করেই বলে–

আজিজন ঃ কি বলে?

শামসুদ্দিন ঃ তেমন কিছু না। বলে, এখানে নাচ দেখে, গান শুনেই অনেকটা সময় কাটিয়ে দিই, তাতেই ওরা মনে করে–

আজিজন ঃ কি মনে করে?

শামসুদ্দিন ঃ না, মানে তেমন কিছু মনে করে না। আর ধর, মনে যদি কিছু করেই— বাহ্, মানুষ একা একা কতক্ষণ কথা বলতে পারে? তুমি যে বেশি কথা বলছ না?

আজিজন ঃ আমি তোমার কথা বুঝতেই পারছি না যে!

www.pathagar.com

শামসুদ্দিন ঃ না বোঝবার কি আছে? ওরা মানে— আমাদের— থাক। অনেক রাত হল। তুমি বরং ঘুমুতে যাও, আমিও ঘাঁটিতে যাই।

আজিজন ঃ বাদলা রাতে মানুষ ঘুমায় বুঝি?

শামসুদ্দিন ঃ তবে?

আজিজন ঃ জেগে জেগে কথা কয়।

[শামসুদ্দিন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে]

শামসুদ্দিন ঃ এই তো তুমি কথা বলছ। আরও বল আজিজন।

আজিজন ঃ এ জীবন আমার আর ভাল লাগে না। অন্যের মন খুশী করতে আমাকে নাচতে হবে, গাইতে হবে। আমি যেন শুধুই একটা যন্ত্র!

শামসুদ্দিন ঃ আজ ওদের জলসায় তুমি দেখা দিলে কেন?

আজিজন ঃ তুমি আসবে বলে।

শামসুদ্দিন ঃ বল। ... আবার থামলে? আচ্ছা, বলতে বলতে তুমি থাম কেন?

আজিজন ঃ দম নিতে হয় না বুঝি?

শামসুদ্দিন ঃ তাতে আমার দম যে আটকে আসে।

আজিজন ঃ এখানকার আবহাওয়া এত মারাত্মক?

শামসুদ্দিন ঃ তুমি আমার কথা কিছুই বুঝতে পার না?

আজিজন ঃ বুঝিয়ে না বললে কি করে বুঝব, বল।

শামসুদ্দিন ঃ আমার কপাল। অথচ সব পরিকল্পনা প্রস্তুত, মন তৈরী, বক্তব্য ঠিকঠাক। কিন্তু পথেই লাগল গোলমাল। এখানে এসে তা পাকা হল। এখন কথা সব ছাড়াছাড়া, ভাবনা এলোমেলো— এ্যাঁ! তুমি হাসছ?

আজিজন ঃ বাঃ, আমি তো এমনি হাসছি।...কিন্তু সুবেদার সাহেব, লড়াই করতে গিয়ে যদি এমনি এলোমেলো ভাবনা সব আসে-

শামসুদ্দিন ঃ আজিজন! তুমিও লড়া'য়ের কথা বলছ?

আজিজন ঃ কেন, তাতে কি হয়েছে শামসুদ্দিন?

[বাইরে গান শোনা যায়]

গান ঃ কোথায় তুমি সুপ্তিমগন—
আলোর লগন এল।
রাতের পাখী জাগল নীড়ে
আঁখি তোমার খোল।।
গান শুনবে?

www.pathagar.com

শামসুদ্দিন ঃ শুনব। এমন গান, কথায় আর সুরে যার তলিয়ে যায় পথের ওই কথা আর সুর!

আজিজন ঃ এ বছরটা যেন কি এক রহস্যে ভরে আছে!

শামসুদ্দিন ঃ তা-ই। আঠার শ' সাতান্ন সাল-

[আকাশে বিদ্যুৎ ও মেঘ-গর্জন]

আজিজন ঃ বাইরে দুর্যোগ।

শামসুদ্দিন ঃ ঘরে চল।

[বাইরে গান]

গান ঃ মেঘে মেঘে আকাশ ছাওয়া
ঝড় বুঝি ওই আসে।
প্রাণে প্রাণে নতুন চাওয়া
ঝড় বুঝি ওই আসে।
নতুন দিনের সূর্য ওঠার
এবার সময় হোল।।

[আজিজন ঘরের ভিতর যেতে থাকে। শামসুদ্দিন চলতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গান শোনে উৎকর্ণ হয়ে। আজিজন সিঁড়ি থেকে ফিরে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে দিয়ে আহ্বান জানায়—]

এস।

[শামসুদ্দিন ঘরের দিকে পা বাড়ায়]

।।তৃতীয় দৃশ্য।।

[কানপুরের একটি রাস্তা। দূরে মসজিদের গম্বুজ দেখা যায় একটু। শেষ রাত। রাতের অন্ধকারে পথ চলেছেন আজিমুল্লাহ্ খান। তাঁর সঙ্গে রাকীব। নিজেদের মধ্যে যে আলোচনা হচ্ছে, তা যাতে কেউ না শোনে, তার জন্য দু'জনই সতর্ক]

আজিমুল্লাহ্ ঃ শুধু ব্যারাকপুর কেন, চট্টল থেকে পেশোয়ার— বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে আরম্ভ হবে এক প্রচণ্ড ঝড়, এই ছিল আমাদের পরিকল্পনা। তার প্রস্তুতিও চলে আসছিল সারা দেশ জুড়ে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের বেশ আগেই মঙ্গল পাঁড়ের অসংযত আবেগ আর উত্তেজনায় ব্যারাকপুরে তার সূচনা হয়ে গেল। অতর্কিতে বেনিয়া কোম্পানীকে ঝড়ের মাঝে পড়তে হত। কিন্তু ব্যারাকপুরের ঘটনায় তা আর হয়ে উঠল না। এদিকে প্রস্তুতিও আমাদের

www.pathagar.com

সুসম্পন্ন হয় নি। তবু পরিকল্পিত পথে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে রাকীব।

রাকীব ঃ এখানকার পরিকল্পিত কাজ সম্পন্ন হবে বলেই আশা রাখি। কিন্তু ভাবছি–

আজিমুল্লাহ্ ঃ কি ভাবছ রাকীব?

রাকীব ঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শৃংখলা আর উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে আমাদের। এদিকে দেশের সর্বত্র আমাদের প্রাথমিক প্রস্তুতিও শেষ হল না। অথচ এখনই সতর্ক কোম্পানীকে আঘাত করতে হবে। তাই ভাবছি–

আজিমুল্লাহ্ ঃ কি হবে, তা ভাববার সুযোগ আর নেই এখন। আমাদের মকসুদ যাতে হাসিল হয়, তা-ই করতে হবে প্রাণ পণ করে। এদেশীয় সিপাহী ছাড়া কোম্পানীর যে শক্তি, তাতে আমাদের জয় হবেই। ওদিকে ইংরেজ–শক্তি দুনিয়ার বিভিন্ন রণাঙ্গনে ব্যস্ত। তাছাড়াও লণ্ডন থেকে ফেরার পথে বলকান রণাঙ্গনে আমি ইংরেজ–শক্তি সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। এদেশ থেকে কোম্পানী-রাজকে উৎখাত করার এই–ই উপযুক্ত সময়।

রাকীব ঃ নানাসাহেব শেষতক আমাদের সাথে থাকবেন কি না–

আজিমুল্লাহ্ ঃ থাকতে হবেই তাঁকে। স্বার্থে তাঁর আঘাত লেগেছে রাকীব। কোম্পানীকে তিনি ক্ষমা করতে পারবেন না। তাছাড়া আমি তাঁর সঙ্গে রয়েছি। এসব ভেবে আমাদের কোন ফায়দা হবে না। আল্লাহ্‌কে স্মরণ রেখে আমরা কাজ করে যাব। সময়ের ডাক এসেছে, সাড়া দেব। আল্লাহ্ আমাদের মকসুদ পুরা করবেন। তোমাদের অন্যান্য খবর কি?

রাকীব ঃ সুবেদার টিকা সিং রাতদিন কাজ করে যাচ্ছেন।

আজিমুল্লাহ্ ঃ আর শামসুদ্দিন?

রাকীব ঃ (সসংকোচে) তরুণ সিপাহী– জীবনের নানা সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে।

আজিমুল্লাহ্ ঃ তবে কি এখানকার কার্য–পরিষদে তাকে আমরা পাব না?

রাকীব ঃ পাব জনাব। তবে এখনো জড়তা কাটিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছে না।

আজিমুল্লাহ্ ঃ তাকে বুঝিয়ে বল, আজ আমাদের অন্য সমস্যা থাকতে পারে না। থাকা উচিত নয়।

www.pathagar.com

রাকীব : শের খান খুবই প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু একটু পাগলাটে। তাই ভয় হয়–

আজিমুল্লাহ্ : শের খান কে?

রাকীব : কানপুরের এক সর্বহারা রইস।

আজিমুল্লাহ্ : আমাদের কোন পরিকল্পনা তাকে জানতে দিও না। আচ্ছা, আমি এখন আসি। ভোরও হয়ে এল। কাজে যাও।

[চলে যান। আধো অন্ধকারে শামসুদ্দিন এসে দাঁড়ায়]

রাকীব : শামসুদ্দিন!

শামসুদ্দিন : ইনি কে গেলেন?

রাকীব : আসন্ন বিপ্লবের অন্যতম নায়ক আজিমুল্লাহ্ খান। দুন্দুপন্থ নানাসাহেবের মন্ত্রণাদাতা। এই নাও শামসুদ্দিন।

[কাপড়ের একটা পুটলী দেয়]

শামসুদ্দিন : কি এটা?

রাকীব : খুললেই বুঝতে পারবে। আল্লা'র ওয়াস্তে দিলাম। খুব সাবধান।

শামসুদ্দিন : কিন্তু··· মানে, তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলার ছিল ভাই।

রাকীব : একটু পরে এখানেই আমাকে পাবে। জরুরী কাজে এখনই আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হচ্ছে।

শামসুদ্দিন : কিন্তু– এক ফকির তখন বললে এখানে আসতে।

রাকীব : কিন্তু তার দেখা পাচ্ছ না, এই তো? (হাসে) পাবে, দেখা অবশ্যই পাবে।

[চলে যায়। শামসুদ্দিন খুলে দেখে– পুটলী রক্তপদ্ম আর চাপাতি]

শামসুদ্দিন : চাপাতি আর রক্তপদ্ম!···ইনকিলাব।

[তাড়াতাড়ি ওগুলো বেঁধে নিয়ে অন্য পথে চলে যায়। তখন ভোর হয়ে এসেছে প্রায়। মসজিদ থেকে ভেসে আসছে আযান। সন্তর্পণে চিনকিলীচ খান এসে রাস্তার এক পাশে গাছের আড়ালে দাঁড়ায়। ভোরে বেড়াতে বেরিয়েছে মেজর বিবার্ট। আনমনে শিষ দিতে দিতে পথ চলে সে। হঠাৎ গাছের আড়ালে একজন মানুষ দেখেই পিস্তল বাগিয়ে ধরে]

বিবার্ট : Who's there ? কে ওখানে?

[কৃতার্থ ও অপ্রস্তুতের হাসি হাসে কিলীচ খান]

কিলীচ : আমি, বিবার্ট সাহেব, আমি– মানে আপনাদের কিলীচ, চিনকিলীচ খান।

www.pathagar.com

বিবার্ট ঃ ও, সেই বোকা কালা আদমী। এই রাস্তার ধারে চোরের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছ?

কিলীচ ঃ আস্তে সাহেব— মানে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছি— মানে এই খবরাখবরের আশায়— মানে সিপাহীদের খবর।

বিবার্ট ঃ হুঁম্। সিপাহীরা ষড়যন্ত্র করবে, আর তোমাকে রাস্তায় এসে বলে যাবে। তুমি কোম্পানীর বহুত চালাক নোকর আছ। হাঃ হাঃ হাঃ—

কিলীচ ঃ না সাহেব, খবর তো সিপাহীরা দেবে না, দেবে আমাদের গুপ্তচর সিপাহী আকবর। তার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি।

বিবার্ট ঃ তাহলে দাঁড়িয়ে থাক। ষড়যন্ত্রের খবর দিয়ো তোমার জেনারেল সাহেবকে। বৃদ্ধ জেনারেল আর তাঁর বুদ্ধিহীন স্পাই! ফুঃ।

[চলে যায়]

কিলীচ ঃ এক শ' বছর তো ওই ফু দিয়েই চালালে। সবাই বলছে, এবার ফুয়ের শেষ। ঠেলা এখন সামলাও। বললে তো বোঝ ঘন্টা।

[দু'টো বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়। হঠাৎ বিবার্ট ফিরে আসে। কিলীচ খান আমতা আমতা করে কোন রকমে আঙুল সামলায় ও কথার মোড় ফেরায়]

ইয়ে—মানে— ঘন্টার পর ঘন্টা এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না।

বিবার্ট ঃ দেখ চায়েন কিলীচ, থুরা বাদ তুমি আমার সার্থে মোলাকাত করবে।

কিলীচ ঃ জরুর জরুর। মোলাকাত করব না? জরুর মোলাকাত করব। কিন্তু এত সকালে কোথায় চললেন সাহেব?

বিবার্ট ঃ হাঁটছি। তবে—অস্ত্রসজ্জিত হয়ে। তোমাদের দেশ— পথে থাকে বন্য জন্তু, পাগলা কুত্তা আর বিষধর সাপ। তাই অস্ত্রের ব্যবস্থা। হাঃ হাঃ হাঃ—

[পরিহাসের আবরণে রয়েছে একটা চাপা ক্রোধ। পিস্তলটা হাতে খেলা করছে। হাসতে হাসতে চলে যায় বিবার্ট]

কিলীচ ঃ যাক বাবা, পাগলা সাহেব গেছে। দেখলেই ধড় থেকে জানটা উড়ে যেতে চায়।

[কথা বলতে বলতে হেলেসহ শের খান ও আকবর আসে। কিলীচ খান গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়]

শের খান ঃ কেন বুঝবে না আকবর? আমি শের খান, এই বুড়ো বয়সে

www.pathagar.com

বুঝতে পারছি, আর তোমরা নওজোয়ানরা এই সোজা কথাটা বুঝতে পারছ না?

আকবর : (এড়াতে পারলে যেন বাঁচে) সোজা বলেই হয়তো সহজে বুঝতে পারছি না।

শের খান : বুঝতে পারছি না বললেই তো হবে না। কোন্ কথাটা বুঝতে পারছ না, বল। বুঝিয়ে দিই।

আকবর : না— মানে আপনি তো বোঝাতে চেষ্টা করছেনই। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন, দেশের সে দিনও নেই, সে জৌলুষও নেই। তাই বড় বড় কথায় মন ভরলেও পেট ভরে না। তাই ভাবলাম, কোম্পানী যখন দেশের মালিক হয়ে গেছেই-

শের খান : না। কোম্পানী মালিক হয় নি। এখনও দিল্লীর তখ্‌তে বসে আছেন শাহানশাহ্-এ হিন্দুস্তান বাহাদুর শাহ্ যাফর। অন্য সবার মত কোম্পানীও বাহাদুর শা'র ফরমান পাওয়া কর্মচারী।

আকবর : হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই। তবে এক শ' বছর ধরে দেশের যত কর্ম, তা ওই কর্মচারীরাই করছে কি না। তাই বুঝলাম-

শের খান : কি বুঝলে?

আকবর : এইটুকু বুঝলাম যে এই দুর্দিনে হয় এলেম শেখ, নয় সিপাহী হও, ফৌজদার হও, কাজ কর, ফুর্তি কর— ব্যস্।

শের খান : কিন্তু তোমার এই ব্যস্‌কে যে শেষ করে দিচ্ছে ওই বেনিয়া ফিরিঙ্গি, তা তো বুঝলে না।

আকবর : না খাঁ সাহেব, তাও বুঝেছি। আর আমিও তো চাই, বেনিয়া ফিরিঙ্গি এদেশ থেকে চলে যাক।

শের খান : শুধু চাইলেই তো হবে না। তাড়াতে হবে।

আকবর : কিন্তু খাঁ সাহেব, শরীরটা আমার কিছুদিন ধরেই ভাল যাচ্ছে না।

শের খান : তা নয়। তোমরা হলে বকরী।

আকবর : বকরী?

শের খান : হ্যাঁ, বকরী। ফিরিঙ্গি ঘাস খাওয়াচ্ছে, খেয়ে দেয়ে মোটা হচ্ছ। কিন্তু দেশ যখন ডাক দিয়েছে, যখন নহর পার হওয়ার জন্য গলার দড়িতে টান পড়েছে, তখনই পিছুটান। শয়তান। মানুষের বাচ্চা সব শয়তান হয়েছে।

[অদৃশ্য থেকেই ফিলীচ খান হেসে ফেলে]

কে?

www.pathagar.com

[কিলীচ অগত্যা এগিয়ে আসে]

এই যে, আরেকজন!—কি ছিল না তোমাদের? ওয়ালেদানের ছিল বীরের দেহ, চওড়া বুক, সবল হাত। নাম ছিল হায়দার খান। আর তুমি বেটা নাতি তাঁর! হয়েছ কি? –ন্যাংটে ইঁদুর। নাম রেখেছ চিন কিলীচ।

কিলীচ : খান বল, কিলীচ খান। চিন কিলীচের চিনটুকু বাদ দিলে ক্ষতি নেই, কিন্তু খানটুকু নয়।

শের খান : এ্যাঁহ্! শখ কত! ইঁদুরকে খান বল! বলতে হয়, বলব— ইঁদুর খান।

কিলীচ : দেখ শের খান, দেহটা আমার পাতলা বটে, স্বাস্থ্য খারাপ— কিন্তু আমি ইঁদুর নই, ন্যাংটে তো নই-ই।

শের খান : তার উপর ওই গোঁফ। তোমার চিমটে মুখে ওই গোঁফ বেমানান।

কিলীচ : সাবধান শের খান। আমার যা খানদান, এই গোঁফে তার পরিচয়। হ্যাঁ, পরিচয়টা না জানলে বেমানানই মনে হবে। কিন্তু যদি–

শের খান : রাখ তোমার কিন্তু আর যদি। চেয়ে দেখ এ বান্দার দিকে। শের খান আজও শের। বর্তমানে সর্বহারা, কিন্তু মনের শান তেমনি আছে। কারও পরোয়া করি না। কেন করব? মনের শান ছাড়া আর আছে কি? ধনের মধ্যে এই পোটলাটা, আর জনের মধ্যে এই ছেলে। তবে হ্যাঁ, শের কা বেটা শের!

[সগর্বে ছেলের দিকে চাইতে গিয়ে খেয়াল হয় যে ছেলেটার স্বাস্থ্য সত্যিই তেমন ভালো নয়]

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে বুখার হয়, তাই কিছু- মানে— রোগা।

আকবর : খাঁ সাহেব, আপনি এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান। এই অসুস্থ ছেলেটাকে কারও কাছে রেখে আসতে পারেন না?

শের খান : কার কাছে রেখে আসব? আছে কেউ?

আকবর : আত্মীয় না হোক, যে কোন লোকের কাছে–

শের খান : না। শের কা বেটা থাকবে কেন? দেশে মানুষ আছে? তলোয়ার ফেলে কোম্পানীর কলম ধরেছে। নফর হয়েছে ওই সাদা মালিকের। রাখব কোথায়? তাই সঙ্গে রাখি। বুখার এলে বুকের মাঝে জড়িয়ে রাখি। খানদানের শেষ চিহ্ন। আমার শেষ আশা!

[শেষের কথাগুলো যেন অসহায় এক কান্নার সুরে জড়ানো]

www.pathagar.com

আকবর : কিন্তু পথে শহরে কত দুশমন! দরকার হলে দুশমনের সঙ্গে আপনাকে লড়তে হবে। তলোয়ার তো সঙ্গেই আছে। তাই বলছিলাম–

শের খান : (মন যেন কোথায় তলিয়ে গেছে) লড়াই! ভয় কিসের? মরদ যখন, লড়াই তো করতেই হবে! দরকার হলে মরতেও হবে। আর বাঁচতে চাইলেই কি বাঁচা যায়? মরণ! সে যে বড় নিষ্ঠুর! মরণ যেদিন কাছে আসবে, সেদিন কিছুতেই তাকে ফেরানো যাবে না। সাদা মালিকের কাছে থেকেও, সাত মহলার মাঝে থেকেও টেনে নেবে। আমি কি চাই নি আমার আপন জন বেঁচে থাক? হাসি থাক ঘর জুড়ে? সুখ থাক মন ঘিরে? কিন্তু মরণ যে তা মানল না! ধন তো আগেই গিয়েছিল। তারপর জন গেল, মন গেল, হাসি গেল, সুখ গেল! সব কিছু হয়ে গেল ধু ধু এক মরুভূমি!

[তন্ময় হয়ে কি ভাবে। তারপর যেন জেগে ওঠে]

কিন্তু তাই বলে কি ভয় পেয়েছি? নিজের আযাদী বিকিয়ে ওই কোম্পানীর গোলাম হয়েছি? শওকত নেই, কিন্তু শান আছে। তাই খানদানের এই স্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে পথ চলি। লোকে বলে শের খান। বুকটা খুশীতে ভরে যায়। চেয়ে দেখি, পাশে আমার বংশ–প্রদীপ। ছেলে মানুষ। কিন্তু দেখ, চলে কেমন শির উঁচু করে!

আকবর : তাই তো খাঁ সাহেব! এতটুকু ছেলে, এমনি ভাবে চলে কি করে?

শের খান : চলবে না? ধর, শের যে লড়ে, সে কি শিখে লড়ে? তা নয়। শেরের বাচ্চা এমনিতেই বুঝতে পারে, জানতে পারে। শেরের খুন তাকে বুঝিয়ে দেয়, জানিয়ে দেয়। আর ওই ব্যাটা ন্যাংটে ইঁদুর চিন কিলীচ। নফর হয়েছে, তাই তো কেমন মাথা নীচু।

কিলীচ : এটা নীচতা নয়, শরীফ খানদানের নরমিয়াতের পরিচয়।

শের খান : ওই মুখে খানদানের কথা বলছ? লোকে হাসবে। বুযদিল, বেহেদায়েত!

কিলীচ : দেখ শের খান, দেহে খুন কিছু কম থাকতে পারে। কিন্তু রেগে গিয়ে সবটুকু খুন যদি মাথায় উঠে যায়, তাহলে খুনোখুনি হয়ে যেতে পারে।

শের খান : তুমি করবে খুনোখুনি? হাঃ হাঃ হাঃ— ওই সাহেবদের কাছে

www.pathagar.com

গিয়ে এই কথা বল। বিশ্বাস করবে। আয় বাপি, চলে আয়। এর সঙ্গে কথা বললে গুনাহ্ হবে।

[চলে যায়]

কিলীচ : ব্যাটা ছোট লোক! দিতাম কষে কয়েক ঘা–

আকবর : সে কি হয় খাঁ সাহেব। আপনি হলেন আমীরযাদা।

কিলীচ : হ্যাঁ, তা ঠিক। বলে কি না, গোঁফটা আমার বেমানান! বয়সে বড় বলে মাফ করে দিলাম। নইলে মেজাজের হাল যা ছিল, তাতে বুঝিয়ে দিতাম, আমার এ খানদানী গোঁফ উঁচিয়ে থাকে কেন।

আকবর : তা তো বটেই। কিন্তু শুনুন। খবর আছে।

কিলীচ : আছে নাকি? (এদিক ওদিক দেখে নিয়ে) কেউ নেই, বলে ফেল।

আকবর : সিপাহীরা ক্ষেপে গেছে। নানাসাহেব, আজিমুল্লাহ্ খান, আর তাঁতিয়াটোপী এসেছে এদের নেতা হয়ে। আরও কেউ কেউ ছদ্মবেশে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিলীচ : এসব তো পুরনো খবর।

আকবর : আরও আছে।

কিলীচ : কি?

আকবর : চাপাতি আর রক্তপদ্ম! ওই যে রাকীব আসছে। চলি আমি।

[চলে যায়। রাকীব আসে অন্যদিক দিয়ে]

রাকীব : তারপর খাঁ সাহেব। সকাল বেলায় হাওয়া খাচ্ছেন?

কিলীচ : হ্যাঁ ভাই, ঠাণ্ডা হাওয়া খাব বলে এসেছিলাম। কিন্তু মালুম হচ্ছে, হাওয়া বড় গরম।

রাকীব : তাই নাকি? তাহলে আর খারাপ স্বাস্থ্য ভাল হওয়ার আশা কই।

কিলীচ : এখন বুড়ো হয়েছি। তোমাদের জোয়ানী দেখে দেখেই যতটুকু দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে।

রাকীব : গরমটা যদি মাথার দিকেই অনুভব করেন, তাহলে ঘোলে কিছুটা উপকার হবে— তাতে সন্দেহ নেই।

কিলীচ : হ্যাঁ, ঘোল যখন খাওয়াতে আরম্ভ করেছ, তখন ঢালবার আর বেশি বাকী কই? বলি, তোমাদের হাল-হকিকত কি?

রাকীব : আমরা ছা-পোষা সিপাহী, ছাগল-ভেড়াও বলা যায়।

কিলীচ : আরে না না, কি যে বল! তোমরা হলে যোদ্ধা। সব সময়

www.pathagar.com

লড়া'য়ের নেশায় মেতে থাকাই স্বাভাবিক।

রাকীব : লড়াই তো করবে ওই সাহেবরা। আমরা বড় জোর ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে পারি। তাছাড়া, যুদ্ধের কথা তো ভুলেই গেছি। কোম্পানীর এই শান্তির রাজ্যে যুদ্ধের কোন কথাই ওঠে না। বেশ তো আছি। আপনি, আমি, সবাই সাহেবদের চাকরী করছি। খাওয়াপরার চিন্তা নেই। সাহেব যদি গোস্বা হয়, পাগুলো না হয় আরও জোরে টিপব। কি বলেন?

কিলীচ : তা- তা- বলি- হ্যাঁ-মানে-

[দূরে দেখে নিয়ে]

কে যায়? শামসুদ্দিন আবার পথেও বেরোয় নাকি? আমি তো জানি, সে আজিজনের ঘরেই থাকে।

রাকীব : হ্যাঁ, থাকে। থাকতে থাকতে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে আর কি।

কিলীচ : দু'টিতে মিলেছে ভাল। সুবেদার শামসুদ্দিন, আর নাচওয়ালী আজিজন। আজিজন মেয়েটি নাচে ভাল, কি বল?

রাকীব : শুধু ভাল নাচে না, নাচায়ও।

কিলীচ : কিন্তু বেচারী বড় দুঃখী!

রাকীব : হঠাৎ এত মমতা?

কিলীচ : ওর বাপ ছিল আমার চেনা লোক।

রাকীব : তাই তো ওর স্বভাব-চরিত্র আপনার খুব ভাল জানা!

কিলীচ : হ্যাঁ, চেনাজানাটা বজায় রেখেছি কি না। ওর বাপ মারা যাবার পর বড় দুঃখেই পড়েছিল।

রাকীব : শুনেছি, আজিজন যখন ছোট, তখন ওর মাকে নাকি ফিরিঙ্গিরা ধরে নিয়ে যায়। তারপর ওদের অত্যাচারেই নাকি বেচারী আত্মহত্যা করে?

কিলীচ : হ্যাঁ, মাথাটা কেমন একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল কিনা, তাই আত্মহত্যাই করে বসল।

রাকীব : সাধারণ মানুষ। আপনার মত মাথা ঠিক রাখা তো সবার পক্ষে সম্ভব নয়।

কিলীচ : হ্যাঁ— ইয়ে— কিন্তু আজিজনকে সাহেবরা অযত্ন করে নি। ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছে, গান বাজনা শিখিয়েছে-

রাকীব : কামাই করে খাওয়ার পথ খুলে দিয়েছে। ওরা হল খুব ভাল মানুষ। ওদের কাজ-কামই আলাদা।

www.pathagar.com

কিলীচ ঃ হ্যাঁ– আচ্ছা গরমটা একটু বাড়ছে মনে হয়। আসি।

[চলে যায়]

রাকীব ঃ নাফরমান! (শামসুদ্দিন আসে) কি দোস্ত্! মুখে এখনও চিন্তার রেখা?

শামসুদ্দিন ঃ ভাল লাগছে না।

রাকীব ঃ তখন যেন কি বলতে চেয়েছিলে?

শামসুদ্দিন ঃ রাকীব! আমি চেয়েছিলাম সুখ, শান্তি।

রাকীব ঃ খুবই স্বাভাবিক। সবাই তা চায়।

শামসুদ্দিন ঃ কিন্তু দেশের ডাক এল ঠিক এমনি সময়ে।

রাকীব ঃ হ্যাঁ, তা এসেছে। তোমার জন্মভূমির সে অধিকার আছে।

শামসুদ্দিন ঃ হ্যাঁ, আছে। বাইরে সবাই ভাবছে দেশের কথা। ব্যারাকপুরে প্রাণ দিয়েছে কত সিপাহী। কিন্তু –

রাকীব ঃ কিন্তু কি?

শামসুদ্দিন ঃ একদিকে সময়ের ডাক, অন্যদিকে আজিজন–

রাকীব ঃ সিপাহী! আমরা জানি কাজ করতে, আর কাজের অবসরে মনের খেলায় মেতে থাকতে। এ জীবনটাই একটা খেলা, একটা মৌজ! দেশের ডাক যদি এল, সে ডাকেই সাড়া দেব। নতুন মৌজে মেতে যাব।

শামসুদ্দিন ঃ বিপ্লবের ডাকে তুমি এত সহজে সাড়া দিতে পেরেছ?

রাকীব ঃ কেন পারব না? চোখে মুখে হাসি নিয়ে কি দুঃখের লেখা পড়া যায় না? যায় শামসুদ্দিন, যায়। প্রয়োজনে তাই হাসি মুখেই জীবন দেব। জীবনের আনন্দকে সত্যি করে পেতে হলে আজ তারই প্রয়োজন।

শামসুদ্দিন ঃ কিন্তু আমি যে– রাকীব! আজিজনের কথা তোমাকে সবই বলেছি।

রাকীব ঃ শোন শামসুদ্দিন। এত চিন্তা সিপাহীদের শোভা পায় না! ভোগ, প্রেম,আত্মচিন্তা– মানুষ এর কোনটারই গোলাম হবে না। হবে এগুলোর মালিক। আজিজনকে তুমি সহজ মনে গ্রহণ কর।

শামসুদ্দিন ঃ তা-ই করব ভাবছি। কিন্তু পারছি না। আজিজনের মনের কথা যে কিছুই জানতে পারি নি।

রাকীব ঃ জানাজানির এমন রাজ্যও আছে, কথার ব্যাকুল বাসনা যেখানে

www.pathagar.com

অবান্তর। হয়তো আজিজন আর তোমার জানাজানি হয়েছে সেখানেই! তুমি ভাবছ একদিকে দেশের প্রতি কর্তব্য, অন্যদিকে আজিজন। কিন্তু একটার জন্য অন্যটাকে যে ছাড়তেই হবে, এমন কি কথা আছে? শোন, কর্তব্যের পথে বাধা দেয় যে প্রেম, তা প্রেম নয়। তুমি যাও ভাই। আজিজনের কাছে যাও। তার সঙ্গে কি বোঝাপড়া হল তোমার, আমাকে বলবে এসে।

শামসুদ্দিন ঃ তোমার হাতে এটা কি? দাড়ি?

রাকীব ঃ ও হ্যাঁ- দেখতো, ফকিরের কথা তখন কি বলছিলে— তার দাড়িটা কি এরকমই ছিল?

শামসুদ্দিন ঃ হ্যাঁ। কিন্তু-

[রাকীব হাসতে থাকে]

রাকীব ঃ (গম্ভীর কণ্ঠে) চাপাতি আর রক্তপদ্মের দায়িত্ব পালন করেছ?

শামসুদ্দিন ঃ করেছি। চাপাতি আর রক্তপদ্মের সংকেত চলে যাচ্ছে জন থেকে অন্য জনে, গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। (আকাশে মেঘ গর্জন) বাদলা রাতের মত আজকের দিনটাও বাদলা হয়ে আছে। চেয়ে দেখ রাকীব, আসমানে কালো মেঘের ঘনঘটা। মনে হয়, ঝড় আসছে দেশ ছেয়ে।

রাকীব ঃ হ্যাঁ, ঝড় আসছে। দেশ ছেয়ে, মন ছেয়ে। আমরা তাতে সাড়া দেব। মনটাকে তাই ফূর্তি করে চাঙ্গা কর। তোয়ের থেকো। আজ রাতে এসে নিয়ে যাব।

শামসুদ্দিন ঃ কোথায়?

রাকীব ঃ ওই মসজিদে!

শামসুদ্দিন ঃ কাদের কাছে?

রাকীব ঃ দুঃখ-তাপের বাষ্প যারা মেঘ করে ঝড় আনে, তাদের কাছে।

শামসুদ্দিন ঃ রাকীব!

রাকীব ঃ কেউ যেন আর না জানে।

[চলে যেতে থাকে রাকীব। বেরিয়ে যাওয়ার আগে শামসুদ্দিনের দিকে ফিরে বলে—]

আজ রাত্রে।

[বেরিয়ে যায় হাসতে হাসতে। শামসুদ্দিন নির্বাক চেয়ে থাকে তার গমন পথের দিকে। আসমানে আবার মেঘ গর্জন]

www.pathagar.com

।।চতুর্থ দৃশ্য।।

[আজিজনের ঘরের অঙ্গন। বিকাল। শামসুদ্দিন এসে অঙ্গনে পায়চারী করছে। ভেতরে বাজছে সেতার। একটু পরে সেতার থামে। বেরিয়ে আসে আজিজন]

আজিজন ঃ শামসুদ্দিন কখন এসেছ?

শামসুদ্দিন ঃ এই তো একটু আগেই।

আজিজন ঃ এখনও এত গম্ভীর কেন? দুরন্ত সিপাহী! মুখে কেন হাসি নেই?

শামসুদ্দিন ঃ আজিজন! এক শ' বছরের জুলুমের কান্না শুনতে পেয়েছি। শুনতে পেয়েছি তার প্রতীকার–আহবান।

আজিজন ঃ হাসি ছাড়া, স্ফূর্তি ছাড়া তোমায় মানায় না। তখন আকবর এসে জিজ্ঞেস করছিল কি সব খবর। তোমাকেও খবরে পেয়েছে না কি?

শামসুদ্দিন ঃ আজ দেশের আকাশে বাতাসে সে খবর। জান, ওসব খবর ওসব কথা আমি শুনতে চাই নি। তবু শুনতে হল। তাই তো ভাবছি।

আজিজন ঃ যুগ যুগ ধরে মানুষ ভেবে আসছে। ভাবনার কি শেষ আছে? তার চেয়ে ভাল নির্ভাবনায় ডুবে থাকা।

শামসুদ্দিন ঃ বাড়িতে আমার আম্মা একা— আল্লা'র রহমতের ভরসায় দিন কাটাচ্ছেন। আমি তাঁর একমাত্র ছেলে।

আজিজন ঃ আমি জানি শামসুদ্দিন। আর তাই হয়তো–

[আজিজনের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়]

শামসুদ্দিন ঃ আজিজন! কেন তুমি নাচওয়ালী?

আজিজন ঃ হঠাৎ আজ এ প্রশ্ন? নাচওয়ালী বলেই তো তোমার আমার পরিচয়!

শামসুদ্দিন ঃ এ পরিচয় যে আজ চলার গতি থামিয়ে দিতে চায়! একবার ভেবেছিলাম, কিছুতেই আর আসব না এখানে।

আজিজন ঃ তাই হয়তো তোমার জন্য ভাল হত শামসুদ্দিন। খোলা প্রান্তরে একা দাঁড়িয়ে সাঁঝের আসমানে হয়তো আমার লালাট-লিখন পড়তে পারতে। হয়তো উত্তর পেতে— কেন আমি নাচওয়ালী!

শামসুদ্দিন ঃ শোন আজিজন। একদিকে কল্পনায় জাগে, জীবন-যোদ্ধা এক তরুণ-সিপাহী। পথে পথে তার ঘোড়া ছুটে যায়। সওয়ারীর রক্ত টগবগ করে ওঠে। অন্যদিকে ফুলের গন্ধে মাতাল সন্ধ্যা নামে। আজিজন! তোমায় শুধু এক নজর দেখার জন্যে মন হয়ে ওঠে চঞ্চল বেদুঈন!

www.pathagar.com

[আজিজনের মুখে ফুটে ওঠে স্নিগ্ধ হাসি]

আজিজন : এ যে এক নাচওয়ালীর পরম সৌভাগ্য শাম্‌স্‌!

শামসুদ্দিন : কিন্তু সর্বনাশা ঝড় এল এমনি সময়। আজিজন! দেশের ডাকে সাড়া দেবার শুভ লগ্নে তুমি আমায় জাগিয়ে দেবে না?

আজিজন : জাগিয়ে দেবার দায়িত্ব কি আমার?

শামসুদ্দিন : ঘুম পাড়াবার ক্ষমতা যখন তোমার হাতেই রয়েছে–

আজিজন : এত ক্ষমতা আমার— কিন্তু, জানি নি তো?

শামসুদ্দিন : আজিজন! মন যে আমার কয়েদ হয়ে আছে তোমার এ সুর্মাটানা কালোচোখের অতলতায়!

আজিজন : তুমি সিপাহী। তোমার এ দুর্বলতা কেন?

শামসুদ্দিন : দুর্বলতা?

আজিজন : নয় তো কি? আমাদের কাছে তোমরা এসে থাক অবসর বিনোদনের আশা নিয়ে। অবসর যখন কেটে যায়, আমরাও সজাগ হয়ে উঠি। তোমাদের ভোমর গুঞ্জনে আমাদের চোখে যে মোহ নামে, বেদনার আঁসুতে আমরা তা ধুয়ে ফেলি। নইলে যে ভোরের আলোয় পথ দেখতে পাই না!

শামসুদ্দিন : কিন্তু আজিজন, তোমার হাতে ঢালা শরাব না পেলে সময়ের গতি যে থেমে যায়! তোমার কালো চোখের অতল রহস্য, তোমার প্রবাল হাসির মিঠে সুর— এ যে আমার বাদশাই দৌলত আজিজন!

আজিজন : এ তোমার শায়েরী মনের কল্পনা। অবসর মুহূর্ত তাতে রাঙ্গা হয়ে উঠলেও কাজের সময় তা বাধা হওয়া উচিত নয়।

শামসুদ্দিন : বল তো আজিজন, আমার মনকে তুমি প্রতি মুহূর্তে আকর্ষণ করতে চাও না? তোমার নিরালা অবসর কি আমার কল্পনায় মুখর হয়ে ওঠে না?

আজিজন : তোমার কি মনে হয়?

শামসুদ্দিন : তোমার আবেগ টলমল কাজল চোখের যে চাহনী আমার মনকে মজনু করেছে, তাতে আছে লায়লীর স্বপ্ন, এ আমি বিশ্বাস করি।

আজিজন : দুরন্ত সিপাহী! তুমি যদি চাও, সাধ্য কি আমার— তোমাকে প্রত্যাখ্যান করি? এক মুহূর্তের মোহ আমার শত মুহূর্তে বেঁচে থাক, এই কি আমি চাই না?

শামসুদ্দিন : মালকিন! আজিজন! জীবন পাত্র পূর্ণ হল। আজ তুমি নতুন করে

www.pathagar.com

সাজ। বেণীতে গাঁথ মোতির ফুল, হাতে পর হীরের কংকণ। আমি দেখব তোমাকে। তারপর–

আজিজন : তারপর?

শামসুদ্দিন : তুমিই বল, তারপর?

আজিজন : জানি না। তুমি এবার হাস। প্রাণখোলা হাসি। তারপর– (কাশি দিয়ে গলা সাফ করে কিলীচ খান) আসুন খাঁ সাহেব।

[কিলীচ খান আসে]

কিলীচ : আসছি, আসছি। সাহেবের কুঠি থেকে বিবি আজিজনের বাড়ি পর্যন্ত যখন এসে গেছি, বাকী কয়েক হাত অবশ্যই আসব। তবে বেশি কাছে কি আসতে পারব?

শামসুদ্দিন : কেন পারবেন না খাঁ সাহেব?

কিলীচ : কারণ, তোমার মত নওজোয়ান যেখানে বিবিজানের কাছ ঘিরে বসে আছ– সেখানে আমি, হাজার হোক, কিছুটা বুড়ো হয়েছি তো!

শামসুদ্দিন : যদি মনে করেন, জীবনে টান ধরেছে আপনার, তাহলে এ কাছটুকু আমি হাসিমুখে ছেড়ে দিতে পারি।

কিলীচ : কিন্তু ভাই, আমাদের এখন কাছের স্বপ্ন মিটে গেছে বলতে হবে। তাছাড়া আমার যা কাজ, তাতে আসা যাওয়াই দরকার। কাছে বসার ফুরসুত কই?

শামসুদ্দিন : বড় বেশি কাজ পড়েছে বুঝি?

কিলীচ : হ্যাঁ, চাকরীটাই খুব কাজের কি না!

শামসুদ্দিন : কিন্তু অনেকেই বলাবলি করে, আপনি সাহেবদের বেশি গোলামী করছেন।

কিলীচ : বলে নাকি? ছোটলোকেরা বুঝি বলে?

শামসুদ্দিন : ছোটলোক কি না বুঝি না, তবে লোকেরা বলে?

কিলীচ : বললেই সে ছোটলোক। আমি সিপাহসালার হায়দার খাঁর নাতি, আমার শানই আলাদা!

শামসুদ্দিন : তা তো জানি। কতবড় খান্দানের লোক আপনি! তাই তো বলছিলাম, গোলামী করাটা আপনাকে ঠিক মানায় না।

কিলীচ : কিন্তু চাকরী আর গোলামী দু'টো এক জিনিস নয়। জান, আমার দাদাজান ইয়া মোটা লোহার শিকল তলোয়ারের এক কোপে কেটে ফেলতেন।

শামসুদ্দিন : শুনেছি। কিন্তু আপনি তা পারেন না কেন?

www.pathagar.com

কিলীচ ঃ হাতে ব্যথা পাই।

শামসুদ্দিন ঃ তাও তো এক কথা! তাই বুঝি সাহেবদের কাছে মুখের কাজ নিয়েছেন?

কিলীচ ঃ হ্যাঁ, উপায় কি? স্বাস্থ্য খারাপ, দেশেরও আর সেদিন নেই। থাকলে বসে বসে খেতাম।

শামসুদ্দিন ঃ তা অবশ্য। তাতে স্বাস্থ্য ভাল হত।

কিলীচ ঃ হ্যাঁ ভাইয়া, তোমাদের সিপাহীদের খবর কি?

শামসুদ্দিন ঃ খবর আর কি! খাচ্ছি, কাজ করছি, ফূর্তি করছি-

কিলীচ ঃ তাতো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু শুনলাম, চট্টল থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত সিপাহীদের মধ্যে কি একটা চলছে?

শামসুদ্দিন ঃ কই, জানি না তো?

কিলীচ ঃ জানলেও বলবে না— এই তো?

শামসুদ্দিন ঃ আপনি শরীফযাদা। আপনার সঙ্গে এসব ছোটখাটো আলোচনা করতে পারি? বে-আদবী হবে যে!

কিলীচ ঃ হ্যাঁ বিবিজান, তুমি যে কথা বলছ না?

আজিজন ঃ সুযোগ পেলাম কই?

কিলীচ ঃ তা অবিশ্যি। হ্যাঁ, আমি এসেছি খবর নিয়ে।

আজিজন ঃ খবর?

কিলীচ ঃ হ্যাঁ, বহুত দামী খবর।

আজিজন ঃ তাহলে বাহানা ছেড়ে বলেই ফেলুন।

কিলীচ ঃ আসছেন। এখানে, একটু পরে, তোমার ঘরেই।

আজিজন ঃ কে আসছেন?

কিলীচ ঃ মেজর-জেনারেল হুইলার সাহেব।

আজিজন ঃ বড় সাহেব আসছেন? আমার এখানে?

কিলীচ ঃ অবিশ্বাস্য হলেও আসছেন। সঙ্গে আসছেন বিবার্ট সাহেব, আরও দুয়েকজন।

আজিজন ঃ হঠাৎ তাঁদের আসার কারণ?

কিলীচ ঃ জানি না। কিন্তু তোয়ের থেকো। আচ্ছা, তাহলে আসি।

[শামসুদ্দিনকে দেখে নিয়ে চলে যায়। দুজনের মুখই গম্ভীর]

শামসুদ্দিন ঃ তোমাকে শিগগীরই আমি এমন জায়গায় রেখে আসব, যেখানে

www.pathagar.com

ওই কিলীচ খানের মত নাফরমান যেতে না পারে।

আজিজন : লুকিয়ে রাখবে?

শামসুদ্দিন : হ্যাঁ, ধন-দৌলত যেমন করে মানুষ লুকিয়ে রাখে। তারপর এ-ঝড় যেদিন থামবে, সেদিন তুমি আমি মিলে সাজিয়ে তুলব ছোট্ট একটি ঘর। শুনছ আজিজন। তুমি আর আমি।

আজিজন : সে-স্বপ্নই আমাকে দেখতে বলছ?

শামসুদ্দিন : হ্যাঁ, আমার মত তুমিও সে স্বপ্ন দেখ।

[আজিজনের চোখে মুখে সব পাওয়ার তৃপ্তি। আপন মনে কথা বলতে বলতে আসে ব্লেনম্যান]

ব্লেনম্যান : এ্যাঁ! পাগল! স্বপ্ন দেখছে! সিপাহী মুবারক বিয়ে করবে বারবণিতা কুলসুম বাঈকে? এই যে তোমরা। দুজনেই রয়েছ দেখছি। বেশ। হ্যাঁ, কথা শুনেছ? ওই সিপাহী মুবারক— শুনলে হাসি পায়, বুঝলে? মুবারক কুলসুমকে ভালবেসেছে। ভাল কথা। কিন্তু একেবারে বিয়ে করে ঘর বাঁধতে চায়! দেখ তো, তাই আবার হয় নাকি? আর কুলসুমের কথাই বলি। তুই বাবা এত বড় আশা করছিস কেন? মুবারকের সমাজ রয়েছে, আত্মীয় স্বজন রয়েছে। বিয়ে করলেই হল? তাও এই সময়ে, এই কানপুরে?

শামসুদ্দিন : ব্লেনম্যান।

[শামসুদ্দিন আজিজন দুজনের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়]

ব্লেনম্যান : হ্যাঁ, ভাল কথা। তোমরা ভাই আমাকে মাফ করে দাও। মেজাজটা আমার সব সময় ঠিক থাকে না। তখন কি বলতে কি বলেছি। বুঝলে, আমাকে ভাই মাফ করে দাও। তখন মাতাল ছিলাম।

শামসুদ্দিন : তুমি এখনও মাতাল। বেরিয়ে যাও।

ব্লেনম্যান : যাচ্ছি। মাতলামীটা এখনও রয়েছে বলে মনে হয়। কিছু টক খেতে হবে। আবার সাহেব আসবে এখানে— হ্যাঁ ভাই, তোমরা আমাকে মাফ করে দিয়ো। বুঝলে?

[চলে যায়। ওরা দুজনেই নির্বাক]

আজিজন : তুমি এবার এস। বড় সাহেব আসবেন। হুকুম এসেছে।

শামসুদ্দিন : আমরা তাদের হুকুমের মুখ ভেঙ্গে দেব, যত শিগগীর পারি।

আজিজন : তাও কি সম্ভব? ওদের আছে কামান বন্দুক। ওদের আছে

www.pathagar.com

হুকুমের তামিলদার।

শামসুদ্দিন ঃ সে কামান বন্দুক চালাই আমরা। হুকুমও তামিল করি আমরাই!

আজিজন ঃ কিন্তু তোমাদের চোখে যে কাব্যের স্বপ্ন নামে!

শামসুদ্দিন ঃ তা নামে। কিন্তু মেঘের বুকেই বজ্র লুকিয়ে থাকে। সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এসেছে গোটা কয় ইংরেজ। আমরা এদেশের হাজারো মানুষ যদি রুখে দাঁড়াই, তাহলে বেনিয়াদের সাধ্য কি, আমাদের উপর রাজত্ব করে?

আজিজন ঃ এ আত্মবিশ্বাস তোমাদের সবারই আছে শামসুদ্দিন?

শামসুদ্দিন ঃ না থাকলেও সবাইকে তা অর্জন করতে হবে। বেনিয়া প্রভুত্বের এই এক শ' বছর আমরাই রুখে দাঁড়িয়েছি আমাদের। আমরা আমাদেরই রক্তে রঞ্জিত করেছি দু'হাত। ছলনা আর ভাগ্যের জোরে বেনিয়া কোম্পানী গলায় পরেছে জয়ের মালা।

আজিজন ঃ ওদের ছলনাটুকুই দেখলে? দেখলে না তাদের শৃংখলা আর একতা? তাদের ছলনাকেও ছাপিয়ে উঠেছে তোমাদের যে নিমকহারামী, তার কথা ভুলে গেলে?

শামসুদ্দিন ঃ না, ভুলে যাই নি। আজ দীর্ঘদিনের ভুল বুঝতে পেরেই বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে চাইছি। ফিরিয়ে আনতে চাইছি আযাদীর সেই স্বপ্নের শুভদিন!

[মসজিদ থেকে আযান ভেসে আসে। উৎকর্ণ হয়ে ওঠে আজিজন। শামসুদ্দিন আজিজনের ভাবান্তর দেখে অবাক হয়]

আজিজন।

আজিজন ঃ ওই আযান ভেসে আসছে। চল যাই।

শামসুদ্দিন ঃ কিন্তু-

আজিজন ঃ কিন্তু নয়, এস। কিছুদিন ধরেই ওই আযান আমার মনকে কেমন চঞ্চল করে তোলে।

শামসুদ্দিন ঃ কিন্তু ওরা তোমাকে মসজিদে ঢুকতে দেবে কেন?

আজিজন ঃ ও!— আচ্ছা, এ পোষাক আমি খুলে নিচ্ছি।

শামসুদ্দিন ঃ তবু আজ নয়। আজ তুমি সাহেবদের জন্যই অপেক্ষা কর। মসজিদে তোমাকে কাল নিয়ে যাব। আমি।

[আযান ভেসে আসছে। আজিজন ম্লান মুখে শামসুদ্দিনের দিকে চেয়ে থাকে। শামসুদ্দিন তার পিঠে হাত বুলিয়ে প্রবোধ দিয়ে চলে যায়। আজিজন চেয়ে থাকে নির্বাক। কতক্ষণ পর আসেন মেজর-

www.pathagar.com

জেনারেল হুইলার ও বিবার্ট। সঙ্গে কিলীচ খান ও আকবর। আজিজন তাড়াতাড়ি তাদেরকে কুর্নিশ করে]

আজিজন : এ আমার পরম সৌভাগ্য।

হুইলার : হ্যাঁ, তুমি এখানে আছ। তোমাকে দেখা আমাদের দরকার। সিপাহীরা এখানে আসে, নাচগান হয়–

কিলীচ : হ্যাঁ সাহেব, রোজ হয়। বেশ সুখে শান্তিতেই আছে ওরা।

হুইলার : হ্যাঁ, সবাই ভাল থাকবে, আরাম করবে, এই তো চাই।

আজিজন : কিন্তু হুকুম করলেই আমি গিয়ে হাজির হতাম।

হুইলার : কিন্তু আমি মনে করলাম,আমি নিজে দেখতে যাব। তোমার ঘর আমি নিজে দেখব। বহুত পুরাতন বাড়ি। চায়েন কিলীচ!

কিলীচ : সাহেব!

হুইলার : তুমি এক নতুন ঘর দেখ। এ বাড়ি আচ্ছা নেই। আজিজনকে আমি নূতন বাড়ি করে দেব। আর যা যা লাগবে, সব কিছু দেব।

কিলীচ : নিশ্চয়ই। সাহেবের মেহেরবাণী।

হুইলার : চল। আমি অন্দরটা দেখব।

[আজিজন, হুইলার, কিলীচ খান ও আকবর ভেতরে যায়। বিবার্ট থেকে যায়। একটু পরেই আসে ব্লেনম্যান। বিবার্ট ত্রস্তপায় এগিয়ে যায়]

বিবার্ট : খবর কি ব্লেনম্যান?

ব্লেনম্যান : সমস্ত কানপুর বারুদের ঘরে পরিণত হয়েছে। যে কোন সময় একটিমাত্র অগ্নি–স্ফুলিঙ্গে সারা কানপুর জ্বলে উঠতে পারে।

বিবার্ট : জানি, জানি আমি। কিন্তু ওই বৃদ্ধ জেনারেল…

ব্লেনম্যান : হিন্দু মুসলমান সবাই ইংরেজ বিতাড়নে বদ্ধপরিকর।

বিবার্ট : আর সিপাহীরা?

ব্লেনম্যান : সিপাহীরা এখনো তেমন দলবদ্ধ হয় নি। তবে শিগগীরই হবে বলে আমার ধারণা।

বিবার্ট : তবু বৃদ্ধের ধারণা, সিপাহীরা সব অনুগত আছে। তারা বিদ্রোহ করবে না।

ব্লেনম্যান : জেনারেল হুইলার ভুল করছেন বোধ হয়।

বিবার্ট : ওই আবার আসছেন। তুমি যাও।

[ব্লেনম্যান নিঃশব্দে সরে পড়ে। বৃদ্ধ জেনারেল হুইলার আসেন। পেছনে পেছনে কিলীচ খান। বিবার্ট এক কোণে গিয়ে

www.pathagar.com

বাড়িটার অবস্থান লক্ষ্য করে]

হুইলার ঃ কে এসেছে? নানা দুন্দুপন্দু আর তাঁতিয়াটোপী?

কিলীচ ঃ হ্যাঁ সাহেব। পেশোয়ার পদ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত নানাসাহেব। সঙ্গে এসেছে তাঁতিয়াটোপী। শয়তানিতে যেমন প্রভু, তেমনি নফর। তার উপর নানাসাহেবের উপদেষ্টা হল আজিমুল্লাহ্ খান। বড়ই শেয়ানা। সবাই এসেছে সাহেব।

হুইলার ঃ এ বাত তুমি ঠিক জান?

কিলীচ ঃ একেবারে ঠিক সাহেব। হুবহু এমনি শুনলাম। বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র নানাসাহেব বাজীরাও-এর আট লাখ টাকার বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাই বিঠুর ছেড়ে কানপুর আসছে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে।

হুইলার ঃ তুমি যাও চায়েন কিলীচ। অন্দরে যাও। (কিলীচ খান ভেতরে যায়) মেজর বিবার্ট!

বিবার্ট ঃ ইয়েস মাই জেনারেল।

হুইলার ঃ অবস্থা সম্পর্কে তোমার কি মনে হয়?

বিবার্ট ঃ গুজবে দেশ ভরে গেছে। বিদ্রোহ ওরা করবেই।

হুইলার ঃ তাই আমাদের ব্যবহার হতে হবে খুবই মানবিক।

বিবার্ট ঃ কিন্তু মাই জেনারেল। চুপ করে থেকে আমরা কি মারা পড়ব না?

হুইলার ঃ (কিছুটা উষ্মার সঙ্গে) হয়তো মরতে হবে। কিন্তু–

[কিলীচ খান দরজায় দাঁড়িয়েছিল। সে সাহেবের কাছে আসে]

কিলীচ ঃ হ্যাঁ, বাইরে থেকে বহুত খবর আসছে। মীরাট আর দিল্লীর খবর কানপুরে পৌছে গেছে। এখানে রাণীর জন্মোৎসবে এবার বন্দুক ছোঁড়া হল না। সবাই বলছে, সাহেবরা ভয় পেয়ে গেছে।

হুইলার ঃ (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) চায়েন কিলীচ।

কিলীচ ঃ (প্রায় লাপিয়ে উঠে) সাহেব।

[নিজেকে কিছুটা সংযত করলেন হুইলার]

হুইলার ঃ কানপুরে আওর কৌন্ লিডার এসেছে?

কিলীচ ঃ আর একজন কে জানি আছে, কিন্তু নাম বলতে পারছি না। আকবর আমাকে খবর দিয়েছে। সে ওখানে বসে আছে। এখানে ডেকে আনব সাহেব?

হুইলার ঃ তুমি বদমাস কোন কামের নও।

www.pathagar.com

কিলীচ : তবে সে তেমন কেউ নয় সাহেব।

হুইলার : শাট্ আপ্। তুমি মিছে কথা বলছ আমার সাথে।

কিলীচ : মিছে কথা! আমি বলছি সাহেব?

হুইলার : হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি। আর কে বলবে? তোমার বাপ তো এখানে নেই?

কিলীচ : সাহেব! আমি নোকরি করি। কিন্তু বাপের নামে বকাবকি করলে মনটা খারাপ হয়। আর মন খারাপ হলেই রাগ উঠে যেতে পারে। জানেন তো আমি কোন্ খান্দানের লোক। এই গোঁফ দেখেই তা বুঝতে পারেন।

হুইলার : Damn your গোঁফ। আমি তোমার ওই গোঁফ শেভ করিয়ে দেব।

কিলীচ : অন্য সব অপমান আমি সইতে পারি। কিন্তু এই–

হুইলার : দুন্দুপন্থ নানা আমাদের দোস্তলোক আছে। পেশোয়ার পেনশন তাকে আমরা দেব। ব্যস্, গোলমাল মিটে গেল। সে আমাদের Counsel দিচ্ছে, আর তুমি বলছ, সে এসেছে বিদ্রোহ করতে!

কিলীচ : কিন্তু আমি যে শুনলাম!

হুইলার : আসল কথা তুমি শুনতে পার না। পার Damn lies শুনতে। আমি তোমাকে Dismiss করে দেব।

কিলীচ : সাহেব! আমার স্বাস্থ্য খারাপ, ডিসমিস করলে আর রুজি করতে পারব না। না খেয়ে মরব সব, খান্দানের অপমান হবে। এর চেয়ে বকুনিটাই না হয় সহ্য করব। আর–

হুইলার : আর কি?

কিলীচ : দেখি, আসল কথা জানতে পারি কি না!

হুইলার : এটা তোমার কাজ নয়। (আজিজন আসে) Here is the person I want. আও আজিজন। চায়েন কিলীচ!

কিলীচ : সাহেব!

হুইলার : ওই যে মসজিদ আছে, আমার সন্দেহ হয়, তাতে বিদ্রোহীরা জমা হয়। তুমি তোমার লোক লাগাও।

কিলীচ : আজই লাগাব সাহেব।

হুইলার : বিবিজান! তুমি এক কাজ কর।

আজিজন : কি কাজ সাহেব?

[কিলীচ খান বিবার্টের কাছে গিয়ে কি যেন বলে]

www.pathagar.com

হুইলার ঃ তুমি তো সিপাহীদের দিলকা করার আছ। তুমি সিপাহীদের খবর আমার কাছে দেবে। (বিবার্ট ও কিলীচ খান নৈরাশ্যজনক অঙ্গভঙ্গি করে) তুমি জান, ব্যারাকপুরে সিপাহীরা গোলমাল করল। বহুত লোক মারা পড়ল। আমি চাই না, কানপুরে তা হবে। আমি চাই, দেশে সবাই শান্তিতে বাস করবে। তাই সিপাহীদের খবর আমার জানা দরকার। আরও জানা দরকার, কে কে সিপাহীদের নেতা আছে।

আজিজন ঃ কিন্তু আমার তবিয়ত যে খারাপ সাহেব!

হুইলার ঃ (কিছুটা আদেশের সুরে) তাতে কি হবে? তুমি খবর দেবে, আর রেস্ট নেবে!

আজিজন ঃ একান্তই যদি না মানবেন সাহেব, হব— খবরিয়াই হব আপনাদের!

হুইলার ঃ গুড গার্ল! মন দিয়ে কাজ কর। বহুত ইনাম পাবে।

আজিজন ঃ এই তো আমার ইনাম সাহেব। দুঃখিনী আজিজন- আপনাদের দয়ায় নাচগান শিখেছি, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। এবার হব গুপ্তচর। আপনাদের কাজে, দেশের কাজে লাগব— এই তো আমার ইনাম!

[মুখে কান্না মিশ্রিত হাসি এনে চলে যায়। বিবার্ট তা লক্ষ্য করে]

হুইলার ঃ চায়েন কিলীচ।

কিলীচ ঃ সাহেব!

হুইলার ঃ তুমি আজিজনের উপর নজর রাখবে।

কিলীচ ঃ অবশ্যই। নাচওয়ালীর মন, যেন বাতাস। এখন আছে এখানে, তখন যাবে ওখানে। অবশ্যই নজর রাখব।

হুইলার ঃ তুমি আমার সাথে এস। আমি ওধারে যাব।

[কিলীচকে সঙ্গে নিয়ে আজিজনের ঘরের পাশের রাস্তা দিয়ে বাইরে যায়]

বিবার্ট ঃ ব্লেনম্যান!

[ব্লেনম্যান এসে কাছে দাঁড়ায়]

ব্লেনম্যান ঃ হুকুম করুন সাহেব।

বিবার্ট ঃ জেনারেল হুইলার আজিজনকে তার স্পাই করল। চায়েন কিলীচ তাকে অব্‌জারভ্ করবে। তুমি দুনোকে অব্‌জারভ্ করবে।

ব্লেনম্যান ঃ বুঝতে পেরেছি সাহেব।

www.pathagar.com

বিবার্ট ঃ তোমার মাদার ছিল নেটিভ। লেকিন তোমার ফাদার ইউরোপীয়ান। ভুলে যেয়ো না যে কালা আদমী তোমাকে ঘৃণা করে।

ব্লেনম্যান ঃ আমি জানি সাহেব। আমি ওদের কেউ নই। আপনার বিশ্বাস আমি জীবন দিয়েও রক্ষা করব।

বিবার্ট ঃ আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আরও এক প্ল্যান আছে।

ব্লেনম্যান ঃ বলুন!

বিবার্ট ঃ তুমি তা জান। মালুম নেই?

ব্লেনম্যান ঃ ও! হ্যাঁ, আমার মনে আছে। (অর্থপূর্ণদৃষ্টিতেতাকিয়ে) আজই?

বিবার্ট ঃ হ্যাঁ, থুরা বাদ– যখন আমি হুইলারের সঙ্গে বাতচিত করব। বুঢ্ঢা জেনারেল বহুত দুর্বল আর দয়ালু। তাকে উত্তেজিত করতে এই প্ল্যান বহুত কাজ করবে। যাও।

[ব্লেনম্যান চলে যায়। হুইলার আসেন। পেছনে কিলীচ খান]

জেনারেল হুইলার!

হুইলার ঃ ইয়েস।

বিবার্ট ঃ সিপাহীদের বিচ্ছিন্ন করার কোন পথ আমাদের নেই? চায়েন কিলীচ বলে, সব সিপাহী— সব লোকজন ক্ষেপে আছে। ওদের কাছে বন্দুক কামানও আছে। সব লোক আক্রমণ করলে আমাদের যদি বিপদ হয়?

কিলীচ ঃ তাই সাহেব ভেবে দেখতে বলছিলাম। অবশ্য ভয় আমরা করি না। তবু যদি কোন রকম–

হুইলার ঃ হুঁম্, লোকজন সব ক্ষেপে আছে, সিপাহী সব ক্ষেপে আছে–

কিলীচ ঃ কয়েকজনে সবাইকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। বলে হুজুর, ইংরেজের কাছে আমাদের দেশ গেল, ধর্ম গেল, জাত গেল। শুকর আর গরুর চর্বি দিয়ে শেষতক টোটা বানিয়েছে। আটা ময়দায় মিশিয়েছে গরু শুকরের হাড়ের গুঁড়ো। দেশে আবার টাকা পয়সারও অভাব। বলে, সব ওই ইংরেজের জন্য।

[ব্যস্ত হয়ে ব্লেনম্যান আসে]

ব্লেনম্যান ঃ হুজুর!

বিবার্ট ঃ খবর কি ব্লেনম্যান?

ব্লেনম্যান ঃ লাখনৌ থেকে এক সাহেব পরিবার আসছিল এখানে। শহরের কাছে এসেই তাঁরা সিপাহীদের হাতে আটকা পড়েন। পুরুষদের

www.pathagar.com

ওরা হত্যা করেছে, মেয়েদের ধরে নিয়ে গেছে।

হুইলার : হোয়াট?

[হুইলার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে]

কিলীচ : কি সাংঘাতিক কথা। সব ক্ষেপে ক্ষেপে আছে—

হুইলার : চুপ কর চায়েন কিলীচ। ...সব লোক ক্ষেপে আছে, দেশ ক্ষেপে আছে। আর ভাবছে, সাহেব লোক দুর্বল আছে। ইচ্ছা করলে মেরে শেষ করা যায়।

বিবার্ট : এ অবস্থায় আমরা যদি–

হুইলার : হ্যাঁ, এ–অবস্থায় আমরা যদি জেগে না উঠি, তারা সবাইকে শেষ করে দেবে। এ–হত্যাকাণ্ড বর্ণনা করতেও কেউ বেঁচে থাকবে না।

[বিবার্টের ইঙ্গিতে ব্রেনম্যান চলে যায়। আজিজন দুয়ারে এসে দাঁড়ায়]

বিবার্ট : তাহলে কি হবে মাই জেনারেল?

হুইলার : কি হবে? আমি শাসন করব, টেরোরাইজ করব, আর এত জুলুম করব যে ভয়ে শিশু মায়ের কোলে মুখ লুকাবে।

[সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে পান–পাত্র ভাঙ্গার শব্দ। আজিজন আঁতকে ওঠে। বিবার্টের চোখেমুখে জয়ের শয়তানি হাসি]

।।পঞ্চম দৃশ্য।।

[কানপুরের রাস্তা। থমথমে রাতের আঁধার। দূরে শোনা যায় মানুষের আর্তনাদ। শহরে–প্রান্তরে–গাঁয়ে আগুন ধরিয়েছে কোম্পানীর লোক। আজিজন ও বিব্বু বাইরে এসে দাঁড়ায়]

আজিজন : বিব্বু।

বিব্বু : দাঁড়ালেন কেন বিবিসাহেবা?

আজিজন : ওই মানুষের আর্তনাদ। কোম্পানীর লোক আগুন ধরিয়েছে গাঁয়ে।

বিব্বু : এ সময়ে এ রাস্তায় দাঁড়ানো ঠিক হবে না বিবিসাহেবা। ঘরে চলুন।

আজিজন : না বিব্বু, ঘরে যেতে আজ আর মন চাইছে না।

বিব্বু : আজ কি হল আপনার?

আজিজন : বলতে পারছি না বিব্বু, কিন্তু–

বিব্বু : দেশের এ ব্যাপারে আমাদের চাঞ্চল্য আসবে কেন?

www.pathagar.com

আজিজন : কেন, জানি না। তবু স্বস্তি পাচ্ছি না। বিব্‌বু, ওই গাঁয়ে হয়তো কত শিশু ওদের ভয়ে মায়ের কোলে মুখ লুকাচ্ছে, প্রায় ষোল বছর আগে যেমন মুখ লুকিয়েছিল এক অভাগিনী কোলের মেয়ে!

বিব্‌বু : চলুন, ঘরে বসে শুনব এসব কথা।

আজিজন : না বিব্‌বু, না। এখন আমি ঘরে যেতে পারব না। চল, ওখানে দাঁড়িয়ে ওই নির্মম ঘটনা দেখি। বিব্‌বু! আজ যে আমি গুপ্তচর! চল।

[শামসুদ্দিন আসে। হাতে তার বন্দুক]

শামসুদ্দিন : আজিজন!

আজিজন : এই রাতে তোমার হাতে বন্দুক?

শামসুদ্দিন : আমি সিপাহী। তুমি ঘরে যাও। এ রাস্তায় এখন আর দাঁড়াতে নেই।

আজিজন : কেন শামসুদ্দিন?

শামসুদ্দিন : আমি রাতেই তোমার সঙ্গে দেখা করব। সব জানতে পারবে।

আজিজন : ওখানে কোম্পানীর জুলুম চলছে। আমি দাঁড়িয়ে দেখব।

শামসুদ্দিন : তা কি করে হবে?

আজিজন : হবে হবে। আমি দেখবই। আয় বিব্‌বু।

[চলে যায়। শামসুদ্দিন অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। রাকীব আসে]

রাকীব : শামসুদ্দিন!

শামসুদ্দিন : হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত।

রাকীব : তোমার রক্তপদ্ম কোথায়?

শামসুদ্দিন : আছে।

[বুকে হাত দেয়]

রাকীব : সব সময় সঙ্গে রাখতে হবে। এ আমাদের প্রতীক! এ প্রতীকধারী সবাই আমরা ভাই-ভাই। আজ রাতেই আমাদের যাত্রা শুরু হবে।

[দূরে আর্তনাদ]

শামসুদ্দিন : ওরা গাঁয়ে জুলুম চালাচ্ছে।

রাকীব : জানি। আগুন শুধু ওখানে জ্বলছে না। জ্বলছে আমাদের প্রতি বুকে। সে আগুন ওদেরকে আমরা ফিরিয়ে দেব। একটু পরেই ওখান থেকে টিকা সিং বন্দুকের আওয়াজ করবে। সঙ্গে সঙ্গে করবে তুমি। তৃতীয় আওয়াজ বেরুবে আমার বন্দুক থেকে।

www.pathagar.com

শামসুদ্দিন ঃ ইংরেজ সৈন্য যদি রাস্তায় টহলে বেরোয়?

রাকীব ঃ আমাদের কাউকে পাবে না। এ আওয়াজ শুধু আমাদের প্রস্তুতির সঙ্কেত। সব রেজিমেন্টের সিপাহী এ সঙ্কেতের অর্থ বুঝবে। সময় হয়ে এল, আমি আসি। আওয়াজ করার সঙ্গে সঙ্গে তুমি সরে যাবে।

[রাকীব চলে যায়। চুপচাপ সময় কাটে। অদূরে বন্দুকের আওয়াজ হয়। সঙ্গে সঙ্গে শামসুদ্দিন আওয়াজ করে। রাকীবের আওয়াজ ভেসে আসে একটু পরেই। শামসুদ্দিন সরে যায়, আসে কিলীচ খান ও আকবর]

কিলীচ ঃ ব্যাপার কি আকবর? কিছুই তো বুঝলাম না।

আকবর ঃ আমিও বুঝলাম না।

কিলীচ ঃ অথচ তিনটি বন্দুক পর পর গুড়ুম।

আকবর ঃ তাই তো! কিন্তু আক্রমণের কোন নিশানাও তো পেলাম না।

কিলীচ ঃ আক্কেলটাই গুড়ুম করে দিলে। যাক, সাহেবকে একটা কিছু বলতে হবে। আর বুঝলে, অবস্থা যে দিকে গড়াচ্ছে, একটু বুঝে শুনে চলতে হবে। এস।

[চলে যায়। পেছন দিকে দিয়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় ব্রেনম্যান। সে তার গতিবিধি লক্ষ্য করে এগিয়ে যায়। ব্যস্ত পায় শের খান আসে। সঙ্গে ছেলে]

শের খান ঃ দাঁড়া বাবা, এখানে একটু দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা আঁচ করে নিই। এমনটি যে হবে, কেন হবে, কিছুই তো ওরা বললে না। কিরে ব্যাটা, ভয় পাচ্ছিস? না, কোন ভয় নেই। আল্লা' তো সঙ্গেই আছেন। ঘরে থাকলেও সঙ্গে থাকবেন, রাস্তায় থাকলেও সঙ্গে থাকবেন।

[চলতে গিয়ে পোটলাটা পড়ে যায়। সেটা তুলতে গিয়ে শোনে কার পদশব্দ। সঙ্গে সঙ্গে বিবার্ট আসে]

বিবার্ট ঃ ইউ বুঢ্ঢা নিগার, দাঁড়াও।

[পোটলাটা দেখে সাহেবের সন্দেহ হয়]

হোয়াট্স্ দিস্? এতে কি আছে?

শের খান ঃ আমার জিনিসপত্র।

বিবার্ট ঃ আমি দেখব।

শের খান ঃ না না, এ আমার জিনিসপত্র।

www.pathagar.com

[চলে যেতে চায়]

বিবার্ট : ইউ ওল্ড্ স্পাই! তোমার প্রয়োজন–

[শের খানের গলা ধরে। শের খান নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়]

শের খান : সাহেব, খবরদার।

বিবার্ট : বল, কেন অসময়ে এ বন্দুকের শব্দ?

[হাতের ব্যাটন দিয়ে আঘাত করে]

শের খান : খবরদার ফিরিঙ্গি।

[ছেলেটি কেঁদে ওঠে। আজিজন আসে ব্যস্ত হয়ে]

আজিজন : সাহেব, সাহেব! এ বুড়ো মানুষকে–

[হুইলার আসে]

হুইলার : কি, কি ব্যাপার?

বিবার্ট : এই বুঢ্ঢা হ্যাগার্ড সিপাহীদের গুপ্তচর।

হুইলার : তবু বৃদ্ধকে অমন করে মারধর করো না।

বিবার্ট : ওর বোচকায় কোন কিছু লুকিয়ে রেখেছে।

হুইলার : বোচকা খোল!

[পোটলা নিয়ে বিবার্ট খুলতে থাকে]

শের খান : না না, এ আমার জিনিসপত্র।

[পোটলাটা খুলে বিবার্ট দেখে– একটা তসবীর]

এ তসবীর দেখো না সাহেব, এ তসবীর আমার স্ত্রীর!

[গিয়ে তসবীরটা নিয়ে নেয়। সাহেবরা পরস্পরের দিকে চায়। হুইলারের চোখে তিরস্কার। বির্বার্ট মাথা নত করে]

আজিজন : ওঁকে আমিই জিজ্ঞাসাবাদ করব সাহেব।

[পোটলা ফেলে ওরা চলে যায়। শের খান তা কুড়িয়ে নেয়। আজিজন ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে। শের খানের চোখে পানি]

আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।

[আজিজনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে শের খান]

চলুন আমার ঘরে।

[ওরা পা বাড়ায়। অন্ধকারেই চিন কিলীচ আসে। এদিক ওদিক তাকায়। মুখে কিছু বুঝতে না পারার অভিব্যক্তি। তারপর ধীর পায় চলে যায় ভাবতে ভাবতে। বিচ্ছিন্নভাবে আরও দু'য়েকজন যাতায়াত করে]

www.pathagar.com

।।ষষ্ঠ দৃশ্য।।

[আজিজনের ঘর। গভীর রাত। আজিজন ও শের খান কথা বলছে। ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে বারান্দায়। একটা করুণ সুরের মূর্ছনা। ঘরের পাশে চুপি চুপি রেনম্যান এসে দাঁড়ায়]

শের খান ঃ তারপর বাড়ি ফিরে দেখলাম, সে আর বেঁচে নেই। এই একটিমাত্র ছেলে ছাড়া কেউ রইল না আমার! মনে জ্বলল অশান্তির আগুন! তা' নেভাতে আমি এখানে ওখানে চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াই। তাঁরই এ তসবীর মা। কিছুই তো আর রইল না। শুধু আজও রক্ষা করে এসেছি এ তসবীর! আমি এবার আসি মা।

আজিজন ঃ আর একটু বসুন। আমার দুঃখ যে আপনার চেয়ে বেশি! ষোল বছর আগে আমার পিতাজীর উপর হয়েছিল এমনি জুলুম! আজও আমি কল্পনায় দেখতে পাই— সেই সাজানো ঘর ভেঙ্গে দিয়ে শয়তানেরা অট্টহাসি হাসছে। আর আমি মায়ের কোলে ভয়ে মুখ লুকিয়ে আছি!

শের খান ঃ আজিজন! বেটি! আমি জানি সে ইতিহাস। সে ইতিহাস তোমার একার নয়, সারা দেশের। তাই তো আজ সবারই দৃঢ় পণ, ওই শয়তানদের ভাগাও। তাইতো বেটি এ বুড়ো বয়সেও ওই মুক্তি-সেনাদের ফরমাস খাটছি হাসিমুখে। আশা আছে, যদি দেশের মুখে আবার হাসি ফোটে!

আজিজন ঃ কিন্তু আমি? আমি যে এক নাচওয়ালী!

শের খান ঃ সবাইকে নিয়ে এ দেশ। কেউ কারও ঘৃণ্য নয় বেটি।— আমি এবার আসি। আমাকে এখনও দু'একটা ঘাঁটি ঘুরতে হবে।

আজিজন ঃ কিন্তু ছেলেটি যে ঘুমিয়েছে!

শের খান ঃ ওকে আমি বুকে করে নিয়ে যাব মা। এই তো আমাকে করতে হয়! উহ্! কতদিন পর আজ যেন পরম শান্তিতে একটু সময় কাটিয়েছি। হয়তো তোমার কাছে এসে আমি আমার হারানো ঘরের শান্তির পরশ পেয়েছিলাম। আবার সেই পথ, সেই আগুন, সেই শয়তান-বদমাসদের ব্যবহার! আহ্, আমি তখন সব ভুলে যাই বেটি! ওই পথের বাস্তবতা আমাকে অস্থির করে তোলে। জানিস বেটি, কত হারামখোর, কত গোলাম ওই পথে-ঘাটে?

www.pathagar.com

না, আমি যাই, আমি যাই।

[ছেলেটিকে বুকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। ব্লেনম্যান একটু আগেই সরে পড়েছে। আজিজন সর্বহারার মত দাঁড়িয়ে থাকে]

আজিজন ঃ বিব্‌বু!

[বিব্‌বু আসে]

বিব্‌বু ঃ আপনি আজ ঘুমুবেন না বিবি সাহেবা?

আজিজন ঃ আমার সেতার নিয়ে আয়।

[বিব্‌বু গিয়ে সেতার নিয়ে আসে। আজিজন আনমনে সেতারের তারে ঝংকার তোলে। তারপর কি ভেবে নিয়ে সেতারের উপরই মাথা রেখে ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে। আকবর এসে ডাকে—]

আকবর ঃ আজিজন। বিবি আজিজন।

[আজিজন মুখ তুলে চায়]

আজিজন ঃ কি চাও আকবর?

আকবর ঃ চাই তো অনেক কিছুই— মানে এলাম কিছু গানবাজনা শুনতে।

আজিজন ঃ এতরাত্রে গান বাজনা? তোমরা আমাদের কি ভাব বল তো?

আকবর ঃ না— ভাবি, তোমরা তো বেশ ভাল মানুষ।

আজিজন ঃ মানুষ ভাবলে এখন বিদায় হও। এত রাত্রে গান বাজনা শোনা যায় না।

আকবর ঃ মেজাজটা একটু যেন বেগম-মার্কা? কারণ কি?

আজিজন ঃ কারণ, আমরাও মানুষ।

আকবর ঃ হ্যাঁ, মানুষ নাচওয়ালীর কাছেই তো মানুষ গানবাজনা শুনতে আসে।

আজিজন ঃ আমি যে নাচওয়ালী, তা ভাল করেই জানি আকবর। তোমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। এবার যাও।

আকবর ঃ শামসুদ্দিনকে নিয়ে সাহেব-বেগম খেলা খেলবার সাধ হয়েছে নাকি?

আজিজন ঃ সে সাধ পূরণ করার সাধ্য কি নেই মনে কর?

আকবর ঃ যাক, রাত্রিবেলায় হাসি পেলে অন্যের ঘুম ভাঙ্গতে পারে। আসি।

[হাসি চেপে বেরিয়ে যায়। বিব্‌বু আসে]

বিব্‌বু ঃ বিবি সাহেবা!

আজিজন ঃ কি রে বিব্‌বু?

www.pathagar.com

বিবুবু ঃ দু'দিন ধরে যে আপনার কি হল, কিছুই বুঝতে পারছি না।

আজিজন ঃ কেন? তুইও তো মানুষ। চারদিকে মানুষের এই লাঞ্ছনা, মর্মভেদী আর্তনাদ, তুই কি একটুও অনুভব করতে পারিস না? আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে মানুষের ঘর বাড়ী, আশা ভরসা। সে আগুনের আঁচ কি তোর গায়ে একটুও লাগে না? (শামসুদ্দীন আসে। বিবুবু চলে যায়) শামসুদ্দিন শাম্‌স্‌!

শামসুদ্দিন ঃ কী হয়েছে আজিজন?

আজিজন ঃ কই, কিছু হয়নি তো!

শামসুদ্দিন ঃ কিন্তু সন্ধ্যার আজিজনকে তোমার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

আজিজন ঃ আজ তোমাদের কি হচ্ছে শামসুদ্দিন? আমাকে বলবে বলেছিলে। তোমাদের চোখ-মুখের ভাবও তো আমি আর বুঝতে পারছি না!

শামসুদ্দিন ঃ শোন। কাল ভোরে তোমাকে নতুন জায়গায় রেখে আসব। তোয়ের থেকো, কেমন?

[শামসুদ্দিন আজিজনের চোখ মুছে দেয়]

আজিজন ঃ কোথায়?

[আজিজনের যেন কিছুই মনে নেই]

শামসুদ্দিন ঃ নতুন ঘরে। এ ঘরে তোমাকে আর রাখতে চাই না আমি।

আজিজন ঃ বুঝতে পারছি না তো!

শামসুদ্দিন ঃ সেই নতুন ঘর তুমি সাজিয়ে রাখবে। আমি এখানকার কাজ সেরে তোমার কাছে হাজির হব। বুঝতে পারছ না? সেই নতুন ঘরে চাওয়া-পাওয়ার আনন্দে জীবন ভোর করে দেব আমরা। তখন তাই তো তোমাকে বলে গেলাম!

আজিজন ঃ শামসুদ্দিন! (এক অজানা পুলকে নেচে ওঠে আজিজনের মন। কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখে আবার নিরাশা নেমে আসে) কিন্তু শামসুদ্দিন–

শামসুদ্দিন ঃ এস, সব তোমাকে বুঝিয়ে বলছি।

[ওরা ঘরে যায়। বারান্দার এককোণে ব্লেনম্যানকে দেখা যায়। সে ওদের কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করছে, এমন সময় পেছন দিক দিয়ে রাকীব আসে সন্তর্পণে। রাকীবের হাতে পিস্তল]

রাকীব ঃ ব্লেনম্যান!

[ব্লেনম্যান চমকে ওঠে]

www.pathagar.com

ব্লেনম্যান ঃ কে?

রাকীব ঃ বুঝতে পারছ বন্ধু? হাত ওঠাও। (ব্লেনম্যান হাত ওঠায়। শামসুদ্দিন ও আজিজন বেরিয়ে আসে ঘর থেকে) তোমাদের খবরাখবর আমরাও রাখি। শামসুদ্দিন! ব্লেনম্যানের অস্ত্রগুলো কেড়ে নাও। (শামসুদ্দিন তা-ই করে) বড় দুঃখ ব্লেনম্যান, খবর নিয়ে সাহেবকে আর বলতে পারলে না। যাক, তোমাকে মারব না। সময় যদি আসে, সাহেবকে বলতে পারবে। এবার এস। আমাদের আড্ডায় নিয়ে যাই। কারা কারা সাহেবদের অসুবিধা ঘটাচ্ছে, চিনতে পারবে।

ব্লেনম্যান ঃ না রাকীব, তার চেয়ে আমাকে মেরেই ফেল। আমি তোমাদের কেউ নই! আমি দৌ-আসলা, আমি গুপ্তচর!

রাকীব ঃ কিন্তু তুমি যে সাহেব! ওদের আপন জন!

ব্লেনম্যান ঃ সাহেব! (ম্লান হাসে) হ্যাঁ, সাহেব। কালো সাহেব। জন্মের পর বাপকে দেখি নি! তবু সাহেব! আমার নেটিভ মায়ের ছেলে— কিন্তু তোমাদের কেউ নই। চল, কোথায় নিয়ে যাবে।

রাকীব ঃ শামসুদ্দিন! তুমি এখ্খুণি এস।

[ব্লেনম্যানকে নিয়ে চলে যায়]

শামসুদ্দিন ঃ চারদিকে ওদের চর লেগেছে। চলি আজিজন।

আজিজন ঃ আমাকে নেবে?

শামসুদ্দিন ঃ তুমি যাবে? আমাদের সঙ্গে? পাগলি।

আজিজন ঃ তোমাকে ভালবেসেছি। পেয়েছি তোমার ভালবাসা। কিন্তু আমার দেশ— শামসুদ্দিন! আমাকে সঙ্গে নাও।

শামসুদ্দিন ঃ ঘরে যাও আজিজন। নতুন স্বপ্নে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দাও। তোমার হাতে মৃত্যুর বাণ শোভা পায় না।

[আজিজনকে শামসুদ্দিন আদর করে। শামসুদ্দিনের বুকে মাথা রাখে আজিজন। বুকের কাছ থেকে শামসুদ্দিন রক্তপদ্ম সরিয়ে আনে। আজিজন রক্তপদ্মের দিকে হাত বাড়ায়]

আজিজন ঃ এ রক্তপদ্ম আমায় দেবে না?

শামসুদ্দিন ঃ (মাথা নেড়ে) না। বুকের মমতায় জন্ম নেয় যে শ্বেতপদ্ম, তোমায় দিয়েছি তা-ই। দেশের খুনে রাঙ্গা এ পদ্ম নিয়ে আমাদের পথ চলা। আমি আসি।

[ধীর পায়ে চলে যায়। আজিজন ভাবে। তারপর কি যেন স্থির করে নিয়ে সে-ও শামসুদ্দিনের পথে পা বাড়ায়। অন্যদিক দিয়ে আসে

www.pathagar.com

হুইলার সাহেব আর আকবর]

হুইলার ঃ আজিজনকো বোলাও।

[আকবর এগিয়ে গিয়ে আজিজনকে ডাকে]

আকবর ঃ আজিজন! বিবি আজিজন! (বিব্‌বু বেরিয়ে আসে) আজিজনকোথায়? জেনারেল সাহেব তশরিফ এনেছেন। (বিব্‌বু ব্যস্ত হয়ে ওঠে) সাহেব বসবেন না। তুমি আজিজনকে ডেকে দাও।

বিব্‌বু ঃ বিবি আজিজন ঘরে নেই। একটু আগেই বাইরে গেছে। কোথায়, জানি না।

[আকবর সাহেবের কাছে আসে]

হুইলার ঃ এই গভীর রাতে। কার সঙ্গে?

আকবর ঃ বিব্‌বু কিছুই বলতে পারে না। হয়তো শামসুদ্দিনের আড্ডাতেই গেছে।

হুইলার ঃ হুঁম্! তুমি ঠিক জান শামসুদ্দিনের সাথে আজিজনের মুহব্বত আছে?

আকবর ঃ এ আমি হলপ করে বলতে পারি সাহেব। কথা ছিল, আজিজন সিপাহীদের খবর আমাদের দেবে। কিন্তু সে করছে ঠিক তার উল্টো।

[বিবার্ট ও কিলীচ খান আসে]

হুইলার ঃ ব্লেনম্যানের খবর কি?

বিবার্ট ঃ কোন সন্ধান নেই তার।

কিলীচ ঃ কোথাও ব্লেনম্যানকে পাওয়া যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই ওই শয়তানেরা ব্লেনম্যানকে গায়েব করে ফেলেছে।

হুইলার ঃ আজিজনও ঘরে নেই!

বিবার্ট ঃ এখন কি করতে হবে মাই জেনারেল? কিলীচ খান জানে, আজ ফজরে সিপাহীরা মসজিদে জমা হবে।

হুইলার ঃ আগেই সে খবর পেয়েছি।... চায়েন কিলীচ।

কিলীচ ঃ সাহেব!

হুইলার ঃ ছাউনীর বাইরে যে দুর্গ বানানো হচ্ছে, তার কদ্দুর?

কিলীচ ঃ বাইরের দুর্গে আমাদের আশ্রয় নেওয়া উচিত নয় জেনারেল সাহেব! দুশমনের আক্রমণে তা সহজেই ভেঙে পড়বে!

হুইলার ঃ দেখি, ভেবে দেখি।...আজ রাত্রি ভোরেই আমাদের লোকজন

www.pathagar.com

ওই মসজিদে আক্রমণ করবে। যাওয়া যাক। (চলতে গিয়ে) এই তো আজিজন!

[বিস্মিতা আজিজন এগিয়ে আসে]

আজিজন ঃ আপনারা এখানে!

কিলীচ ঃ সাহেব বললেন, আমি নিজে যাব আজিজনের বাড়ীতে। তুমি তো আর সামান্য মেয়ে নও। তুমি হলে আমাদের সকলের—

হুইলার ঃ চায়েন কিলীচ! (কিলীচ খান কথা বলে না) কোন খবর আছে আজিজন? সিপাহীকা কোঁই খবর?

[আজিজন সাহেবের উদ্দেশ্যটা আঁচ করে নেয়]

আজিজন ঃ খবর— মানে... হ্যাঁ, আছে।

হুইলার ঃ শামসুদ্দিন কোথায় আছে?

আজিজন ঃ তা আমি জানি না সাহেব।

হুইলার ঃ হোয়াই নট? শামসুদ্দিন তোমাকে পেয়ার করে। তার সাথে তোমার বহুত মুহব্বত আছে। তার খবর তো তুমিই জানবে।

আজিজন ঃ না, শামসুদ্দিনের সঙ্গে আমার কোন মুহব্বত নেই। আমার জলসায় সবার মত শামসুদ্দিনও আসে।

হুইলার ঃ আকবর!

আকবর ঃ আজিজন মিছে কথা বলছে সাহেব।

আজিজন ঃ না। সত্যি কথাই বলছি।

বিবার্ট ঃ ব্লেনম্যান কোথায়?

আজিজন ঃ ব্লেনম্যান ওদের হাতে ধরা পড়েছে।

বিবার্ট ঃ কিন্তু এ খবর আগে জানলাম না কেন?

[আজিজন কি ভেবে নেয়]

আজিজন ঃ এ খবর দিতেই আমি সাহেবের কুঠিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি, সাহেব চলে এসেছেন।

বিবার্ট ঃ My General, she is telling all lies. She is certainly a traitor.

হুইলার ঃ Hm! She would be under guard till we attack the sepoys... হ্যাঁ দেখো আকবর। আজিজন আমাদের বহুত আচ্ছা হেল্‌পার আছে। সিপাহীরা তার উপর জুলুম করতে পারে। তুমি ফজরতক তাকে গার্ড করবে। এস বিবার্ট।

www.pathagar.com

কিলীচ ঃ ঠিক, এ বন্দোবস্ত বিলকুল ঠিক।

[কিন্তু দেখে হুইলার সাহেব চলে গেছেন, অগত্যা সেও যায়]

বিবার্ট ঃ নওজোয়ান। আজিজনকে ভালো করে গার্ড করবে। আজিজন বলে, শামসুদ্দিন তার কেউ নয়! আজিজন এখন আমাদের কয়েদী। যাও।

[উৎসাহ দিয়ে রহস্য সৃষ্টি করে বিবার্ট চলে যায়। আজিজনও সবকিছু বুঝে নিয়ে কর্তব্য স্থির করে নেয়। বিব্‌বু এসে পাশে দাঁড়ায়]

আকবর ঃ ভেবে আর কি হবে বিবিজান। রাতটাই তোমার বিফলে গেল।

[আজিজনের মুখে তখন এসেছে মন ভুলানো। হাসি, চোখে বিলোল কটাক্ষ]

আজিজন ঃ কোন অবস্থায়ই আজিজনের রাত বিফলে যায় না। এত দিন এখানে আসছ সিপাহী, জান না, আমরা সহকার লতা! যে গাছকেই কাছে পাই, তাকেই জড়িয়ে আমাদের সময় কাটে?

আকবর ঃ (অবাক হয়ে যায়) এ্যাঁ! তবে যে— তবে যে, তখন বড় মেজাজ দেখালে?

আজিজন ঃ তখন সত্যিই আমার মেজাজটা ভাল ছিল না।

আকবর ঃ এখন সেটা ভাল হয়ে গেল কি সাহেবের হুকুমেই?

আজিজন ঃ না। রাতের তাগিদে। রাত হয়েছে অনেক। কিন্তু কোনই ফল হল না। সাহেবদের কাজ করে করে এই মোহিনী রাত বিফলে গেল। আকবর! আমি আর পারি না। আমার আঁখিতে নেমেছে নেশা। বুকটা মাতাল হয়ে উঠেছে।

[আজিজনের সারা দেহে বিলাসের আমন্ত্রণ]

আকবর ঃ ভুল করে আমাকে ভুলাতে চাইছ আজিজন। আমি সিপাহী। নির্মম হাতে কিছু লুটে নিতেও আমার বাধে না।

আজিজন ঃ হ্যাঁ, এমন রাতও জীবনে আসে যখন লুণ্ঠিতা হতেও মন আকুল হয়ে ওঠে। বিব্‌বু! আমি নাচ দেখব। আর শরাব লাও।—আকবর! শামসুদ্দিন আমাকে দাগা দিয়েছে।

আকবর ঃ দাগা দিয়েছে? তোমাকে? শামসুদ্দিন?

আজিজন ঃ আজ আমার ঘরে সে এসেছিল। আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। সাহেব যেন অন্তর্যামী! তোমাকে এখানে রেখে গিয়ে কি ভালই না করেছে। জান, শামসুদ্দিন আমাকে বলে— সে আর আমার

www.pathagar.com

মুখ দেখবে না।

আকবর : হ্যাঁ, ঠিকই হয়তো বলেছে। আসছে ফজরে মসজিদে জমায়েত হচ্ছে ওরা। ওরাও জমায়েত হবে, আর সাহেবদের কামানও গর্জে উঠবে।

[আজিজন চমকে ওঠে! তারপর নিজেকে আবার আড়াল করে]

আজিজন : এ্যাঁ!— তাহলে বেশ হয়।

[বিব্‌বু আসে শরাব নিয়ে। আজিজন তা হাত বাড়িয়ে নেয়]

বিব্‌বু, নাচ। আমি আসছি।

[আজিজন ভেতরে যায়। বিব্‌বু নাচ আরম্ভ করে। কতক্ষণ পরে দরজায় এসে দাঁড়ায় আজিজন। কাগজে রাখা কি একটা দেখে নিয়ে তা গোপন করে। তারপর আকবরের পাশে বসে নাচ দেখে। নিজের পেয়ালায় চুমুক দেয়]

আজিজন : তুমি কি একটুও খাবে না?

আকবর : তোমার আজ কি হল আজিজন?

আজিজন : বুঝতে পার না?

আকবর : দাও, সামান্য পরিমাণে। তোমাকে সত্যি আমি বুঝতে পারি না। তাই মাতাল হতে আমি চাই না।

আজিজন : আমার কিন্তু মাতাল হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

[আজিজন আকবরের পেয়ালায় কিছু শরাব ঢালে। তারপর আকবরের অজানায় লুকিয়ে রাখা কাগজের ছোট্ট পুরিয়া থেকে কি একটা চূর্ণ ঢেলে দেয় সে পেয়ালায়]

আকবর। আজ ফজরেই সাহেবরা মসজিদ আক্রমণ করবে?

আকবর : তোমাকে জানাতে এখন আর বাধা নেই। কারণ তুমি আমার নজরবন্দী।

আজিজন : শুধু আজ কেন? রোজ, হররোজ তুমি আমায় বন্দী করে রেখো।

[পেয়ালা তুলে ধরে আকবরের মুখে]

আকবর : নাচওয়ালী আজিজন! এর বেশি নয় কিন্তু।

[শরাব পান করে]

আজিজন : নাচ বিব্‌বু। দিলসে। (লাস্যে, হাস্যে আবহাওয়াটা যেন মাতাল হয়ে ওঠে। আকবরের চোখ দুটো ক্রমে বন্ধ হয়ে আসে যেন) তুমি আমার কোলে মাথা রেখে আয়েস কর, আর নাচ দেখ। আমার কিন্তু ঢলে পড়তে ইচ্ছা করছে?

আকবর : কিন্তু মনে রেখো— আমি ঘুমুব না।

www.pathagar.com

আজিজন : ঘুমিয়ো না। আমি ঘুমুলে তুমি আমার পাশে বসে জেগে থেকো।

[কিন্তু আকবর আজিজনের কোলে মাথা রেখেই চোখ বন্ধ করে। বিব্বু নেচে চলে। কতক্ষণ পর আজিজন দেখে, আকবর ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মাথাটা সরিয়ে দিয়ে আজিজন উঠে দাঁড়ায়। বিব্বুর নাচ থামে। আজিজনের অভিনয়ও শেষ হয়]

বিব্বু : আজ রাতটা কেমন রহস্যে আর আতঙ্কে ভরে গেছে বিবিসাহেবা! উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন?

আজিজন : হ্যাঁ, ঘুমুতে বাধ্য হয়েছে। আমি চললাম বিব্বু।

বিব্বু : আমার ভয় করছে যে!

আজিজন : পাগলী! কিচ্ছু ভয় নেই। ভোরেই আমি তোর খবর নেব। এর ঘুমও তার আগে ভাঙ্গবে না।

বিব্বু : আপনি এত রাতে কোথায় যাবেন?

আজিজন : সিপাহীদের গোপন এক আস্তানায়। কত কষ্ট করে পেতে হয়েছে সে খবর? আমি যাই।

বিব্বু : এই রাতে না গেলেই কি নয়?

আজিজন : তুই কি এখনো বুঝতে পারিস না? সাহেবদের পরিকল্পনা ওরা যে জানে না! ঘরে যা।

[চলে যায় আজিজন। বিব্বুও ঘরে যায়। আঙ্গিনায় ঘুমিয়ে আছে আকবর। কতক্ষণ পরে সন্তর্পণে পা ফেলে এগিয়ে আসে কিলীচ খান]

কিলীচ : আরে! আমি এলাম চুপি চুপি। ভাবলাম, বুঝি কত কিছু হচ্ছে! তা নয়, ব্যাটা এখানে পড়ে ঘুম দিচ্ছে?...এই আকবর! আকবর! আরে ওঠ্। কোন্ সর্বনাশ নাকি করেছিস! (ডাকাডাকিতে আকবর ওঠে না) আজিজন! আজিজন! বিব্বু! (বিব্বু আসে) আজিজন কোথায়?

[কিলীচ খানের ঠেলাঠেলিতে আকবর জেগে ওঠে]

বিব্বু : বিবি আজিজন নেই!

আকবর : (হঠাৎ সম্বিত পেয়ে) নেই!

কিলীচ : (রাগে) নেই।

[আকবরের জামা ধরে টেনে তোলে]

আকবর : এ্যাঁ!!

কিলীচ : (রেগে) হ্যাঁ।

[রাগে ফুঁসতে থাকে কিলীচ খান। ঠাঁয় বসে পড়ে আকবর]

www.pathagar.com

।।সপ্তম দৃশ্য।।

[একটা ভাঙ্গা বাড়িতে কালো রাত। গোপন আলোচনা করছে আজিমুল্লাহ্ খান, রাকীব ও শামসুদ্দিন]

আজিমুল্লাহ্ : টিকা সিং এতক্ষণে নানাসাহেবের কাছে পৌঁছে গেছে। দুন্দুপন্দু নানাসাহেব আর পিছিয়ে যেতে পারবেন না। কিন্তু তোমাদের প্রস্তুতি সুসম্পন্ন হয়েছে তো?

শামসুদ্দিন : হয়েছে জনাব। এই রাত্রি শেষের সুবৃহে সাদেক আমাদের আলোঝরা দিনের সূচনা করবে।

আজিমুল্লাহ্ : তা-ই যেন হয়। শত বছরের দীর্ঘ ইতিহাস, কোম্পানীর জুলুম আর শঠতা ভরা এক দীর্ঘ রাত্রির ইতিহাস। এ দেশীয় প্রধানদের স্বার্থ আর বেঈমানীর ইতিহাস। এ রাত্রির অবসান হোক, দিনের আলোয় দেশের ঘুমন্ত প্রাণ আবার জেগে উঠুক।

শামসুদ্দিন : কিন্তু জনাব, দুন্দুপন্দু নানাসাহেব জানেন, এই বিপদের দিনে কোম্পানী তাঁকে হাতে পাওয়ার চেষ্টা করবে। তিনি হয়তো সে সুযোগ গ্রহণও করবেন। কিন্তু তা আমরা করতে দেব কেন?

রাকীব : শুধু নানাসাহেব কেন? হিন্দু মুসলমান অনেক সাহেবই এ বিপ্লবে অংশ নিচ্ছেন নিজেদের স্বার্থ হানি হয়েছে বলে, দেশের দুঃখে কাতর হয়ে নয়।

আজিমুল্লাহ্ : আমি জানি, কোম্পানীর হাতে মুঘল বাদশাহীর দুর্দশা দেখে যে হিন্দু প্রধানেরা আনন্দ পেয়েছিলেন, তারাও আজ ইংরেজের স্বরূপ বুঝতে পেরেছেন। বুঝতে পেরেছেন— কোম্পানী শুধু অযোধ্যার নওয়াবকেই পথে বসায় নি, পথে বসিয়েছে পেশোয়াকেও। দিল্লীর প্রাসাদই যে আজ শুধু ভেঙ্গে পড়ছে, তা নয়। ফাটল ধরেছে ঝাঁসীরও প্রতি কক্ষে। কোম্পানী আজ হিন্দু মুসলমানের, ছোট বড় সকল দেশবাসীর একক দুশমন। নানাসাহেবকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি। শামসুদ্দিন, রাকীব!

রাকীব : জনাব!

আজিমুল্লাহ্ : সিপাহীরা যেন বিশৃংখল না হয়। কোন অন্যায় , কারও প্রতি কোন জুলুম যেন তারা না করে।

রাকীব : সবাইকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জনাব।

আজিমুল্লাহ্ : স্মরণ আছে তো— আমাদের যেমন টাকা নেই, তেমনি নেই আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র?

www.pathagar.com

রাকীব : খাজাঞ্চীখানা আর অস্ত্রাগার দখল করতে পারলেই আমাদের সে সমস্যার সমাধান হবে। তা স্মরণে রেখেই আমাদের প্রথম আক্রমণ পরিচালিত হবে।

আজিমুল্লাহ্ : তাহলে সব কিছুই প্রস্তুত?

রাকীব : প্রস্তুত জনাব।

আজিমুল্লাহ্ : একটু পরে ভোর হবে।

রাকীব : একটু পরেই সিপাহীদের কামান গর্জনে সাহেবেরা জেগে উঠবে জনাব।

আজিমুল্লাহ্ : আমি আসি। তাঁতিয়াটোপীর ঝটিকা বাহিনীর সাহায্য আমরা অচিরেই পাব রাকীব।

[সন্তর্পণে আজিজন আসে। সবাই চকিতে অস্ত্র বের করে একসঙ্গে বলে ওঠে—]

সকলে : কে?

আজিজন : আমি। আজিজন। (আজিমুল্লাহ্ খান ও রাকীব শামসুদ্দিনের দিকে তাকায়। শামসুদ্দিন মাথা নত করে) কিসের আকর্ষণে আমি চলে এসেছি, বলতে পারি না জনাব। কিন্তু আমি দুশমন নই।

রাকীব : আজিজনকে আমরা দলে পেতে পারি জনাব।

[আজিমুল্লাহ্ খান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নেন আজিজনকে]

আজিজন : সাহেবদের গোপন কথা আমি জানি জনাব। ওরা আমাকে জোর করে তাদের গুপ্তচর বানিয়েছে।—জনাব! আমি সামান্যা এক নাচওয়ালী। কিন্তু জানি না, কি করে দেশের এ ডাক শোনার স্পর্দ্ধা আমার হল। আমি কোন প্রয়োজনে লাগতে পারি না জনাব?

[শামসুদ্দিন আজিজনের দিকে অবাক হয়ে তাকায়]

আজিমুল্লাহ্ : হুঁম্— রাকীব, ওর কাছ থেকে সাহেবদের গোপন কথা জেনে নিয়ে তার ব্যবস্থা কর।—দেশের ডাকে সাড়া দেবার অধিকার সবারই আছে মা। মানুষের দুঃখে যার মন কাঁদে, আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন। আল্লা'র কাছে কেউ ছোট নয়, কেউ সামান্য নয়। আল্লা' তোমার মকসুদ পুরা করবেন। রাকীব শামসুদ্দিন তোমাকে কাজের নির্দেশ দেবে! (আজিজনের চোখেমুখে এক অপূর্ব তৃপ্তির হাসি) আমি আসি। মারাঠা শিবিরে এসময়ে থাকা আমার বিশেষ দরকার। সুবহে সাদেকের আশা, তোমাদের আশা সফল হোক। আল্লাহ্ সিপাহীদের সালামত করুন। আল্লাহ্ হাফেয।

www.pathagar.com

সকলে : আল্লাহ্ হাফেয!

[চলে যান আজিমুল্লাহ্ খান]

রাকীব : কি খবর আজিজন?

আজিজন : সাহেবরা জেনেছে, সিপাহীরা আজ ফজরে মসজিদে জমায়েত হবে। ওরা সে মসজিদ আক্রমণ করবে।

[রাকীব ও শামসুদ্দিন বিস্মিত হয়]

রাকীব : ওদের পরিকল্পনা তুমি ঠিক জান?

আজিজন : জানি। আমার ঘরে আমাকে ওরা কয়েদ করেছিল। কিন্তু আমি চলে এসেছি।

শামসুদ্দিন : কি করে এলে?

আজিজন : পরে বলব তোমাকে, সব বুঝিয়ে বলব।

রাকীব : শামসুদ্দিন, তুমি আজিজনকে নিয়ে যাও। আমি খান সাহেবকে বলে আসছি। ভয় নেই। টিকা সিং সতর্ক রয়েছে।

[ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যায় রাকীব]

শামসুদ্দিন : কিন্তু এখানে তুমি কি করে এলে?

আজিজন : পথে পথে ঘুরে সন্ধান পেয়েছি।

শামসুদ্দিন : কেন এলে?

আজিজন : জানি না শামসুদ্দিন। শুধু জানি, মনের ঝড় বেড়েই চলেছে। কিসের ইশারায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে এক সামান্য নাচওয়ালীর মন!

শামসুদ্দিন : এ পাগলামী ছাড়। ঝড়ের দিনে তুমি আমার ঘরে বসে শান্ত দিনের স্বপ্ন দেখ। তোমার ভালবাসার সম্পদ নিয়ে আমাকে পথে চলতে দাও।

আজিজন : শামসুদ্দিন! আমাদের ভালবাসাকে ঘরেই শুধু কয়েদ করে রাখতে চাও কেন? বাইরের আলো বাতাসে তাকে ছড়িয়ে পড়তে দাও। আমাকে তোমার পথের সাথী করে নাও।

শামসুদ্দিন : তুমি কি পাগল হয়েছ আজিজন?

আজিজন : হয়তো তাই। কিছুদিন থেকেই মসজিদের আযান আমাকে উন্মনা করে তুলত। শামসুদ্দিন! মসজিদে আমাকে নিয়ে যাবে বলে কথা দিয়েছিলে। সেখানে তুমি আজ আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। দেশের কাজে আমাকে শরিক হতে দাও।

www.pathagar.com

শামসুদ্দিন : কি কাজ তুমি করবে?

আজিজন : জানি না। তবু মনে হয়, করবার কত কি আছে!

[দূরে আযান]

শামসুদ্দিন : সুবহে সাদেক! আজিজন! তুমি আরও ভেবে দেখ। (দূরেবন্দুকের আওয়াজ। পর পর কয়েকবার) একি! এ কার বন্দুক গর্জে উঠেছে?

আজিজন : গোরা সৈন্যেরা আক্রমণ করেছে। শামসুদ্দিন!

শামসুদ্দিন : আজিজন! আমি যাই। আজ তুমি ওখানে যেয়ো না। (দূরে কোলাহল) আজ ওখানে শুধু মৃত্যুর খেলা। আমি যাই আজিজন।

[শামসুদ্দিন দ্রুত পায়ে চলে যায়]

আজিজন : শামসুদ্দিন! আমাকে সঙ্গে নাও। শাম্‌স।।

[ডাকতে ডাকতে আজিজনও বেরিয়ে যায়]

।।অষ্টম দৃশ্য।।

[কানপুরের রাস্তা। অন্ধকারে গোলাগুলী ছুটছে। একটা বিশৃংখলা, কোলাহল। উত্তেজিত শের খানের গলা শোনা যায়—]

শের খান : নওজোয়ান! কোন ভয় নেই। এগিয়ে যাও। মনে রেখো তোমার দেশ, তোমার ভাই বোন, তোমার দিকে চেয়ে আছে। আজ তোমার সামনে এসেছে শুভ লগ্ন। তোমার দেশে ওই সাদা বানর, ওই কটা চোখের ব্যাপারীরা তোমার মালিক সেজে বসেছে। এ তোমার লজ্জা, তোমার অপমান। আজ সুযোগ এসেছে। প্রতিশোধ নেবার সুযোগ।

[বলতে বলতে রাস্তায় এসে দাঁড়ায় শের খান। সঙ্গে ছেলে। হাতে একটা খোলা তলোয়ার। রাকীব আসে ব্যস্ত হয়ে]

রাকীব : গোরা সৈন্য অতর্কিতে সিপাহীদের আক্রমণ করেছে। খাঁ সাহেব, এখানে থাকবেন না।

[শামসুদ্দিন আসে ব্যস্ত হয়ে]

শামসুদ্দিন : রাকীব! সিপাহীরা বিশৃঙ্খল হয়ে পালাচ্ছে! টিকা সিং তাদের ফেরাতে পারছে না।

রাকীব : কিন্তু ফেরাতে হবেই। আমার সঙ্গে এস। খাঁ সাহেব, ঘরে যান।

[দু'জনেই ব্যস্ত হয়ে চলে যায়]

www.pathagar.com

শের খান ঃ কেন যাব? ঘর কি আছে? আর থাকলেই বা যাব কেন? আমার দেশ, আমার মাটি। এই মাটির উপরই থাকব আমি। গোরাদের ফিকে রক্তে রাঙ্গা করব বাপদাদার এই তলোয়ার। কিরে বেটা, ভয় পাস? শের কা বেটা শের তুই। ভয় পাসনে। আল্লা' আছেন। (বাইরে তুমুল কোলাহল) সিপাহীরা নাকি পালিয়ে যাচ্ছে। চল, ফিরাইগে'।

[ছেলেসহ চলে যায়। সন্তর্পণে কিলীচ খান ও আকবর আসে]

কিলীচ ঃ সিপাহী! খুব সাবধান। নোকরি করি, তাই আসতে হল। কিন্তু অবস্থা খুবই খারাপ!

আকবর ঃ খারাপ তো সিপাহীদের জন্য। আমাদের সাহেবরা তো জিতছে!

কিলীচ ঃ এখনও কিচ্ছু বলা যায় না। মেয়েদের মনের মতই এই হারজিত। এখন আছে সাহেবদের , তখন হবে সিপাহীদের। তাছাড়া ছুটছে গোলাগুলী। কার গুলী কখন এসে লাগবে, ঠিক নেই। কিন্তু উড়ে যাবে।

[বন্দুকের আওয়াজ। কিলীচ খান হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে]

কিলীচ ঃ ওই শোন। চলে এস।

আকবর ঃ কিন্তু–

কিলীচ ঃ কোন কিন্তু নয়। আগে জান, তারপর নোকরি। ধর, নিয়ে চল আমাকে।

[গা তার কাঁপছে। পা চলছে না। আকবর তাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়। এদিক ওদিক সিপাহীরা ছুটাছুটি করছে। পালিয়ে এসে আশ্রয় নিচ্ছে এখানে সেখানে। শামসুদ্দিন আসে]

শামসুদ্দিন ঃ ভাই সিপাহী! পালাও কেন? ওই দেখ, রাকীব আর টিকা সিং-এর নেতৃত্বে অন্য সিপাহীরা যুদ্ধ করছে। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। ওই বিদেশী বেনিয়া তোমার ধনের দুশমন, জনের দুশমন, মানের দুমশন, দেশের দুশমন! এদেশের লাখো মানুষ গোটা কয় ইংরেজের কেনা গোলাম। এ–ও তোমরা সহ্য করবে? ফিরে চল। ওদের স্পর্দ্ধার উত্তর দাও। (বাইরেকোলাহল। বন্দুকের আওয়াজ।) ভাইসব! ফিরে চল।

নেপথ্যে

রাকীব ঃ শামসুদ্দিন!

শামসুদ্দিন ঃ রাকীব!

www.pathagar.com

[ব্যস্ত হয়ে চলে যায়। ছেলেসহ শের খান আসে]

শের খান ঃ এই যে! পালিয়ে আসা কাপুরষ! তোমরা রাখবে দেশের মান! এখানে কি! ওইখানে যুদ্ধ হচ্ছে। হাজার সেপাই লড়াই করছে। লড়াই করছে টিকা সিং, শামসুদ্দিন্, রাকীব। আর তোমরা পালিয়ে এসেছ? মরবে যদি, ঘরের কোণায়, রাস্তার আড়ে মরবে কেন? ভাই ভাই এক সাথে এক আশায় প্রাণ দাও। চলে এস (বাইরে কোলাহল, বন্দুকের আওয়াজ) চল ভাই। কত কাল তো পালিয়েছ! পলাশীতে পালিয়েছ, কাটোয়াতে পালিয়েছ, উদয়নালায় পালিয়েছ, মহীশুরে পালিয়েছ। আর কত? (কোলাহল) চল ভাই। তোমার জন্মভূমিকে আযাদ কর। তোমার মান—একি! তবু তোমরা যাবে না? এ সংগ্রাম তোমাদের মুক্তি সংগ্রাম! তবু যাবে না?

[কপালে আঘাত করে]

ছেলে ঃ আব্বা!

[বাইরে বন্দুকের আওয়াজ]

শের খান ঃ চল্ বাপি। ওরা কাপুরুষ! ওরা যাবে না। আমরা এগিয়ে যাব—চল্।

[ছেলেসহ চলে যায়। আজিজন পেছন থেকে সব দেখছে। হাতে তার তেলোয়ার। আজিজন দৃপ্ত ভঙ্গিতে সিপাহীদের দিকে ফিরে চায়। বাইরে বন্দুকের আওয়াজ। সঙ্গে শের খানের আর্তনাদ। পরেই ভেসে আসে তার ছেলের 'আব্বা' ডাক। আজিজনের বুঝতে বাকি থাকে না, কি হয়েছে ওখানে। ধীর কণ্ঠে কথা আরম্ভ করে—]

আজিজন ঃ ভাই সিপাহী! তোমরা পুরুষ। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তোমাদের সংগ্রাম করতে হয়। দেশের মান রক্ষা করা, মা বোনের ইজ্জত রক্ষা করা, তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। এ কর্তব্যে সাড়া দেবে বলেই তো তোমরা সিপাহী। আজ বিদেশী দুশমন তোমাদের উপর জুলুম করছে। দেশের বাদশা বাহাদুর শা'কে অমান্য করছে ওই গোটা কয় বেনিয়া! গোলাম করে রাখছে সারা দেশকে। ভেবে দেখ, এ অবস্থায় তোমাদের কর্তব্য কি? তোমরা পালিয়ে এসেছ। তোমাদের মা বোনের উপর চলবে এবার পশুর জুলুম। সে জুলুম থেকে বাঁচতে হলে তোমাদের মা বোনকেই আজ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

www.pathagar.com

[আজিজনের কণ্ঠ আরও দৃপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে তার আওয়াজ। সিপাহীরা আস্তে আস্তে এসে জমায়েত হয়]

তা-ই যদি তোমরা চাও, চেয়ে দেখ, সামান্যা এ নারীর হাতে এই তলোয়ার কেমন খেলা করে। আর যদি মানুষের মত বেঁচে থাকতে চাও, তবে চল, বেনিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়। আমি তোমাদের সাথে থাকব। জীবনের আরাম আয়েশ ঝেড়ে ফেলে এক নাচওয়ালী যদি জীবন দিতে পারে, তোমরা পারবে না ভাইসব?

[সিপাহীরা দৃপ্ত ভঙ্গীতে এগিয়ে চলে]

ভুলে যেয়ো না, তোমাদের ওয়ালেদান একদিন লাখো দুশমনের কাফেলায় ঝাঁপিয়ে পড়ত।

[উত্তেজিত সব সিপাহী বেরিয়ে যায়। আজিজনও মুক্ত তলোয়ার হাতে ছুটে যেতে চায়]

নেপথ্যে

শামসুদ্দিন : আজিজন! আজিজন! ফিরে যাও।

আজিজন : কে? কে ডাকে আমাকে? শামসুদ্দিন! আমার শাম্‌স্‌! না না, এ ডাক আমি শুনব না, শুনব না।

[ছুটে বেরিয়ে যায়। শামসুদ্দিন দৌড়ে আসে]

শামসুদ্দিন : আজিজন!

[শামসুদ্দিন ছুটে যেতে চায়। রাকীব আসে]

রাকীব : শামসুদ্দিন! দাঁড়াও। আজিজনের পথে বাধা হয়ো না। তুমি অবুঝ নও।

শামসুদ্দিন : কিন্তু এ গোলাবৃষ্টির মধ্যে আজিজন— তার স্থান ওখানে নয়!

রাকীব : আজিজন আজ নাচওয়ালী নয়, আজিজন আজ প্রেয়সী নয়। আজিজন আজ বীর নারী। তাকে তা-ই হতে দাও। তার পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই কর। আমি টিকা সিং-এর পাশে যাচ্ছি।

[দু'জন দু'দিকে চলে যায়। বাইরে কোলাহল। বন্দুকের আওয়াজ। বিবার্ট ও হুইলার আসে]

হুইলার : ওই স্থান আর নিরাপদ নয়।

বিবার্ট : ওরা আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করেছে।

হুইলার : কিন্তু কি করে তা সম্ভব হল?— কে ওই নারী, যার নেতৃত্বে

www.pathagar.com

এমনটি সম্ভব হল?

বিবার্ট : আজিজন। সিপাহীদের প্রেয়সী, আপনার গুপ্তচর, বিবি আজিজন।

হুইলার : বিবি আজিজন?

বিবার্ট : মাই জেনারেল, এ-অবস্থায় আমার শেষ কর্তব্য আমি করছি। ওই আজিজন-

[বন্দুক চালায় বিবার্ট। অদূরে আজিজনের আর্তনাদ। কিন্তু কোলাহল আরও বাড়ে]

হুইলার : কিন্তু সিপাহীরা যে আরও ক্ষেপে গেল!

বিবার্ট : চলে আসুন, মাই জেনারেল।

[দু'জন ব্যস্ত হয়ে চলে যায়। শের খানের ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাস্তা পেরিয়ে চলে যান আজিমুল্লাহ্ খান। ক্রমে কোলাহল দূরে মিলিয়ে যায়। রাকীব এসে দেখে অন্যদিক দিয়ে ধীর পায়ে শামসুদ্দিন আসছে]

রাকীব : শামসুদ্দিন!

[শামসুদ্দিনের হাতে রক্ত মাখা ওড়না]

শামসুদ্দিন। আজিজন-

[ধীর কণ্ঠে উত্তর দেয় শামসুদ্দিন-]

শামসুদ্দিন : আজিজন প্রাণ দিয়েছে রাকীব।

রাকীব : বীর নারী। তারই জন্য আমাদের এ সাফল্য। কিন্তু তোমার হাতে-

শামসুদ্দিন : আজিজনের রক্ত-রাঙ্গা কাপড়। রাকীব! সে চেয়েছিল মসজিদে যেতে। সেদিন সঙ্গে নেই নি। আজ সেখানে রেখে এসেছি। সে চেয়েছিল রক্তপদ্ম। দেই নি। আজ তার বুকের উপর রেখে এসেছি। নিয়ে এসেছি তার রক্ত মাখা-

[হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পায়]

রাকীব! আজিজনকে আমি পূর্ণভাবেই পেয়েছি। আজ আর কোন দ্বিধা নেই। আজ শুধু সংগ্রাম, শুধু মুক্তির নেশায় এগিয়ে চলা!

[নেপথ্যে সিপাহীদের জয়োল্লাস। উদ্দীপ্ত সুবেদার শামসুদ্দিন এগিয়ে চলে। সঙ্গে চলে রাকীব]

[যবনিকা]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রসঙ্গত

'আঠার শ' সাতান্ন' আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ক্রান্তিকাল। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এদেশের সিপাহী-জনতার এক মরণপণ সংগ্রামের উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে আসছে এই 'আঠারশ শ' সাতান্ন'। এদেশীয় সুবিধাভোগী পরপদলেহীদের সহায়তায় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সিপাহী-জনতার এই সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল সত্য, অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে এদেশের প্রতিবাদী কন্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল সত্য, কিন্তু সেই সংগ্রাম প্রেরণার যে অক্ষয় স্বাক্ষর রেখে গেছে এদেশের আপামর জনসাধারণের মনে, তাকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারে নি।

আঠার শ' সাতান্ন সালের যে মহা আহ্বান এই উপ-মহাদেশকে চঞ্চল করে তুলেছিল, সে-আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল আমাদের এই ঢাকাও। এরই কাহিনী বিবৃত হয়েছে 'অনেক তারার হাতছানিতে'। দেশ-মুক্তির মহা আহবানের প্রতি এই যে সাড়া দান, এ আমাদের গৌরব, এ আমাদের অক্ষয় ঐতিহ্য। এই গৌরব, এই ঐতিহ্যের স্মরণেই আমাদের 'অনেক তারার হাতছানি'র প্রকাশনা।

শেখ তোফাজ্জল হোসেন

www.pathagar.com

'অনেক তারার হাতছানি' প্রসঙ্গে

পলাশীর পর থেকে আরম্ভ করে এক শ' বছরের যে সময়টা, তার ইতিহাস আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। এই সময়ের ইতিহাসকে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয় নি। অথচ এই এক শ' বছরের ইতিহাস আমাদের জন্য ছিল এক রোদনভরা ইতিহাসই শুধু নয়, এক অগ্নিঝরা ইতিহাসও। এই সময়কার ইতিহাস মরণপণ এক সংগ্রামের ইতিহাস, অপূর্ব ত্যাগ আর অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের এক রক্তঝরা ইতিহাস। রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য, বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক পুনরুজ্জীবনের জন্য আমাদের দেশের লোক সংগ্রাম করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন– এ সত্যটিকে আজ স্মরণ করার প্রয়োজন আছে। সর্বাঙ্গীণ মুক্তিই ছিল এই সময়ের সংগ্রামীদের স্থির লক্ষ্য। আমাদের দুঃখ-রাতের আকাশে তাঁরা যেন এক-একটি তারা। তাঁদের দিয়েই যেন রচিত হয়েছে অনেক তারার ছায়াপথ।

এই মন, এই চিন্তা-ভাবনা মনে নিয়েই রচিত হয়েছে 'অনেক তারার হাতছানি'। বিশ্বাস করি, সেই অনেকগুলো তারা আজও অনেককে হাতছানি দেয়।

ঢাকা, মে ১৯ বিনীত
১৯৮০ সাল **আসকার ইবনে শাইখ**

www.pathagar.com

চরিত্র পরিচিতি

দাদু	ঃ	১৮৫৭ সালের এবং বর্তমান কালের এক অশীতিপর বৃদ্ধ।
আম্মা	ঃ	১৮৫৭ সালের এবং বর্তমান কালের এক মধ্যবয়সী বিধবা।
পাগলাটে লোক	ঃ	বর্তমানকালের এক মধ্যবয়সী অধ্যাপক।
মুদাররেস	ঃ	১৮৫৭ সালের এক মধ্যবয়সী মাদ্রাসা শিক্ষক। [প্রকৃত প্রস্তাবে 'পাগলাটে লোক' আর 'মুদাররেস' দুই কালের একই ব্যক্তি]
হাসান	ঃ	১৯৫৭ সালের ঢাকার এক তরুণ সিপাহী, আম্মার একমাত্র সন্তান।
জেবুন্‌নেসা	ঃ	হাসানের বাকদত্তা এক তরুণী।
পীতাম্বর	ঃ	১৮৫৭ সালের ঢাকাস্থ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক কেরানী।
সৌদামিনী	ঃ	পীতাম্বরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।
আলী	ঃ	হাসানদের অনুগত একজন বুড়ো গ্রামবাসী।
তরুণ	ঃ	এক 'নব্য' তরুণ।
আলীম আমান		বর্তমান কালের দুই জন গ্রাম্য শ্রমিক।

ফকির ও অন্যান্য লোকজন।

www.pathagar.com

প্রথম অঙ্ক

স্থানঃ ভিক্‌টোরিয়া পার্ক, ঢাকা

কালঃ ধরা যাক, ১৯৬৪ সাল

[ঝড়ো হাওয়ার শব্দ। ভিক্‌টোরিয়া পার্কের সবটুকু জায়গা আলোকিত ছিল না তখন। তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী অনড় শহীদ মিনার। জমাট অশ্রুর এক স্মৃতি যেন। বাইরে অমাবস্যার রাত। মাঝে মাঝে চমকানো বিদ্যুতের আলোতে দেখা যায় শহীদ মিনারের মেঝেতে দু'জন সাধারণ লোক ঘুমিয়ে আছে। ঝড়ো হাওয়া ও মেঘ গর্জনের শব্দে একজন জেগে ওঠে]

আমান ঃ এই আলীম, ওঠ্। আর বলদের মত ঘুমায় না, ওঠ্। শুনছস্?

আলীম ঃ (থতমত খেয়ে) এ্যাঁ! কি হল আমান ভাই?

আমান ঃ আসমানের অবস্থা খারাপ।

আলীম ঃ খারাপ! ওফ্—সারাদিন খাট্‌নি। রাতে ঘুমাব, তাও কপালে নাই। — ঘর দরজা ভাঙ্গে নাকি!

আমান ঃ ভাঙ্গলেই আর করব কি! তুফান বেশি আসে, এই শহীদ মিনারের ভিটার পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকব, মাটি কামড়ে।

আলীম ঃ কিন্তু দেখবে, ঘর ভাঙ্গা ইট এসে পড়বে ঠিক ভিটার এই পাশটিতে, মাথার উপরে। আমাদের কপাল, যেখানেই যাও, আর যেখানেই রাখ, ঝড়-তুফান ঠিক ছুঁয়ে যাবে।

আমান ঃ ছোট হলেও এটা ময়দান। ইটের বাড়ি দূরে দূরে আছে। ভাঙ্গলেও বাতাসে কি ইট উড়ে আসবে এদ্দূর? দালান ভাঙ্গলেও ইটগুলো চার দেয়ালের কাছাকাছিই থাকবে। ভাঙ্গা টিন বা খোলার ঘর কাছে থাকলেও ভয় ছিল। চালা বাঁশ কাঠ উড়ে এসে মাথা ভাঙ্গত। গর্দান নিত।

আলীম ঃ কিন্তু বাতাসের সঙ্গে বিষ্টি যদি আসে? শেষে কি ভিজে মরব? শালার কত বড় বড় দালান চারদিকে। কিন্তু বারান্দায় শোবার জায়গা পর্যন্ত দেয় না কেউ।

আমান ঃ কেন দেবে? আমাদের মত লোকেরা চুরি করে, বারান্দা নষ্ট করে। তাইতো জায়গা আমাদের ময়দানে।

www.pathagar.com

আলীম : আচ্ছা, এরই নাম বুঝি আন্টাঘর ময়দান?

আমান : আগে ছিল এই নাম। পরে হয়েছে ভিক্টোরিয়া পার্ক।

আলীম : তবু ভাগ্যি এই শহীদ মিনারটা বানানো হল। ঝড়-বিষ্টি না থাকলে এই গরমের দিনে শুতে বেশ আরাম।

আমান : কিন্তু পুলিশের রহম না হলে থাকতে দেয় কে? (অদূরে এ্যাকসিডেন্টের শব্দ) কেউ মরল নাকি?

আলীম : এ্যাকসিডেন্ট! কিন্তু তুই বড় দুর্মুখ। এই অমঙ্গলের কথা কেউ কয় নাকি?--ইস্, কি বাতাস!

[একটি পাগলাটে লোক মিনারের ওপাশ থেকে আত্মপ্রকাশ করে]

পাঃ লোক : মনে হয় রাজ্যের বাতাস যেন ছাড়া পেয়েছে। হু হু করে বইছেই শুধু। সঙ্গে বিদ্যুৎ আর মেঘ-গর্জন। ভয় দেখাচ্ছে। ধমক দিয়ে, দাঁত খিঁচুনী দিয়ে। যেন আগুনের চাবুক। শপাং করে মারছে। শব্দ হচ্ছে না। তারপরই ক্রুদ্ধ চাপা গর্জন।

আলীম : কে কারে ডর দেখায়?

পাঃ লোক : একটা অজানা শক্তি। দুনিয়ার যত কান্না, যত ক্ষোভ, যত আক্রোশ, যুগের পর যুগ সব পুঞ্জীভূত হয়ে সে-শক্তিকে আরো চঞ্চল করে তুলেছে। ভয় দেখাচ্ছে। এখনো যারা জুলুমের ইতিহাস রচনা করে চলেছে, তাদেরকে।

আমান : বাতাস যে খালি বাড়তির দিকে!

পাঃ লোক : নাড়া লাগে যে! কত যুগ ধরে জমা হচ্ছে। জমে জমে সবটা আক্রোশ এক হয়ে গেছে। তার মধ্যে পড়েছে কত চোখের পানি। আরও জমাট বেঁধেছে। পানি পেয়ে কংক্রিট যেমন জমে শক্ত হয়ে যায়, তেমনি। কোথাও কোন কিছুর নাড়া লাগলেই সবটা এক সংগে দুলে ওঠে। আজ তা-ই হচ্ছে। যতই দোলা লাগছে, যতই চাঞ্চল্য বাড়ছে, ততই দূরের বিগত দিন হাহাকারে জেগে উঠছে। এই, এই বোকা, শুনতে পাচ্ছ?

আমান : আপনি কে?

পাঃ লোক : ভয় নেই, আমিও মানুষ।

আমান : কি শুনব?

পাঃ লোক : কথা, অনেক দিন আগেকার কথা। ঐ ঝড়ের শব্দে ভেসে

www.pathagar.com

আসছে। যেন সেই সময়টাই ভেসে আসছে।

আলীম : আপনি এ জায়গায় নতুন?

পাঃ লোক : নতুন! না, বহু পুরাতন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এখানে কাটিয়েছি। এই ভিক্টোরিয়া পার্কে। দিনের পর দিন বুঝতে পেরেছি, মর্মে মর্মে অনুভব করেছি, নতুন আর পুরাতন আজও এক রয়ে গেছে। দেখছ না, সেদিনের মত আজও ঝড় আসছে! শুধু আগে এখানে ছিল বড় বড় গাছ। আজ সেগুলো নেই। কাটলে কেন? রাখলে ক্ষতি ছিল?

আলীম : এই চল্, কোন আশ্রয়ে যাই। তুফান আরও বাড়ছে।

পাঃ লোক : ভয় পাচ্ছ? কেন? হাঃ হাঃ হাঃ— (আমানের প্রতি) কি কাজ কর?

আমান : আমরা কামলা, লেবার। রাজমিস্ত্রীর জোগালী। দালান-কোঠা বানাই।

পাঃ লোক : এ্যাঁ! দালান-কোঠা বানাও? কিন্তু এই ঝড়ের রাতে এখানে কেন? এটা কি শোবার জায়গা? হাঃ হাঃ হাঃ—বিকালে একজনকে দেখলাম, এখানে তোমাদের কয়েকজনকে নির্দেশ দিচ্ছে? সে-ও কি এখন কোন মাঠে-ময়দানে?

আলীম : না, তা হবে কেন? তার তো দালান আছে। ঐ যে রমনার পাশ দিয়ে গেলে একটা মস্ত বড় সুন্দর দালান। বাড়ির সামনে মহিষ দাঁড়ানো! পাথরের মহিষ!

পাঃ লোক : মহিষ! ও মহিষ। তা পাথরের মহিষ বাড়ির সামনে কেন?

আমান : কেন আবার কি? রাখতে হয় না? কত সুন্দর বাড়ি। খুব বড়লোক।

পাঃ লোক : খুব বড়লোক? বেশ ক্বামেল বুঝি?

আলীম : ক্বামেল মানে— ঠিক বুঝলাম না!

আমান : বুঝাবুঝি থাক। ক্বামেল না, বুদ্ধিমান। কন্ট্রাকটার।

পাঃ লোক : ও, তাই বল।

[একটা মাতাল যুবক আসে]

যুবক : এই যে, অনেক লোক দেখছি। তোমরা কি করছ? একটা এ্যাকসিডেন্ট হয়ে আছে ওখানে। তোমরা এগোও নি কেন?

www.pathagar.com

আমান : এ্যাকসিডেন্ট? ও, একটু আগে? মানুষ মারা গেছে?

যুবক : বোধ হয় মরেই গেছে।

আলীম : কি রকমের এ্যাকসিডেন্ট?

যুবক : রিকশায় আর জিপে। কিন্তু তোমরা যাও নি— আশ্চর্য! বিদেশে শুনেছি এ্যাকসিডেন্ট হবার সাথে সাথে লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদেশের মানুষগুলো এমন জানোয়ার!

পাঃ লোক : লোক মারা গেছে?

যুবক : হ্যাঁ, মরেছে।

আলীম : আপনি কিসে ছিলেন?

যুবক : রিকশায়।

আমান : ক'জন যাত্রী ছিলেন?

যুবক : একজন।

আমান : তাহলে?

[আপাদমস্তক দেখে]

যুবক : তাহলে! সত্যিই তো, তাহলে মরল কে? আমি হেঁটে এলাম এতটুকু রাস্তা— বেঁচে আছি নিশ্চয়ই! (পাগলাটে লোক এগিয়ে আসে) তুমি কি বল হে? নিশ্চয়ই বেঁচে আছি, না?

পাঃ লোক : এই, তোমরা ওখানে দেখ।

[ওরা চলে যায়]

যুবক : তাহলে মরল কে?

পাঃ লোক : (যুবকের শার্টের কলার চেপে ধরে) এত রাতে কোথায় ছিলে?

যুবক : আরে, অভদ্রের মত গলার জামা ধরে যে! ছাড়।

পাঃ লোক : মেরে ফেলব। বল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

যুবক : ছিলাম একটা জায়গায়। ঠিকানা লেখা আছে আমার নোট বইয়ে— আমার হিপ পকেটে দেখ।

পাঃ লোক : বলা উচিত নয়— ইতর জনের কথা হয়ে যায়, কিন্তু বলতে ইচ্ছা হয়— তুমি একটা হারামযাদা।

যুবক : যাঃ, কি যে বলে মাইরী। আমি তো শরীফযাদা! আমার মাম্মী ও ড্যাডী দু'জনেই স্টেট্স্-এ গিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

পাঃ লোক ঃ তাই বুঝি বেঁচে আছ কি মরে গেছ তার খেয়ালই এখনো হয় নি? তোমাকে আমি গলা টিপে মারব।

যুবক ঃ এ্যাঁ! (পাগলাটে লোকের হিংস্র চোখ দেখে ভয় পেয়ে) না না, বেঁচে আছি। কিন্তু তুমি— তুমি ভূত? ভূত দেখলে কি জানি বলতে হয়— হায় রে, কিছুই যে মনে আসছে না! আমাকে ছেড়ে দাও বাবা।

পাঃ লোক ঃ কি কাজ কর?

যুবক ঃ পড়ি, ডেম কলেজে। কিন্তু প্রমিস্ করছি, ওসব জায়গায় আর—

পাঃ লোক ঃ গায়ের জামাকাপড় এরকম কেন? এ কোন্ দেশী জামাকাপড়?

যুবক ঃ দেশী— কোন্ দেশী? এর বোধ হয় কোন দেশই নেই।

পাঃ লোক ঃ এখানে কোথায় এসেছ জান? জান, কিসের পাশে দাঁড়িয়ে তুমি?

যুবক ঃ এ্যাঁ, তা কি করে যে এখানে এসে পড়লাম— তা এটা একটা পিলার— মানে স্মৃতিস্তম্ভ।

পাঃ লোক ঃ কাদের স্মৃতি জান? দেশের জন্য যারা প্রাণ দিয়েছিল। কেন দিয়েছিল জান?

যুবক ঃ ইয়ে— দেখুন, আমাকে ছেড়ে দিন। আমার মাথাটা যে খুব ঠিক নেই, তা তো বুঝতেই পেরেছেন। আপনার এই ভাইভা-ভোসির আন্সার দেওয়া—

পাঃ লোক ঃ তোমার মত তরুণ এই দেশে কতজন আছে?

যুবক ঃ তা গণাবাছা নেই— কিন্তু— মানে আপনি যখন এভাবে বলছেন, তখন আর আমি কি বলব বলুন!

পাঃ লোক ঃ হুঁম্।

যুবক ঃ যদি বলেন তো এবার আমি—

পাঃ লোক ঃ তুমি একটা অকালকুষ্মান্ড।

যুবক ঃ জ্বি, কিন্তু আধুনিক কালে শব্দটা অচল নয়?

পাঃ লোক ঃ তুমি একটা ইডিয়েট।

যুবক ঃ এবং যেতে পারি এখন, তাই না?

পাঃ লোক ঃ হ্যাঁ, জাহান্নামে যাও।

www.pathagar.com

যুবক : কিন্তু রিক্সা যে ভেঙ্গে গেল! কি করে যাব যে, তাই-

[বলতে বলতে চলে যায়। পাগলাটে লোক মিনারের আড়ালে যায়। শ্রমিকরা ফিরে আসে]

আমান : সব যেন কেমন ভৌতিক মনে হয় রে!

আলীম : হ্যাঁ, কেউ কোথাও নেই- অথচ-- ঐ যে পাগলের মত লোকটা -- কথাবার্তা কয় সব খাপছাড়া। এই ময়দানের গাছগুলোতে নাকি আজর ছিল।

আমান : বলতে সাহস পাই না। কিন্তু আমারও তা-ই মনে হয়। চেহারা দেখলে তো?

আলীম : এই ময়দানের গাছে ফাঁসি দিয়ে নাকি অনেক মানুষ মারা হয়েছে। প্রায় এক শ' বছর আগে।

আমান : ফাঁসির পরেও মড়া নামায় নাই। মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য অমনি রেখে দেওয়া হয়েছিল। মরা মানুষ পচে পচে পড়েছে নীচে। শেয়াল শকুনে খেয়েছে।

আলীম : আজও নাকি শনি-মঙ্গল বারে অমাবস্যার রাতে কারা পানি চায়। আজও নিশি রাত্রে কেউ কেউ শোনে, কে যেন ডাকেঃ ভাইয়া, পানি! (হঠাৎ ভয় পেয়ে) ঐ যে!

আমান : (ভয় পেয়ে) কই?

[পাগলাটে লোকটা মিনারের পাশে মুখ বের করে চেয়ে আছে]

পাঃ লোক : এই যে! (হাসে) একটা কথা ছিল।

আমান : এ্যাঁ!

পাঃ লোক : একটা কথা। (এগিয়ে আসে) কেমন আছ?

আলীম : মানে?

পাঃ লোক : এই কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করছি। হাল-হকিকত কি? তোমার গ্রামের? দেশের?

আলীম : দেশের অবস্থা তো জানেনই। গ্রামের অবস্থা খুব খারাপ। অনেকে এক বেলাও খেতে পায় না। তাই তো গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে মজুর হলাম। রোজ পাই ষোল টাকা। ছয় টাকায় কোন রকমে খেয়ে দেয়ে রোজের বাকী দশ টাকা জমাই। বাড়িতে স্ত্রী আছে, বাচ্চাকাচ্চা আছে। খাটতে হয় খুব বেশি। তবু চলে না। গায়ে

www.pathagar.com

খেটে যা পাই, দরকারী জিনিসপত্র কিনতে তার চেয়ে বেশি লাগে। কাজেই–

পাঃ লোক ঃ কাজেই?

আমান ঃ বুঝতে পারি না কি করব।

পাঃ লোক ঃ আমাদের দেশ তো শুনেছ— সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা?

আমান ঃ হ্যাঁ, শুনেছিলাম। কিন্তু—

পাঃ লোক ঃ টাকা পয়সা যায় কোথায়?

আলীম ঃ টাকা পয়সা?

পাঃ লোক ঃ হয় তো। প্রতি বছরেই হয়। বেশ কয়েক হাজার কোটি টাকা। আমার তোমার ঘামের বিনিময়ে জমিতেই হয়। যায় কোথায়?

আলীম ঃ আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

পাঃ লোক ঃ দু' শ' বছর ধরে শুধু যাচ্ছে। অবিশ্যি আসছেও। তবে যাচ্ছেই বেশি। মানে শুভঙ্করের ফাঁকি।

আমান ঃ শুভঙ্করের ফাঁকি?

পাঃ লোক ঃ হ্যাঁ, শুভঙ্করের ফাঁকি। কিছু দিয়ে বেশি নিলে রইল কি আর বাকী? কিন্তু, যায় কোথায়? আঁ। কাঁচামাল, হাসি–গান, হীরের ফুল, কানের দুল?

আমান ঃ যায় তো পেটে। আর–

পাঃ লোক ঃ আর অন্য জায়গায়। হাঃ হাঃ হাঃ—

[ঝড় বেড়ে যায়। ওরা সবাই চলে যায়— শ্রমিকরা ব্যস্ত পায়, আর পাগলাটে লোকটা ধীর পায়। ঝড় থামে। আসে এক বুড়ো আর বোরকা–পরা এক মহিলা]

মহিলা ঃ এই কি সেই ময়দান, আব্বাজান? সেই মিনার?

বুড়ো ঃ এ্যাঁ! হ্যাঁ। এটাই ভিক্টোরিয়া পার্ক। চিনবার কি জো আছে বউমা? গাছগাছালি কেটে ময়দানকে সাফ করে দিয়েছে। আমরা চিনতাম সেই ময়দানকে। কত বড় বড় গাছ ছিল, আমার সমবয়সী। সব কেটে দিয়েছে। সে গাছ আমরা চিনতাম। সে ময়দানকে জানতাম। তার সংগে জড়িয়ে ছিল এক ভয়, এক স্মৃতি। অবিশ্যি আসল গাছ কেটে দিয়েছিল বিদেশীরা। এখন সব কিছু নতুন। তবে— হ্যাঁ, এই মিনারটা তুলেছে মস্তবড়।

www.pathagar.com

মহিলা : ফকির সাহেব এখনও আসেন নি দেখছি।

বুড়ো : কি জানি এখনো তো এলেন না। অমাবস্যার রাত। ঝড় তুফান হয়ে গেল। হয়তো এসে ফিরে গেছেন।

মহিলা : আমাদের কি দেরী হয়ে গেছে?

বুড়ো : দেরী? হয়তো হয়েছে।– জায়গাটা বড় থমথমে লাগছে বউমা। কি যেন একটা অবস্থা, মনে হয়...

মহিলা : আপনার ভয় করছে আব্বাজান?

বুড়ো : ভয়? আমার আর ভয় কি মা? এই বয়সে আমার ছেলে মারা যাওয়ার পর আর ভয় করি না আমি। তবে এখানে এলেই কেমন যেন মনে হয়, চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ।

মহিলা : এসব থাক আব্বাজান। আমরা এসেছি রহিমের খোঁজে। এসব অমঙ্গলের কথা বলবেন না।

বুড়ো : না বউমা, না। আল্লাহ্‌র কাছে বলি, আমার দাদুভাই যেন সহি-সালামতে থাকে। যেখানেই থাকুক, সে যেন বেঁচে থাকে, যেন ভাল থাকে।

মহিলা : আপনার কি মনে হয় রহিম আমার বেঁচে নেই?

বুড়ো : এ্যাঁ! বেঁচে নেই? না না, তা কি হয়? বাপ–মরা নাতি আমার, একমাত্র আশা। গরীবের সংসারে সে যদি ফিরে না আসে... ওরে বউ– আমি না থাকলে তুই যে বড় একা!

মহিলা : আব্বাজান!

বুড়ো : এ্যাঁ! ও... হ্যাঁ, এই তো ফকির সাহেব এসে গেছেন।

[এক ফকির আসে]

ফকির : এসেছেন আপনারা? আমি জানি আসবেনই, আসতেই হবে এখানে। আল্লাহ্ মালেক। আমি এই ঝড়–তুফানে ঐখানে দাঁড়িয়েছিলাম। তাহলে আসুন, কাজে লেগে যাই। হ্যাঁ, কি নাম বলছিলেন? আফজালুর রহিম? মাথাটা বুঝি কেমন হয়ে গেছিল?

বুড়ো : হ্যাঁ বাবা। সব সময়ই এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু আপনি এদিক ওদিক দেখছেন কি?

ফকির : না, মানে পুলিশ–টুলিশ থাকলে জ্বিন আবার আসতে চায় না।

www.pathagar.com

যাক ওসব কথা। কি কি বলত সে?

বুড়ো ঃ আমাদের গরীবী হালত তার পছন্দ হত না। বলত, এ হালতের পরিবর্তন করতে হবে।

ফকির ঃ হুঁম্, পাগলামির লক্ষণ। পরিবর্তনের জন্য কি কি করতে চাইত?

মহিলা ঃ কি কি করতে চাইত তা বলা মুশকিল। তবে বই-পুস্তক পড়ত সব সময়। আর কাগজে লিখে লিখে কি হিসাব করত।

ফকির ঃ তারপর একদিন বুঝি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল?

বুড়ো ঃ হ্যাঁ বাবা, আমাদের এ অবস্থায় ফেলে চলে গেল। শুনলাম তখন শহরে একটা কি গোলমালও চলছিল। তা সে মারাই গেল কি না- গুলী-গালাজ কিন্তু হয়েছিল।

মহিলা ঃ আমার মন বলছে, রহিম বেঁচে আছে। কিন্তু কোথায় আছে তা জানতেই আপনার কাছে আসা।

ফকির ঃ খায়ের। সব ঠিক হয়ে যাবে। আল্লাহ্ মালেক। আপনার মন যাই বলুক, দেখি আমার জ্বিন কি বলে। এখানে এক শ' বছর আগে এক গোলমালে, তাও এই গুলী-গালাজেরই গোলমালে, অনেক লাশ জমা হয়। তাই এই জায়গাটাই বেছে নিলাম কাজের জন্য। এক শ' বছরের ফারাক হলেও আমার মালুম হচ্ছে, রহিমের খোঁজের জন্য এই জায়গায় বসে জ্বিনকে ডাকলে সহজে কাজ হবে। এখানে থাকে এক জ্বিন। সে ঠিক বলতে পারবে রহিমের পাগলামিটা কোন জাতীয়। যাক্, আমি জিকিরে বসছি। জ্বিন আসবে। তাঁকে যা জিজ্ঞেস করবার, তা আপনারাই করবেন। ভয় নেই। আপনাদের শরীর বেঁধে দিয়েছি। এবার শিন্নিটা এখানে রাখুন।

[চত্বরে বসে জিকির আরম্ভ করে ফকির। মহিলা আঁচল খুলে দশ টাকা ফকিরের সামনে রাখে। জিকিরের মাঝেই শহরের এই অঞ্চলের আলো চলে যায়। ফকিরের জিকির বেড়ে চলে। জিকিরের মাঝেই পাগলাটে লোকটা আসে]

পাঃ লোক ঃ কে, দম টানছে কে?

[আরও জোরে জিকির চলে]

জবাব দাও। এই ফকির, নাভিশ্বাস উঠল নাকি?

বুড়ো ঃ বউমা, এসেছেন। জিজ্ঞাস কর।

www.pathagar.com

পাঃ লোক ঃ জিজ্ঞাস করবে? কি জিজ্ঞাস করবে?

মহিলা ঃ আমার একমাত্র ছেলে রহিম হারিয়ে গেছে।

পা ঃ লোক ঃহারিয়ে গেছে? তা এ ফকিরের পাল্লায় পড়েছেন কেন?

মহিলা ঃ কোথায় আছে আমার ছেলে, তা জানতে চাই জনাব।

পাঃ লোক ঃ ও বুঝেছি। অল্প বয়সের ছেলে?

বুড়ো ঃ না বাবা, বাচ্চা ছেলে নয়। তেইশ-চব্বিশ বছরের যুবক।

মহিলা ঃ সে ভাল আছে তো?

বুড়ো ঃ তাকে ছাড়া কষ্টের জীবন আমাদের মরুভূমি হয়ে গেছে। সে ছিল আমাদের অন্ধের নড়ি। বাপ তার আগেই মারা গেছে। তিনটে প্রাণীর সংসার শুধু কোনরকমে টিকে ছিল।

মহিলা ঃ আমি শুধু তার বেঁচে থাকার খবর জানতে চাই বাবা। তার এ দুঃখিনী মায়ের আর কিছু চাইবার নেই।

পাঃ লোক ঃ (চীৎকার করে) এই ফকির, জিকির থামাও।

[ফকির ভয়ে আরও জোরে জিকির টানে]

থামাও বলছি। নইলে ভন্ডামি তোমার শেষ করে দেব।

[হঠাৎ আলো এসে যায়। একদৃষ্টে পাগলটে লোকটি চেয়ে থাকে মহিলা ও বুড়োর দিকে। ফকির জিকির প্রায় থামিয়ে আনে। পিটপিট করে দেখে টাকাগুলো কোথায় আছে। দূরে তার যে সাথী জ্বিন সেজে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে দেখে নিয়ে ইঙ্গিত করে এবং কোন রকমে টাকাটা নিয়ে চম্পট দেয়]

পাঃ লোক ঃ আশ্চর্য, আশ্চর্য মিল! ছেলে হারিয়ে গেছে, মা তাকে খুঁজছে, সংগে এক অশীতিপর বৃদ্ধ!

মহিলা ঃ বাবা, আমার ছেলে?

পাঃ লোক ঃ আমি তো জ্বিন নই মা।

মহিলা ঃ তবে?

পাঃ লোক ঃ তোমার মতই এক মানুষ।

মহিলা ঃ কিন্তু ফকির বলল--

পাঃ লোক ঃ বেচারা গরীব। ঐ রকম বলে মায়ের মনে মোচড় দিয়ে দু'পয়সা

www.pathagar.com

কামিয়ে নিয়েছে।

মহিলা ঃ কিন্তু আমার রহিমের খোঁজ আমি কি করে পাব?

বুড়ো ঃ কেঁদো না বউ মা। ওঁর কথা শোন। ওঁর চোখে আমি মমতার আলো দেখেছি— চাঁদের আলোর মতই।

পাঃ লোক ঃ না না, ওসব কিছু নয়। আমি শুধু অবাক হয়ে দেখছিলাম, দু'য়ের মধ্যে এত মিল, চেহারার এত সাদৃশ্য।

বুড়ো ঃ বাবার পরিচয়?

পাঃ লোক ঃ এক সময় অধ্যাপক ছিলাম। কিন্তু ওরা বললে— আমি নাকি পাগল! এমন সব কথা বলি যা ওদের অপছন্দ। তাই চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলে।

বুড়ো ঃ বড়ই দুঃখের কথা! তাহলে চল বউমা, এবার ঘরে ফিরি। কাল ভোরে আবার বেরুবো।-আপনি অমন করে কি দেখছেন?

পাঃ লোক ঃ চেহারার সাদৃশ্য। আপনাদের চেহারা।

বুড়ো ঃ কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা।

পাঃ লোক ঃ এক শ' বছর আগেকার কাহিনী। দিনের পর দিন সেই কাহিনীতে ডুবে ছিলাম। ক্রমে কাহিনীর লোকজন আকৃতি নিয়ে আমার চোখে ধরা দিল। আমাকেও আমি খুঁজে পেলাম সেখানে। কিন্তু আজ যেন তাদেরকেই দেখতে পাচ্ছি এখানে। এমনি এক মা, এমনি এক দাদু আর— (হঠাৎ আলো চলে যায়) আবার আলো চলে গেল। তাতে ক্ষতি নেই, কল্পনার আলো এই আঁধার পথে ঠিক আলো জ্বালাবে।

[কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ আওয়াজ ভেসে আসে]

নেপথ্যে ঃ ভাইয়া, পানি! ভাইয়া, পানি!

[শিউরে ওঠে বুড়ো আর মহিলা]

বুড়ো ঃ বউমা!

মহিলা ঃ আব্বাজান!

পাঃ লোক ঃ ভয় নেই। এখানে এক শ' বছর আগে যে নির্মম ইতিহাস রচিত হয়েছিল, এ তারই এক কান্না। এক আর্তনাদ। এক নিষ্করুণ দাবী।

[আবার আওয়াজ ভেসে আসে]

www.pathagar.com

নেপথ্যে ঃ ভাইয়া, পানি! ভাইয়া, পানি!

বুড়ো ঃ এই অন্ধকারে কিছুই যে দেখতে পাচ্ছি না! তার উপর ওই রকম ভয়ঙ্কর একটা শব্দ---

পাঃ লোক ঃ অতীতটা অন্ধকারে লুকিয়ে আছে তো! আওয়াজটাও ভেসে আসছে অনেক দূর অতীত থেকে। তাই অনেকটা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা। কল্পনার আলোতে পথ চলুন। পৌঁছে যাব আমরা দূর অতীতের সেই আঠার শ' সাতান্ন সালে।

[অন্ধকারে ছায়ামূর্তিগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়]

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অঙ্ক

স্থান ঃ হাসানদের গাঁয়ের বাড়ি

কাল ঃ ১৮৫৭ সাল

[বাড়ির আঙ্গিনা। সূর্য তখন অস্ত যাবে। ব্যস্ত হয়ে আলী এসে অন্যদিকে বেরিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় হাসান এসে ঢোকে]

হাসান ঃ এই যে, আলী ভাই! আরে, একটু দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলেই যাও। এত ব্যস্ত কেন? এদ্দিন পর বাড়িতে এলাম, আর তুমি কিনা ব্যস্ত!

আলী ঃ ব্যস্ত কি ভাই সাধে হই? কথায় বলে না, যার বিয়া তার নাম নাই, পাড়াপড়শীর ঘুম নাই? তুমি তো ভাই বাড়িতে পা রেখেই খালাস। এখন তাকিয়ে তাকিয়ে আসমানের রঙ দেখলেও সই, আর গাছে গাছে ফুল দেখলেও সই। কিন্তু আমাদের ফুরসৎ কই! দৌড়াদৌড়ি করে কাজ করব, তবে তো ফুল ছাড়াই গাছে ফুলের মত কিছু দেখা যাবে!

হাসান ঃ কিন্তু আলী ভাই, সরষে ফুল নয় তো?

আলী ঃ সেটা ভাই তোমার হাতে। তুমি যদি দেখাও, তবে আমাদের না দেখে উপায় নাই। কিন্তু আমরা যা দেখতে চাই তা চম্পাকলি, একেবারে ফুটফুটে।

হাসান ঃ আর টুকটুকে? কিন্তু না দেখলে বিশ্বাস নেই। শেষে দেখব, কলি ঠিকই আছে, তবে চম্পার বদলে কৃষ্ণ। কিন্তু আলী ভাই, তুমি তো খাসী কিনে তার গোশ্‌ত্‌ বানাতে ব্যস্ত, আম্মা রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত। আর দাদু কোন কাজ না থাকায় ব্যস্ত। আমাকে একটু বুঝিয়ে বল, এই সব ব্যস্ততার কারণটা কি?

আলী ঃ কারণ তো তুমিই। আসমানে ওঠা চাঁদ দেখলে আপনজনের মন যতটা আকুল হয়, ততটা শান্ত হয় না। হয়, যদি ঘরের চাঁদ ঘরে বসে হাসে।

হাসান ঃ বহুত আচ্ছা। কিন্তু তুমি ভাই আসমান থেকে মাটিতে নাম। প্যাঁচ খুলে কথাটাকে সোজা হাজির কর।

www.pathagar.com

আলী : একে কোম্পানীর সেপাই, তাতে পুতহারা দাদুর একমাত্র নাতি, বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। এই নিরালা বাড়িতে মা-দাদুর কাছে মাস-মাহিনার কটা টাকা পাঠিয়ে ঢাকার কেল্লায় নিশ্চিন্তে সময় কাটাও। একবারও কি ভাব, একঘেয়ে বিকালের রোদে মায়ের মন কত আকুলি-বিকুলি করে! দাদুর অস্থির কথা কত ছটফট করে! আষাঢ়ের নিঝুম অন্ধকার রাতে টিপটিপ বিষ্টির শব্দে কার কথা যে মায়ের কানে বাজে, তা কি ভাব হাসান?

হাসান : আরে! ও আলী ভাই, ঐ দেখ রাস্তা দিয়ে কে রঙীন সুতার গাঁট নিয়ে যাচ্ছে। ঐ যে দেখ দেখ।

আলী : ও তো নাথপাড়ার যোগেশ।

হাসান : দেশী কাপড় আজো বোনা হয় নাকি?

আলী : হয় অল্প-স্বল্প। আগের দিন কি আর আছে!

হাসান : তাহলেই বোঝ আলী ভাই, নিরালা এ ভাঙ্গা ঘরে পুতহারা দাদু আর বিধবা মায়ের কাছে বসে বসে হাসলে কেমন লাগবে? মাস-মাহিনার টাকা তো বাদ। কাজেই খানাপিনাও বাদ। এই বাদের ফলে খালি পেটে পিত্তি জমতে জমতে যে হেস্কি উঠবে, তাতে চাঁদের হাসিটি তেঁতো হয়ে যাবে না?

আলী : কি যে তুমি কও হাসান, বুঝতে পারি না।

হাসান : সবটুকু না বুঝতে পারলেও এইটুকু বুঝলেই যথেষ্ট হবে যে, মাস-মাহিনার টাকা ক'টা হল আসমানের ভাসা-ভাসা মেঘ। জমে জমে এই মেঘ ছায়া দেয়। আর নিঝুম রাতে মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে হাসিমাখা চাঁদমুখ দেখা দিলে তা মধুরও লাগে।

আলী : যাক, তোমার সাথে কথা ক'য়ে কি কুলাতে পারব?

হাসান : পারতে, কিন্তু সেই কথা তো বললে না। আরম্ভ করেই তো কবিয়াল হয়ে গেলে!

আলী : কিন্তু ব্যস্ত লোকটাকে তুমিই তো কবিয়াল বানালে। বাড়িতে এসেছ। সকলেরই আনন্দ। কাজকাম করছি, তারপর বিয়াশাদী হবে, তখন তো গানই গাইব।

হাসান : ওরে বাবুবা, বিয়েশাদীর গান! ওদিকে দেশের চারদিকে যে

www.pathagar.com

বন্দুকের শব্দ! বিয়ের গান জমাতে গেলে ওসব তো আগে থামাতে হবে!

আলী : হ্যাঁ, ভাল কথা। ঢাকাতেও তোমরা নাকি গোলমাল করবে? এবার নাকি কোম্পানীর রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে?

হাসান : ঠিক জানি না, তবে আমরাও এমনি কথা শুনছি।

আলী : শহরের খবরাখবর কি?

হাসান : আসমানে মেঘ জমা হয়ে হয়ে একেবারে কালো হয়ে আছে। ঝড়-তুফান এখন আসে কি তখন আসে। মেঘের গর্জন হচ্ছে সমানে।

আলী : কিন্তু মেঘের গর্জন হয়ে গেলে তো তুফান পাতলা হয়ে যায়!

হাসান : তাই তো এখন আর ঠিক জমছে না।

আলী : তাইলে বিয়ার গানই জমুক, কি কও— এ্যাঁ?

হাসান : তাই ভাবছি।

আলী : তুমি তাহলে ভাবতে থাক, আমি খাসীটার কদ্দূর হল, দেখি।

[চলে যায়। হাসান এগোয়। অন্যদিক দিয়ে পীতাম্বর ঢোকে]

পীতাম্বর : হাসান, বাড়িতে আছ? হাসান?

[হাসান ফিরে আসে]

হাসান : এই যে, পীতাম্বরদা! শহরের চাঁদ এই গাঁয়ের আসমানে এসে উঠল যে!

পীতাম্বর : কি আর করি ভাইয়া। কি প্রেমে যে তোমার বৌদিকে মজালে! তুমিও দু'দিনের ছুটিতে বাড়ি এলে, উনিও মনের দুঃখে বাপের বাড়ি এলেন। শহর অন্ধকার। অমাবস্যার রাতে সর্বত্র দেখি জোনাকির আলো। তাই চলছি তার খোঁজে, শ্বশুর-বাড়ি। সূর্যের আলো ছাড়া চাঁদও যে অন্ধকার! কিন্তু তুমি এখানে আছ কেমন?

হাসান : ভাল। কিন্তু বড় আলসেমিতে ধরেছে। সেপাইসান্ত্রী মানুষ, প্যারেড বন্দুক— এসব না হলে আমাদের সময় কাটে? এখানে রয়েছে আম্মা, দাদু। ভবিষত্যের একমাত্র আওলাদ বাড়িতে এসেছি। ডাকগুলো থেকেই বুঝতে পার, কি কোমলতার মধ্যে আছি! ভাল লাগে না।

পীতাম্বর : তরুণ বয়স- আম্মা দাদু এসব কোমল শব্দের মাঝে স্ত্রীর মত

www.pathagar.com

একটু ঝাল মেশানো শব্দ না এলে ঠিক জুতসই হয় না। কোরমার সাথে ঠিক রেযালার মত।

হাসান : ঠিকই বলেছ। তবে, রেযালার লঙ্কা গলে গেলেই যা একটু বিপদ।

পীতাম্বর : এ বিপদও সাধের হে সিপাহী! সময়ে সময়ে নাকের আর চোখের পানি এক হলেও স্বাদটা বড় তৃপ্তিদায়ক। আমি তো শুনেছিলাম এবার একটা ব্যবস্থা হবে। তার কদ্দূর?

হাসান : অনেকটা দুর কিনা, তাই পথ হেঁটেও দূর আর কাছে হয় না। সেই দুঃখেই মরমে মরে আছি পীতাম্বরচন্দ্র। তার উপর নদীর এই সাগর সঙ্গমে যাত্রার দৃশ্য দর্শনে সেই দুঃখের আগুন বাতাস পেয়েছে।

পীতাম্বর : উপমা সুন্দর। কিন্তু উল্টা হল যে। কবিরা সাধারণতঃ পুরুষকেই সাগর হবার গৌরবটা দিয়ে থাকেন।

হাসান : দিয়ে থাকেন, কারণ তাঁরা তোমার মত একটি দ্বোজবরকে সাধারণতঃ একজন রূপসীর পাশে কল্পনা করেন না।

পীতাম্বর : চমৎকার বলেছ ভায়া। কিন্তু ওদিককার সাগর এত তরঙ্গসঙ্কুল, জোয়ারের টান তার এত বেশি যে নদীর মত এই দ্বোজবরটিরও উদ্বেল হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সত্যিই কি কোন খবর নেই?

হাসান : ঘরে এসে না বসলে এসব কথা শোনান যায়?

পীতাম্বর : না ভাই, এখনো ক্রোশখানেক পথ বাকী। সূর্যদেবও আজকের মত বিদায় নিচ্ছেন।

হাসান : সত্যি বসবে না?

পীতাম্বর : গিন্নীকে নিয়ে আজই হয়তো ঢাকায় ফিরতে হবে। যাওয়ার পথে ভাবলাম একবার দেখে যাই। তোমার তো আরও কিছুদিন ছুটি রয়েছে?

হাসান : তা রয়েছে। কিন্তু ঢাকার খবর কি?

পীতাম্বর : এই আঠার শ' সাতান্ন সালে যেখানেই সিপাহীর ঘাঁটি রয়েছে, সেখানের খবর রঙীন না হয়ে যায়? সব জায়গায় তো হয়ে গেল।

www.pathagar.com

হাসান ঃ বাকী শুধু ঢাকা আর চট্টগ্রাম, তাই না?

পীতাম্বর ঃ হ্যাঁ, তাই তো ভয় হয়।

হাসান ঃ তোমার আর ভয় কি? তুমি তো কোম্পানীর কেরানীবাবু, তাদের পেয়ারের লোক। বিশ্বাসী।

পীতাম্বর ঃ তোমরাও কি নও?

হাসান ঃ এ্যাঁ, হ্যাঁ– আমরাও তো পেয়ারের, নিশ্চয়ই পেয়ারের। তবে আমাদের প্রেমে একটু রকমফের আছে। এই আর কি!

পীতাম্বর ঃ কেমন?

হাসান ঃ তৃতীয় পক্ষের সরলা স্ত্রীর প্রতি বুড়িয়ে আসা একদা লম্পট স্বামীর পেয়ারের মতই আমাদের পেয়ারটা যেন একটু কড়া প্রহরাধীন।

পীতাম্বর ঃ দেখ, একাধিক স্বামীত্বের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, অভিযোগটা সত্য হলেও কারণটা মর্মান্তিক। অবাধ্য হওয়ার লক্ষণ দেখিয়েছ বলেই না কোম্পানীর সাহেবরা একটু সতর্ক হয়েছে!

হাসান ঃ হুঁম্। ঈদ–মহররমের দিনেও সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, একটি নৌ-সেনার দল এসেছে কলকাতা থেকে। জলপাইগুড়িতে ৭৩ নম্বর রেজিমেন্টের লোকেরা একটু কথাবার্তা বলেছিল বলে ঢাকার সিপাহীদের অস্ত্রহীন করার কথা ভাবা হচ্ছে! এসব নিশ্চয়ই তোমার একাধিক স্বামীত্বের অভিজ্ঞতায় আসে!

পীতাম্বর ঃ তা আসে। তবু স্বামীর অসহায় অবস্থাটার কথাও ভাবা উচিত বৈ কি?

হাসান ঃ সখের তাড়নায় অসহায় হলে কি আর করা যাবে বল?

পীতাম্বর ঃ কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ছাড়া স্ত্রীদের কি বেশি গরম হওয়া উচিত? গরম থেকে আবার অনেক সময় গরমাই রোগ হয় যে!

হাসান ঃ তা বলতে পার। কিন্তু সারা দেশের আবহাওয়াই যেখানে গুমোট, সেখানে গরমটা একেবারে মস্তিষ্কের, এ সন্দেহটা না করলেও তো চলে!

পীতাম্বর ঃ তা চলে। কিন্তু একটা কথা বলে যাই হাসান। ছুটিটা ফুরিয়ে

www.pathagar.com

গেলেও একটু বাড়িয়ে বাড়িতেই থেকে যেয়ো কিছুদিন।

হাসান ঃ ভেবে দেখব। কিন্তু বৌদিকে আজ রাতেই নিয়ে যেতে এসেছ, কারণটা কি?

পীতাম্বর ঃ পরে বলব। হ্যাঁ, জান তো— মনিপুরের রাজাকে বন্দী করে ঢাকায় আনা হয়েছে?

হাসান ঃ জানি। তাই তো বলছিলাম, পথ হেঁটেও দূর আর কাছে হয় না।

পীতাম্বর ঃ সকল সিপাহীই তোমার মত ভাবছে আর ভাবছে। এই দো-টানার মধ্যে কিছু করতে গেলে টানাটানিই সার হবে, ফায়দা কিছু হবে না। একটা কথা বলে যাই—

হাসান ঃ চল, ভবিষ্যতের কথা আলাপ করতে করতে পথ চলি। আম্মা এসে যদি তোমাকে দেখে ফেলেন, তাহলে আজ রাতে অন্ততঃ তোমার সাগর দর্শন হচ্ছে না, জেনো। ঐ দাদু ওখানে বসে আছে। তোমাকে এগিয়ে দিয়ে দাদুকে নিয়ে আসব।

পীতাম্বর ঃ তোমার সন্দেহের কিছুটা নিরসন করেই ফেলি। তোমাদের কথা শোনার অধিকার আমার নেই। আমি কোম্পানীর হয়েই কাজ করছি। কিন্তু আমাদের চর চারদিকে কার্যরত। আজকালের মধ্যেই কিছু একটা ঘটে যাবে— তা-ই আমরা আশঙ্কা করছি। আমাদের কর্মপন্থারই একটা বিশেষ প্রয়োজনে তোমার বৌদিকে নিয়ে যেতে এসেছি। তাই বলছিলাম, তুমি বাড়িতেই থেকো।

[ওরা বেরিয়ে যায়। আম্মা আসেন]

আম্মা ঃ হাসান! এই যে আলী, হাসান গেল কোথায়?

আলী ঃ ঐ তো একজনের সঙ্গে গেলেন। চাচী, এবার কিন্তু আর কোন কথা শুনবেন না। বিয়াশাদী হোক, তারপর দেখি, রীতিমত বাড়িতে আসে কি না।

আম্মা ঃ সব তো প্রায় ঠিকঠাক হয়ে আছে। ওকে তো আর বলি নি, আজ রাতেই ও পক্ষ থেকে মেহ্‌মান আসবে। আল্লাহ্ চাহে তো আজই সব ফয়সালা করে ফেলব। আমি আর পারি না বাবা।

আলী ঃ এতদিনের রোজার পর আজ ঈদ হোক। আমরা সবাই আছি। সবার কথা ফেলবে কি করে? আপনি চাচী, বিয়ার যোগাড়পাতি সব করে ফেলেন। বউ এবার ঘরে আনবই।

www.pathagar.com

আম্মা : কিন্তু তোমাকে খাসী আনতে বলেছিলাম বাকীতে। শুনলাম, টাকা নিয়ে নাকি কি একটা হয়েছে?

আলী : ওসব কথা আপনি কেন শুনতে চান চাচী? ওসব হ্যাঙ্গামার জন্য তো আমিই আছি।

আম্মা : না, আমাকে খুলে বল আলী— কি হয়েছিল। বল।

আলী : ঐ পশ্চিম পাড়ার করীম, খাসী দিয়ে টাকা চায় নগদ। আমি বললাম, চাচীর বাড়িতে খাসী যায়, টাকা দু'দিন পরে আনবি। ঐসব হল ছোট মানুষ, ছোট ওদের মুখ। কথাবার্তা অনেক সময় বেদিশের মত কয়। দু'একটা বাজে কথা ক'য়ে ফেলল। আমার কি এইসব সহ্য হয়? বললাম, বেটা পাজী, চাচীর কেউ নাই রে? আমরা পাঁচটা বাপ-বেটা আছি কোন দিনের লাগি? আপনার বড় নাতি সঙ্গে ছিল চাচী। বাপের মন বুঝতে পারে। আপনার নাম শোনার পর ঠিক থাকতে পারে? হাঁক পেড়ে লাফ দিয়ে পড়ল করীমের উপর। কইল, খাসী ছাড়ু করীম, এই নে তোর টাকা। খাসী নিয়ে চলে আসলাম। কি হল চাচী? কষ্ট দিলাম?

আম্মা : না আলী, কষ্ট নয়। আমি এমনি ভাবছিলাম।

আলী : মা, তুমি আমার মেয়ের বয়সী। কষ্ট যদি দিয়া থাকি, আপন লোক বলেই দিছি। এই বাড়িতে খেয়ে আমরা মানুষ। অন্যের সহ্য হলেও আমাদের হয় না।

আম্মা : আমি জানি আলী, জানি। আচ্ছা, যাও। তাড়াতাড়ি কর।

(আম্মা চলে যান। আলীও যায়। কথা বলতে বলতে আসেন দাদু ও হাসান)

হাসান : তুমি বুঝতে পারছ না দাদু, কোম্পানীর সামান্য সেপাই আমি। কয়েক টাকা তলব মেলে। এতে তোমাদের খাওয়াই চলে না। এ অবস্থায় কি আমার বিয়ে করা উচিত?

দাদু : কেন উচিত নয় রে হাসান? গরীব হয়ে গেলেই বুঝি মানুষ আর বিয়ে করে না? এখন অবস্থা একটু খারাপ। কিন্তু মনে না রাখলে চলবে কেন, তুই কোন্ বাড়ির ছেলে। কোম্পানীর রাজ্যে আমাদের কপাল পুড়েছে। বাধ্য হয়ে সেপাইয়ের কাজ করতে হচ্ছে তোকে। তাই বলে তুই আর রামা-শ্যামা অন্য এক

www.pathagar.com

সেপাই? সেপাই বলেই তো খান্দানের পরিচয় তুই কিছুতেই ভুলতে পারিস না।

হাসান : না দাদু। সে পরিচয় কি ভুলতে পারি? সেই শান-শওকতের কথা মনে করেই তো এই হাতে আজও কিছুটা জোর পাই। নইলে কমজোর হাতে বন্দুক চালাতাম কি করে? আর মাস-মাহিনার টাকা ক'টাই ঘরে আনতাম কি করে? ঐ ক'টা রূপেয়ার রূপ না দেখলে এই দিল তো জুড়োতই না, পেটের জ্বালাও কমত না। বরং শানের খালি শানকি মাটিতে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যেত।

দাদু : হ্যাঁ হ্যাঁ... তাই তো বলছিলাম... কি বলছিলাম রে হাসান?

হাসান : ঐ শান-শওকতের কথা। আমিও দাদু তা-ই বলছিলাম।

দাদু : ও হ্যাঁ, তাতো বলতেই হবে। এমন ঘর তো এ তল্লাটে আর নেই। একেবারে আউওয়াল। বুঝলি, এজন্যেই তো হিংসায় জ্বলে মরে।

হাসান : (প্রায় কানে কানে) কারা দাদু?

দাদু : ঐ যে নতুন বড় লোক খাঁয়েরা। আরে খাঁ! দুই পুরুষ আগের খবর কেউ জানে?

হাসান : মোটেই না দাদু। খবর থাকলে তো জানবে?

দাদু : তবে? আরে, গোলাম হয়েছে। ঢাকায় নাকি তরিতরকারী চালান দেয়। দেয়তো ঐ ব্যাটা সাহেবদেরকে। তরকারী বিক্রি করে বড়লোক!

হাসান : ওটা কিছু না। তরিতরকারীরও একটা মান, আর বন্দুকেরও একটা মান। কিসে আর কিসে?

দাদু : কিন্তু তাও বলি। বাধ্য হয়ে বন্দুক ধরেছিস? অবস্থা খারাপ না হলে ...

হাসান : খারাপ না হলে কি আর বন্দুক ধরি? আমরা মুসলমান বড়লোকেরা, আমীর-ওমরাহের কল্পিত আওলাদেরা, তলোয়ার-বন্দুক ধরা ছেড়েই দিয়েছিলাম। তারপর ব্যাপার-স্যাপার অন্য রকম হয়ে যখন সেরেছে, তখন না বাধ্য হয়ে নতুন করে বন্দুক ধরেছি।

www.pathagar.com

দাদু : এবার একটা টুকটুকে বউ আন্ ঘরে। আমার নাতবৌ। রাঙা পায় রাঙা মল বাজবে ঝুনঝুন করে, চাঁদের হাসি ঝরে পড়বে আমাদের ভাঙা ঘরে! আসমানে ফুটবে অনেক তারা, মাটিতে হাজারো ফুল।

হাসান : তা ফুটবে দাদু, কিন্তু ভাঙা ঘরে তোমার রাঙাপদী থাকবেন, বাইরে আছে শেয়াল-শকুন, চোর-ডাকাত। যদি বিপদ-আপদ ঘটে?

দাদু : আমার দাদু ভাইয়ের হাতের পেশী তখন এত জোরদার হবে যে বিপদ-আপদ আর বিপদ ডেকে আনবে না। ওরে দাদু, এ যে তোর দুঃখিনী মায়ের কত দিনের সাধনা! কত রাতজাগা মোনাজাত এর পিছনে রয়েছে! তুই এবার তা বাস্তবে টেনে আন্। তাতে সবাই শান্তি পাবে।

হাসান : কিন্তু দাদু, সবার আত্মা না হয় শান্তি পেল। কিন্তু বউয়ের আত্মাকে শান্ত করব কি দিয়ে? খাবে কি?

দাদু : তোর দাদী, তোর মা, যা পেয়ে শান্তি পেয়েছে, তা পেয়েই শান্তি পাবে তোর বউ। যা খেয়ে এই বুড়ো হাড় কটাকে আজও টিকিয়ে রেখেছি, তা-ই খাবে তোর বউ।

হাসান : তোমাদের মনে আর নতুন বউয়ের মনে অনেক ফারাক দাদু। খান্দানের মমতা এ ফারাকটুকু ভরে দিতে পারবে না।

দাদু : পারবে রে হাসান, পারবে। কেন যে পারবে, তা তুই বুঝতে চাস না যে!

হাসান : কিন্তু সব কিছুই তো বোঝ দাদু। স্ত্রী মানে হল গে' স্ত্রী, মানে আসলে স্ত্রীলোক। তার উপর স্বামীর মানে এই পুরুষটির মায়া-মমতাই হবে আলাদা। তোমাদের না হয় কষ্ট করে অভ্যাস হয়ে গেছে, কিন্তু তাই বলে আমি প্রাণ থাকতে স্ত্রীকে তো আর কষ্ট দিতে পারব না।

দাদু : কেন, পারবে না কেন শুনি? তোর স্ত্রী এমন কি নবাবযাদী হবেন যে আমরা যা পারি সে তা পারবে না?

হাসান : পারাই তো উচিত। কিন্তু যদি না পারে, তা'হলে? আমাদের মান থাকবে?

www.pathagar.com

দাদু : জানিস হাসান, এই এক শ' বছর আগেও দু'দশটা গাঁয়ের লোক তাদের আনন্দ-উৎসবে, ঈদ-পরবে এ বাড়ীতে নযরানা দিয়ে যেত! জানিস, তোর দাদাজানের ওয়ালেদ সাহেব হাতে ময়লা লাগার ভয়ে প্রজার দেয়া টাকা নিজের হাতে ছুঁতেন না পর্যন্ত?

হাসান : শুনেছি দাদু। তাই তো তাঁরই আওলাদ এই হাসান সাহেব সিপাহীর বুভুক্ষু হাত পেতে বসে থাকেন মাইনের ক'টি টাকার জন্য!

দাদু : শুনেছিস যদি, তবে অমন কথা বলছিস কেন? জেনে শুনে আমাদের অপমান করছিস কেন তুই? ও বউমা, শুনেছ? (আম্মা আসেন) এই যে বউ, শুনলে কথা? খান্দানের উপর হাসানের আর মমতা নেই। তাঁর স্ত্রীর মান নাকি আমাদের মানের চেয়ে বেশি!

আম্মা : ছিঃ হাসান, দাদুর সামনে বুঝি বেয়াদবী করতে হয়? ক'দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছ। দাদুর সঙ্গে হেসে আনন্দ করে দিন কাটাবে, না ওঁকে বিরক্ত করছ? আমার রান্নাও প্রায় হয়ে গেছে। তোমরা কথা শেষ করে নামাজ পড়েই এসে পড়। আপনিও ছেলেমানুষ আব্বাজান। কোন্ বাপের বেটি আসবে এ-বাড়িতে যার মান আপনার মানের চেয়েও বেশি হতে পারে?

দাদু : তাই তো বলি বউ, হাসান হল ছেলেমানুষ। ও বোঝেই বা কি, বলবেই বা কি! হ্যাঁ, বেশ ভালো করে রেঁধো কিন্তু বউমা। কতদিন তিনজনে একসাথে বসে খাই না। হ্যাঁ রে হাসান, ঢাকায় তোরা বুঝি আওরঙ্গাবাদ কেল্লায় থাকিস?

[আম্মা চলে যান]

হাসান : তোমাদের আমলের আওরঙ্গাবাদ কেল্লা এখন হয়েছে লালবাগ ফোর্ট। কিন্তু তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না দাদু। তুমি যখন আদরই কর না আমাকে-

[হঠাৎই ভাবান্তর হয় দাদুর]

দাদু : আদর! আদর করি না! সেদিন এতটুকু ছিলি তুই। কয়েক মাসের একটি শিশু। তোর আব্বা চলে গেল। চলে গেল তিতুমীরের যুদ্ধে। আর ফিরে এল না। তুই শুধু কাঁদতিস্। আমার কোলে এলে সব

www.pathagar.com

কান্না যেতিস ভুলে। আদর না করে উপায় ছিল কি! তোর আব্বা, আমার শেষ বয়সের একমাত্র ছেলে, স্বাস্থ্যবান এক যুবক– যুদ্ধে যেতে চাইল। আমি তো না বলতে পারি না! তোর দাদী শুধু কেঁদেছিল।.. সে আর ফিরে এল না!

হাসান : দাদু, আমি ও-কথা ঠাট্টা করে বলেছিলাম। আমি তোমাকে অখুশী দেখতে চাই না– আমি শুধু–

দাদু : তুই আর আমাকে কতটুকু খুশী করতে পারবি। আমার ছেলে, সে-ই গেল! আর তুই তো তুই! তুই থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি! সংসারে আমার কোন মমতা নেই রে!

হাসান : তাহলে আমিও চলে গিয়ে দেখাব, সংসারে তোমার মমতা আজও আছে কি না। আচ্ছা দাদু, আব্বার চেয়ে তুমি আমাকেই বেশি ভালবাস, না?

দাদু : আমার মনে আর ওসব ভালবাসা নেই রে!

হাসান : না না দাদু। আমি জানি, তুমি আমাকে বেশি ভালবাস। শোন নি বেতনের চেয়ে ঘুষের মোহ বেশি, ছেলের চেয়ে নাতির?

দাদু : ওরে হাসান, ওসব কি কথা তুই ওঠালি? আমার যে সব মনে পড়ছে!

হাসান : হ্যাঁ, দাদু যেন কি! আমাকে বউয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তুমি অন্য কথা ভাবতে বসলে? (কানের কাছে মুখ নিয়ে) ও দাদু! বউ, টুকটুকে একটি নাতবউ। রাঙা পায় রাঙা মল বাজবে ঝুনঝুন করে, চাঁদের হাসি ঝরে পড়বে আমাদের ভাঙা ঘরে! আসমানে ফুটবে হাজারো তারা, মাটিতে হাজারো ফুল। কি দাদু, কথা বলছ না যে?

দাদু : (আত্মগত কণ্ঠে) এমনি আশা করে এ বাড়িতে এনেছিলাম তোর মা-কে। এমনি আশা, এমনি স্বপ্ন ছিল সেদিনও। কিন্তু কিছুই রইল না।

হাসান : দাদু, আমি বলছি কি আর তুমি বলছ কি?

দাদু : এ কথা বলতে গিয়েই যে সে কথা এসে গেল রে! স্মৃতির এই জোয়ারকে কথার বাঁধ দিয়ে কি ফেরানো যায়? সেদিন কি ছিল না এখানে? সুখ ছিল, শান্তি ছিল, হাসি গানে ভরা ছিল আমার

www.pathagar.com

এ সংসার। হঠাৎ আসমানে উঠল ঝড়। ভেসে এল মজনু শা'র পাগলা ডাক। সে ডাক শুনতে গিয়ে–

হাসান : দাদু, এসব কথা উঠিয়ে আমি ভুল করেছি। তুমি আর কথা বলো না।

দাদু : পঙ্গু হয়ে গেছি তখন থেকে। একেবারে পঙ্গু। তারপর তিতুমীর নিয়ে গেল তোর আব্বাকে। যাবার সময় সে আমাকে বলে গেল— আব্বা তুমি কেঁদো না! খোকা রইল, আমি ফিরে না এলে ওকে তুমি বুকে নিয়ো।

হাসান : দাদু, নামাজের সময় হয়ে এল। চল, ওজু করে নিই।

দাদু : সেই খোকা তুই! আমার বুড়ো বয়সের বেঁচে থাকার আনন্দ। ওরে হাসান, এ বাড়ির সুখ আনন্দ সব যে গেছে! বাড়িঘর সব খাঁ খাঁ করছে।

হাসান : শুধু এ বাড়িতে নয় দাদু, এ দেশের ঘরে ঘরে আজ এমনি শূন্য হাহাকার। তোমার চোখে আজও সেই আযাদ দেশের স্বপ্ন। কি করে বুঝাব তোমাকে, এই হাহাকারের বেদনাই আজ এই গোলামের দেশে বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে!

দাদু : (বেশ কিছুটা উদ্বুদ্ধ কণ্ঠে) হাসান! শুনেছি, এবার নাকি সেই বেনিয়া কোম্পানী এদেশের ধর্ম–কর্ম–তমদ্দুন সব নষ্ট করতে চলেছে?

হাসান : অস্বাভাবিক নয়। কোন দেশকে জয় করতে হলে তার নিজের বলতে সব কিছুকে ধ্বংস করতে হয় দাদু।

দাদু : কয়েকজন বিদেশী এত বড় দেশকে এমনি করে জ্বালাতন করছে, আর তোরা দেশের এতগুলো লোক নীরবে বসে আছিস?

হাসান : তাই তো দাদু, এটা কি বসে থাকার সময়? আঁধার রাতে ঝড় আসছে, এ রাত কি ঘুমিয়ে কাটানো যায়?

[এর মধ্যে পুরোপুরি বদলে গেছেন দাদু। এসে গেছে সেই আগের দিনের মেজাজ]

দাদু : হাসান! তোর দেহের শিরায় শিরায় বইছে এমন রক্ত, তোর খান্দানে এমন ঐতিহ্য, দুঃখের সাগরে পাড়ি জমাতে যা ভয় পায় না। জুলুমের প্রতিবাদে মৃত্যুর সঙ্গে যা পাঞ্জা ধরে, প্রিয়জনের চোখের পানি মুছে দিয়ে যা চলার পথকে এগিয়ে

www.pathagar.com

দেয়। সে রক্ত, সে ঐতিহ্য, তোমার হাসান, তোমার! তুমি কি পার আজ দেশের এ ডাক শুনে– (হঠাৎ যেন খেয়াল হল) একি হাসান! এ আমি কি বলছি? কথায় ভুলিয়ে এ কী কথা তুই ওঠালি হাসান? ও বউ! বউমা! শুনছ?

[আম্মা আসেন। দাদুর মনে সব কিছু যেন গুলিয়ে গেছে। চোখে শূন্য দৃষ্টি]

আম্মা : বুড়ো মানুষকে কেন বিরক্ত করছ হাসান?

হাসান : তুমি আমাকে মাফ কর আম্মা। না ভেবে আমি এক মোহময় গুপ্তধনে হাত দিয়েছি। সামনে খুলে গেছে এক সাম্রাজ্যের দ্বার। কিছুতেই ফিরে আসতে পরছি না আম্মা।

দাদু : হাসান এসব কি বলছে রে বউমা?

আম্মা : ওসব কিছু নয় আব্বাজান।... হাসান, আমি জানি– পলাশীর জ্বালা, মজনু শাহ্–তিতুমীরের ব্যর্থ প্রয়াস, তোদের রক্তে রক্তে কি কথা ক'য়ে যায়! আমি জানি, তোর দাদুকে সে কথা শুনিয়ে তুই সেই রক্তের দোলা অনুভব করতে চাস। এবার তোকে দেখেই আমার বুক এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে! হাসান, তোর মনের কথা খুলে বল্।

[আকাশে মেঘ গর্জন]

তুফান আসবে নাকি রে হাসান?

হাসান : মেঘ জমেছে আকাশে, আসতেও পারে।

[বাইরে থেকে মুদাররেস ডাকেন–]

মুদাররেস : হাসান বাড়ি আছ?

হাসান : আছি ভাইজান। আম্মা, গাঁয়ের মুদাররেস সাহেব এসেছেন। আমি আসছি।

[চলে যায়]

দাদু : বউ, সব কিছুই যেন কেমন লাগছে! হাসানের শাদীর কথা বলছি, অথচ কিছুতেই আনন্দ জমছে না।

আম্মা : কপালের লেখা কিছুই ছাড়ান যাবে না আব্বাজান। দেশের আবহাওয়া মোটেই ভাল নয়।

দাদু : কেন? আবার দেশে যুদ্ধ আসছে নাকি? (আম্মা চলে যান। মুদাররেস ও হাসান আসেন) এই যে মুদাররেস সাহেব! আসুন! সঙ্গে পুথি

www.pathagar.com

এনেছেন?

মুদার : জ্বি, পুথি ছাড়া কি আপনার দরবারে আসা যায়? এনেছি। কিন্তু আর সব খায়ের তো?

দাদু : ওই দুষ্টুটাকে জিজ্ঞাস করুন। আমাদের সব খায়রিয়াত তো ওকে কেন্দ্র করেই!

হাসান : আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেই দাদুর সব খায়রিয়াত এসে হাজির হয়। নিন, আরম্ভ করুন।

[পুথি পড়া আরম্ভ হয়]

মুদার : এইরূপে আছিল যতেক পাহালওয়ান।
শহীদ হইল দেখ আল্লা'র ফরমান।।
ইমাম হোসাইন তবে ডাহিন বামেতে।
নজর করিয়া শাহা লাগিল বলিতে।।
ইয়ার আমার কেহ নাহি সালামত।
দেখিয়া কাতর বড় হইল হজরত।।
কাসেম হাসানের বেটা হইল সওয়ার।
একাদশ বৎসরের বয়স তাহার।।
হুকুম চাহিল এসে চাচার সাক্ষাতে।
দেখিয়া হোসাইন শাহা লাগিল কান্দিতে।।
কহিল আমারে শেষ বাত হাসান ভাইয়া।
কাসেম আপন বেটি দেলাইবে বিয়া।।
এ কওলে বন্দী আছি দুনিয়া ভিতরে।
কওল হইতে যে খালাস দেহ মোরে।।
কহেন কাসেম চাচা আরজ আমার।
কওল খালাস তবে কর আপনার।।
শুনিয়া ইমাম বৈসে মজলিস করিয়া।
সোয়া ঘড়ি লগন তারে দিলেক ঢালিয়া।।
শাদীর সামানা সবে করে খোশালিতে।
ক্ষণেকের তরে সবে হয়ে আনন্দিতে।।

www.pathagar.com

সকিনারে সঁপে দিল কাসেমের তরে।
দুইজনে বসে গিয়া খিমার ভিতরে।।

মুদার ঃ সদ্য বিবাহিত কাসেম রণে চলল। তাঁবুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে বিবি সখিনা। শাদী হয়েছে, কিন্তু স্বামীকে জানল না, বুঝল না। কাসেম বলছে ঃ সখিনা, তুমি চেয়ে থাক। রণে জয়ী হয়ে আমি ফিরে আসব তোমার কাছে। – দুলদুল ফিরে এসেছিল। পিঠ তার খালি। সওয়ারী নেই। সখিনার চোখ নিষ্পলক। মুখে কথা নেই।

[সূর্য তখন অস্ত গেছে। দূরে আযান]

নামাজের সময় হল।

দাদু ঃ নামাজ এখানেই পড়ে যান।

মুদার ঃ জ্বি না, জায়গীর বাড়িতে ফিরতে হবে।

(দাদু উঠে ওজু করতে যান। মুদাররেস যেন স্বরূপে আবির্ভূত হন]

খবর এসেছে।

হাসান ঃ কখন?

মুদার ঃ একটু আগে। আজই চট্টগ্রামের ৩৪ নম্বর রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেছে। আর আজই একটু আগে ঢাকায় সাহেবদের সভা হয়েছে। ঢাকায় সিপাহীদের অস্ত্রহীন করা হবে। তাই আমাদের যেতে হবে হাসান।

হাসান ঃ আজই?

মুদার ঃ আজ রাত্রেই। খুব জরুরী। ওই আম্মা আসছেন ডাকতে। আমি আসছি।

[চলে যান। হাসান নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে। আম্মা আসেন]

আম্মা ঃ মুদাররেস সাহেব এসেছিলেন কেন রে?

হাসান ঃ এমনি বেড়াতে।

(আম্মা চলে যান। দূরে আযান চলছে। একটু পরে বেজে ওঠে কাসর-ঘন্টা। হাসান চলে যায়, অন্ধকার নামে। লণ্ঠন হাতে দাদু আসেন। বসেন চৌকির উপর। মুখে কথা নেই। দৃষ্টি তাঁর কোন্ সুদূরে। হাসান আসে)

কি দেখছ দাদু?

www.pathagar.com

দাদু : এ্যাঁ? হ্যাঁ! দেখছি সন্ধ্যা। সন্ধ্যার আঁধারে ঘোমটা পরা রূপসী বাংলার এমনি মৌন মুখচ্ছবি কত দেখেছি। আজও দেখছি। (আম্মা আসেন। হাতে একটা পেঁটারা) এটা কিরে বউ?

আম্মা : দেখাচ্ছি আব্বাজান। বস হাসান।

[হাসান বসে। পেঁটারা খোলেন আম্মা। তাতে বহু পুরনো কিছু গহনা]

দাদু : এ্যাঁ, এ যে দেখি তোমাদের গয়নাগাটি বউমা!

আম্মা : জ্বি। হাসান, এগুলো চিনিস?

দাদু : হাসান কি করে চিনবে বউমা? ও কি-ই বা জানে, কি-ই বা বোঝে। হাসান, এ চন্দ্রহার ছিল আমার আম্মার, দিয়েছিলেন তোর দাদীজানকে। এ সিঁথিপাটটা আম্মা পরে বানিয়েছিলেন নতুন করে। এই তো সব গয়নাই রয়েছে দেখছি। জানিস হাসান, এ বাড়িতে নতুন বউ আসত চারদিক আলো করে। সর্বাঙ্গে থাকত তাদের গয়নার আলোচ্ছটা!

আম্মা : এ সব গয়না আমাদের, তুই কোনদিন দেখিস নি। তোর জন্মের পরপরই এসব আমি খুলে রেখেছিলাম।

দাদু : তোর আব্বা চলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল এ বাড়ির সব আলো!

আম্মা : তোর দাদীজানের সব গয়না পরেই আমি এ বাড়িতে এসেছিলাম। তারপর কয়েক পুরুষের এই স্মৃতিমাখা গয়না আমি পেঁটারাবদ্ধ করে রেখেছি। তোর আব্বা চলে গেলেন আজ ছাব্বিশ বছর। এই ছাব্বিশ বছর এই সম্পদ আমি বুকের কাছে রেখেছি। আশা করে এসেছি, তোর বউয়ের গায়ে এসব পরিয়ে দিয়ে আমি মুক্ত হব। সেই বউ এসে তোর দাদুকে সালাম করবে। ছাব্বিশ বছরের আশা আমার! তোদের রক্তকে আমি চিনি! আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। এবার বল্ তোর উত্তর। (হাসান নির্বাক) গাজীদের ঘর আমাদের সমান ঘর। তা' ছাড়া মেয়েটিও দেখতে সুশ্রী। এ বাড়ীর উপযুক্ত বউ হবে সে।

হাসান : কিন্তু আম্মা, আমার সব কথা আগে শুনে নাও। বিয়ে করতে আমার অমত নেই। কিন্তু–

আম্মা : কিন্তু কি বল্? আমাকে সঙ্কোচ করিস না।

www.pathagar.com

হাসান : গাজীদের মেয়ের কথা বাদ দাও আম্মা।

আম্মা : বাদ দেব? তবে কি–

হাসান : পরে তোমাকে সব জানাব আম্মা। আর–

আম্মা : আর?

হাসান : দেশের অবস্থাও অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। চারদিকেই যেন একটা প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাস। তাই বলছিলাম–

আম্মা : তাহলে আমার আশঙ্কা মিথ্যা নয়?

(হাসান আম্মার চোখে চোখ রেখে শান্ত কণ্ঠে বলে–)

হাসান : মায়ের মন যা অনুভব করেছে, তা কি ভুল হতে পারে আম্মা?

(আম্মার দৃষ্টিতে ঝড়ের আশঙ্কা)

আম্মা : তুই কি মমতা আর কর্তব্যের মধ্যে কার দাবী বড় তা বেছে নিয়েছিস? (হাসান নিরুত্তর) – তাহলে, এগুলোও তুই সঙ্গে নিয়ে যা। আমি আর এ সবের বোঝা বইতে পারছি না। এগুলো যেন এক একটা বিষধর সাপ! (বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন আম্মা) এরা সব সময় আমাকে দংশন করতে আসছে!

হাসান : আম্মা, তোমার চোখের পানি?

আম্মা : চোখের পানিতে সান্ত্বনা পাওয়ার অভ্যাস আমার হয়ে গেছে রে! আমার দুঃখের আঁসু তোর চলার পথে বাধা না হয়, এই আমি চাই!

হাসান : আমি জানি আম্মা, জানি। আমি জানি, তোমার আশা–পথের প্রদীপ হয়ে জ্বলছে কার মুখের হাসি। কার মুখ চেয়ে তুমি সারাটা জীবন কঠোর পরিশ্রম করে গেছ। আমি কি ভুলতে পারি– শ্রমভারে ক্লান্ত শান্ত, হারানোর বেদনায় মূক, তুমি আমার সর্বহারা দুঃখিনী মা!

আম্মা : তাহলে? ওরে হাসান, তাহলে?

হাসান : দেশের ঘরে ঘরে আমার এমনি মা, আর চারদিকে হিংস্র স্বার্থের ছিনিমিনি খেলা। বিদেশী বেনিয়ার শ্বাসরোধী শোষণ–অভিযান। দেশ যতদিন বিদেশীর অধিকারে, ততদিন আমার সেই মায়ের, তোমার– সকল আশা, সকল স্বপ্ন যে ব্যর্থ হয়ে যাবে আম্মা! তাই তো বিদেশী বিতাড়ন আজ আমাদের প্রধান ও প্রথম

www.pathagar.com

কর্তব্য। স্বপ্ন তোমার, আশা তোমার, এই মাটিতে ফুলে-ফলে রূপ নিক, এ তো তোমারও কামনা।

(নিজেকে সংযত করে নেন আম্মা)

আম্মা : তোর দাদুকে নিয়ে আয়। আজ একসঙ্গে খাবি।

[চলে যান। দাদুকে নিয়ে হাসানও ভিতরে যায়। আসে আলী। তখনই পথিকের বেশে আসেন মুদাররেস। মুদাররেসের হাতে একটা পোটলা]

মুদার : এই যে আলী! একটা কথা ছিল।

আলী : এ্যাঁ! আপনাকে খুব অস্থির মনে হয়?

মুদার : কি জানি— কিন্তু— একটা কথা। (কাছে এসে) কেমন আছ?

আলী : মানে?

মুদার : এই কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করছি। হাল-হকিকত কি?

আলী : দেশের অবস্থা তো জানেনই। এক বেলাও পেট পুরে খাওয়া মেলে না। গায়ে খেটে যা পাই, দরকারী জিনিসপত্র কিনতে তার চেয়েও বেশি লাগে। কাজেই—

মুদার : কাজেই?

আলী : বুঝতে পারি না কি করব?

মুদার : আমাদের দেশ তো শুনেছ সুজলা-সুফলা, শস্যশ্যামলা?

আলী : শুনেছিলাম, কিন্তু—

মুদার : টাকা পয়সা যায় কোথায়?

আলী : টাকা পয়সা?

মুদার : হ্যাঁ। কাঁচামাল, হাসি-গান, হীরের ফুল, কানের দুল?

আলী : যায় তো পেটে।

মুদার : আর?

আলী : আর!

মুদার : অন্য জায়গায়। হাঃ হাঃ হাঃ — (আপন মনে) খুব দেরী হচ্ছে। হোক। অপেক্ষা করতেই হবে। আচ্ছা আসি।

[চলে যান]

আলী : কি ক'য়ে গেল পাগলের মত, কিছুই তো বুঝলাম না। যাক,

www.pathagar.com

আর বুঝাবুঝি কি।

[আলী গুন গুন করে জারীর দিশা "রণে যায় নওশা কাসেম, কাইন্দা মরে মায়। কি কইয়া বুঝাইব বল কন্যা সখিনায়।।" গাইতে গাইতে বেরিয়ে যায়। অন্য দিক দিয়ে ঢোকেন দাদু ও হাসান]

হাসান : দাদু! এজিদের কথা ভাবছ?

দাদু : এ্যাঁ! হ্যাঁ। জালেম এজিদের কথা।

হাসান : ফোরাতের পানি আটকে রেখেছে এজিদের সেনা। এক ফোঁটা পানিও দেবে না ইমামের লোককে। ইমামের তাঁবুতে শোকের ছায়া। পানির পিপাসায় কাঁদছে নরনারী, কাঁদছে কোলের শিশু। যদি আত্মসমর্পণ করেন ইমাম, সব অবরোধ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তাঁরা কি তাই করবেন?

দাদু : অসম্ভব। তা কি ওঁরা করতে পারেন?

হাসান : তাহলে?

দাদু : যুদ্ধ করবেন। প্রাণ দিতে হয়, জঙ্গের ময়দানেই প্রাণ দেবেন। তাঁবুতে বসে মান দেবেন না।

হাসান : মজনু শাহ'র লড়াইয়ের কথা তোমার স্মরণ আছে দাদু?

দাদু : সে কি ভোলা যায় রে! ত্রিস্রোতার তীরে তীরে গভীর বন। সে বনে আমাদের আস্তানা। নদীর অপর পারে কোম্পানীর ফৌজ। সঙ্গে দেবী সিংহ। মজনু শাহ্ জিজ্ঞেস করলেন, আত্মসমর্পণ করলে আমাদের ভয় নেই। তাই কি আমরা করব? সমস্বরে প্রতিবাদ উঠলঃ না। গর্জে উঠলেন মুসা শাহ্। দয়াল রাজার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলঃ ভয় নেই নওজোয়ান। এ দেশ তোমার, এদেশ আমার! এগিয়ে যাও। ঝাঁপিয়ে পড় বিদেশী বেনিয়ার উপর। আদেশ দিলেন নির্ভীক মজনু শাহ্। ত্রিস্রোতার পানি রক্তে লাল হয়ে গেল। মান কি দাদু মানুষ বিসর্জন দিতে পারে?

হাসান : আর আমার আব্বা? ছাব্বিশ বছর আগে তিতুমীরের সেই সংগ্রাম?

দাদু : সেখানেও সেই একই ইতিহাস। যুগে যুগে এ দেশের মানুষ বিদেশীকে তাড়াতে এগিয়ে এসেছে, কামিয়াব হয় নি। ঘর হারিয়েছে, ধন হারিয়েছে, জন হারিয়েছে। কিন্তু মান হারায় নি।

হাসান : দাদু? তুমি বসে বসে ভাব। আমি আসছি।

www.pathagar.com

[চলে যায়। নির্বাক বসে ভাবেন দাদু। কোন্ দূর অতীতের কথা যেন শুনতে পাচ্ছেন তিনি—]

নেপথ্যকণ্ঠ ঃ আব্বা! তিতুমীরের আযাদী সংগ্রামে যোগ দেওয়া আমার অবশ্য কর্তব্য। আমি যদি না ফিরি, এই খোকা রইল, তাকে তুমি বুকে নিও।

[দাদুর কানে সেদিনকার যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। – এদিকে কাপড় চোপড় নিয়ে তৈরী হয়ে আসে হাসান। আস্তে আস্তে অন্য দিক দিয়ে আসেন মুদাররেস। হাতে চাপাতি ও রক্তপদ্ম]

মুদার ঃ হাসান।

হাসান ঃ আস্তে ভাইয়া! দাদু স্বপ্ন দেখছেন। আমার আম্মা, চির–দুঃখিনী মা আমার ওই ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন। আসমানের দিকে চেয়ে। নির্বাক।

মুদার ঃ এই দেখ সংকেত।

হাসান ঃ চাপাতি আর রক্তপদ্ম?

মুদার ঃ চাপাতি আর রক্তপদ্ম।

হাসান ঃ (দৃপ্ত কণ্ঠে হাসান বলে) ইন্‌কিলাব!

মুদার ঃ ইন্‌কিলাব। — — প্রস্তুত?

হাসান ঃ প্রস্তুত।

মুদার ঃ এস।

[হাত ধরে নিয়ে যান। সংগে সংগে চীৎকার করে ওঠেন দাদু]

দাদু ঃ হাসান! হাসান! একি! কেউ নেই? বউমা, বউমা, ওরে বউ! (আম্মা আসেন। হাতে প্রদীপ) বউমা! হাসান চলে গেছে। ওরে বউ, ওকে ডেকে আন্। আমার দাদু, আমার বংশ-প্রদীপ! ওরে বউ!

আম্মা ঃ হাসান ফিরবে না আব্বাজান। এই চিঠি রেখে গেছে তার ঘরের সামনে। দিয়ে গেছে তার আর এক সমস্যার ইঙ্গিত।

দাদু ঃ কিন্তু সামনে যে বড় বিপদ! দেশের বুকে আবার অমঙ্গলের ছায়া! ঝড় আসছে দেশ ছেয়ে! ওরে বউ! আমার হাসান — —

আম্মা ঃ আল্লাহ্ ওকে হেফাজত করবেন।

[প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে থাকেন আম্মা]

www.pathagar.com

তৃতীয় অঙ্ক

স্থান ঃ পীতাম্বরের বাসা

কাল ঃ ১৮৫৭ সাল

[তখন বেশ রাত হয়েছে। সৌদামিনী ও হাসান আলাপ করছে]

হাসান ঃ শোন বৌদি। দাদু আর আম্মার মনে খান্দানী মোহ আজও এত বেশি যে এক সাধারণ পরিবারের এই মেয়েটির কথা বলতে আমি সাহসই পাই নি।

সৌদামিনী ঃ কিন্তু না বললে তাকে ঘরে আনবে কি করে? তুমি সৈনিক, তোমার মনে এই মেয়েলি ভয় কেন?

হাসান ঃ মেয়েলি ভয় নয় বৌদি। গাজীদের মেয়েকে বউ করে ঘরে আনবেন– এই তাঁরা জানেন। এর মধ্যে জেবুন্‌নিসার কথা বললে তাঁরা যে শুধু অমতই করতেন তা নয়, এক কঠিন আঘাতে ভেঙে পড়ত তাঁদের মন। আমি এত তাড়াতাড়ি সে আঘাত হানতে চাই নি। আমার দাদু এক অশীতিপর বৃদ্ধ।

সৌদামিনী ঃ কিন্তু সমস্যা যে রয়েই গেল! জেবুন্‌নিসারও সমাজ আছে, বাপ–মা আছে! বিয়ে না হলে ...

হাসান ঃ সে ভয় তার নেই।

সৌদামিনী ঃ কিন্তু সামনে আসছে এক মহাদুর্যোগ। ঝড়ের রাতে বিপদভরা পথের এক যাত্রী তুমি!

হাসান ঃ দুর্যোগের ভয় আমাদের নেই বৌদি।

সৌদামিনী ঃ তুমি হয়তো জান না জেবুন্‌নিসা আমার ও ঘরেই বসে আছে।

হাসান ঃ জেবু এসেছে! একা?

সৌদামিনী ঃ একা।

হাসান ঃ আমি যাব সেখানে?

সৌদামিনী ঃ ওকে আমি এখানেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[চলে যায়। একটু পরে জেবুন্‌নিসা ঢোকে]

হাসান ঃ এস। তুমি আজ রাতে এখনে আসবে, ভাবতেই পারি নি।

www.pathagar.com

জেবু ঃ ভাবাই উচিত ছিল তোমার।

হাসান ঃ জান, বৌদি কি বলে গেলেন?

জেবু ঃ কি?

হাসান ঃ দুর্যোগ আসছে ঝড়ের গতিতে।

জেবু ঃ (হাসানের চুলে হাত বোলায়) আসে আসুক। প্রদীপ আমার হাতেই জ্বলবে। ঝড়ের রাতে আমি তাকে বাঁচিয়ে রাখব।

হাসান ঃ আর যদি ঝড়ের রাতে আমি হারিয়ে যাই? আমাকে খুঁজে না পাও?

জেবু ঃ না না, এই অমঙ্গলের কথা মুখে এনো না।

হাসান ঃ ও আপনিই এসে যায়। বড় সত্য কথা যে।

জেবু ঃ না হারানোটাও তো সত্য হতে পারে। সত্য হতে পারে আমাদের স্বপ্ন। হাসি, গান আর ভালবাসায় ভরে থাকবে আমাদের ঘর, এ স্বপ্ন যে তুমিই আমাকে দেখিয়েছ।

হাসান ঃ তখন আকাশ ছিল নীল, মেঘমুক্ত। চেয়ে দেখ, আজ সেখানে ঝড়ো মেঘের আস্ফালন।

জেবু ঃ হোক তা। তবু – স্বপ্ন আমাকে দেখতে দাও। আচ্ছা, আম্মার কাছে আমার কথা বলেছিলে?

হাসান ঃ না।

জেবু ঃ কেন, বল নি কেন?

হাসান ঃ সাহস হয় নি। তাঁকে চিঠি লিখে এসেছি। এর আভাস তিনি পাবেন।

জেবু ঃ আভাসই কি যথেষ্ট? আম্মার আদর কুড়ানো যে আমার কত দিনের কামনা।

হাসান ঃ আম্মা তোমাকে গ্রহণ করবেন সে বিশ্বাস আমার আছে। তবে যত ভয় আমার দাদুকে নিয়ে।

জেবু ঃ তাহলে ভয় তো থেকেই গেল।

হাসান ঃ না, আম্মাই সব ব্যবস্থা করবেন।

জেবু ঃ আমাকে নিয়ে তোমার এ ভয় কি বরাবর থাকবে?

হাসান ঃ আমাকে তুমি বিশ্বাস কর না?

www.pathagar.com

জেবু : করি। তাইতো পিছে পড়ে রইল লৌকিক আচার, সমাজ, সংসার। আমি এ আঁধার রাতে ছুটে এলাম তোমার কাছে।

হাসান : তাই তো! পথ চলতে বিদ্যুৎ চমকে দেখেছি, আমার পাশে পাশে রয়েছে এক কল্প-সাথী। হাতের পরশে তার পরম আশ্বাস, অবসর মুহূর্তে বিপুল প্রেরণা।

জেবু : (কণ্ঠে কৃত্রিমতা মিশিয়ে) কে সে?

[দু'জনেই হেসে ওঠে। হাসান জেবুন্নিসাকে কাছে টানে। সৌদামিনী আসে। হাতে ফুলের মালা]

সৌদামিনী : নাও, এ মালা তোমাদের। সাজানো ঘরে আমি আলো জ্বেলে রেখেছি। তোমাদের এ মুহূর্তকে বরণ করতে এর বেশি কিছু আমার নেই।

[মালাগুলো ওদের হাতে দিয়ে চলে যায়। ওরা দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে থাকে]

মুদার : (নেপথ্যে) হাসান ঘরে রয়েছ?

হাসান : মুদাররেস সাহেব এসেছেন। (জেবু পাশের ঘরে যায়) আসুন ভাইয়া।

মুদার : (দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে) তোমরা বাইরে অপেক্ষা কর। চারদিকে নজর রাখবে। কাউকে সন্দেহ হলে সঙ্কেত-ধ্বনি করবে। — হ্যাঁ হাসান, আজ রাতে — একি! কি হয়েছে হাসান? কিছু ভাবছিলে?

হাসান : কই, কিছু হয়নি তো ভাইয়া।

মুদার : তাহলে তোমার চোখমুখে — মনে হচ্ছে কোম্পানীর শাসনমুক্ত এই বাংলার এক চাঁদওঠা রাতে নীল আসমানের নীচে দাঁড়িয়ে তুমি এক মধুময় স্বপ্নে মশগুল?

[সৌদামিনী আসে]

সৌদামিনী : এই যে ভাইয়া, আপনিও এসে গেছেন। ভালই হল। আমি হিন্দুর মেয়ে, আপনাদের কাজকামের সব রীতিনীতি কি আমার জানা আছে?

মুদার : আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না যে! কি ব্যাপার?

সৌদামিনী : আজ যে হাসানের বিয়ে?

মুদার : হাসানের বিয়ে!

www.pathagar.com

সৌদামিনী ঃ হ্যাঁ, মেয়েটি পাশের ঘরেই আছে। আমি ভাবলাম, আর দেরী করা উচিত নয়। তাই আজ রাতেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চাই। শুভ কাজে দেরী করা উচিত নয়। আপনি ও ঘরে আসুন তো।

মুদার ঃ হাসানের বিয়ে – হঠাৎ এই রাতে – মানে, অবিশ্যি এ খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু আমি, মানে ঠিক– অন্য কথা ভাবছিলাম কি না – যাক। তাই আমার ভাইটির চোখে–মুখে এত স্বপ্ন?

সৌদামিনী ঃ হ্যাঁ। কিন্তু আপনি আসুন।

মুদার ঃ আমি গিয়ে এ-অবস্থায় ওঘরে কি করব?

সৌদামিনী ঃ বাঃ, বিয়ে পড়াতে হবে না? আসুন। এস হাসান।

[সৌদামিনী হাসানের হাতে ধরে পাশের ঘরে যায়। মুদাররেসও যান। একটু পরে সঙ্কেত–ধ্বনি হয়। সৌদামিনী আসে]

সৌদামিনী ঃ (পাশের দিকে চেয়ে কাউকে বলে–) কি হয়েছে? কেউ আসছে – না না, এইতো ও লোকটা বাঁয়ের রাস্তায় চলে গেল। তবু সাবধানে থেকো।

(ঘরের একটা বাক্স থেকে একটা পিস্তল বের করে নিজের কাছে লুকায়)

কোম্পানীর লোক আমার নিরপরাধ ভাইকে খুঁচিয়ে মেরেছিল!

(স্বামীর তৈলচিত্রের কাছে যায়)

তুমি, আমার স্বামী, কোম্পানীর গোলামী করছ। কোম্পানীর টাকায় আমাদের সংসার চলছে। ওরা তোমাকে বাবু বলে ডাকে। বিশ্বাস করে। তুমিও সে বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করে এসেছ। কিন্তু এ-ও জানি, তুমি আজও আমার ভা'য়ের মুখখানি ভুলতে পার নি। সে নির্মম ঘটনা তোমার মনকে ব্যথাতুর করে তোলে। কিন্তু তুমি অপারগ। এক আশ্চর্য মানুষ। তুমি আমার মহাদেব স্বামী। তাই তো মরণ যজ্ঞের এই পরিকল্পনায় তোমাকে জড়াতে চাই নি। তোমাকে জড়ালেও বিশেষ কোন উপকার হত না। দুর্বল হাতে চোখের জলই তুমি মুছতে পার। পার না সে হাতে আগুন ঝরা মৃত্যুবাণ তুলে নিতে।

[মুদাররেস আসেন]

মুদার ঃ আপনি ওদের কাছে যান। আমি কিছু কাজ সেরে নিই।

www.pathagar.com

সৌদামিনী ঃ আমারও এখন এ ঘরে কাজ রয়েছে। কিন্তু ভাইয়া! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা? এ ঘর যে কোম্পানীর বিশ্বস্ত এক নতুন বাবুর!

মুদার ঃ (হাসে) তাইতো ঘোগের পক্ষে অনেক সুবিধা হয়েছে। এমন মহাদেব বাঘ। একবারে বৈষ্ণব বলা চলে। বিশ্বাসের এত শক্ত প্রাচীর ডিঙিয়ে কোম্পানীর সন্দেহ এ ঘরে পৌছতেই পারবে না। – হ্যাঁ, আমি কয়েকটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। বাইর দাঁড়ানো ওদের দিয়ে এখ্খুনি পাঠাতে হবে।

[সৌদামিনী দোয়াত কলম এগিয়ে দেয়। মুদাররেস লেখেন]

সৌদামিনী ঃ কোম্পানীর কি খবর ভাইয়া?

মুদার ঃ ওরা ভয় পেয়েছে।

সৌদামিনী ঃ দিল্লীর খবর কি?

মুদার ঃ কোন সঠিক খবরই এখন পাওয়া সম্ভব নয় বোন। শুধু চট্টগ্রামের খবর জানি। সুবেদার রজব আলী খানের নেতৃত্বে ৩৪ নম্বর রেজিমেন্ট বন্দুকের মুখ ঘুরিয়ে ধরেছে।

সৌদামিনী ঃ কোম্পানীর শক্তির তুলনায় আমাদের শক্তি কত?

মুদার ঃ তার পরিমাণ জানা মুশকিল। তবে আমাদের শক্তি যথেষ্ট। ওরা মুষ্টিমেয়। খবর পেয়েছি, কাল ভোরের প্যারেডে ওরা সিপাইদের অস্ত্রহীন করবে।

সৌদামিনী ঃ তাহলে?

মুদার ঃ তাহলে আর কি? ভোরের আগেই সুবেহ্ সাদেক আসে বোন। এই রাত্রি শেষের সুবেহ্–সাদেক হয়ে উঠবে আমাদের সুবহে উম্মিদ। (চিঠি শেষ করে উঠে পড়ে) এই শুভ মুহূর্তেই আমাদের যাত্রা হবে শুরু। হ্যাঁ, ওরা দু'জন শুধু এখানে পাহারাদার থাকবে। বাকী তিন জন চলে যাবে এই চিঠিগুলো নিয়ে। এই শহরের বিভিন্ন স্থানে এগুলো পৌছে দিতে হবে। আমি আরেকটা কাজ শেষ করে নিই।

[সৌদামিনী চিঠি নিয়ে বেরিয়ে যায়। মুদাররেস আক্রমণের পরিকল্পনা দেখতে থাকেন। সৌদামিনী ফিরে আসে]

সৌদামিনী ঃ এটা কি ভাইয়া?

মুদার ঃ আমাদের আক্রমণ–পরিকল্পনা। হাসানের কর্মস্থানটা আবার

www.pathagar.com

দেখে নিলাম।

সৌদামিনী ঃ শহরের এ-দেশীয় বাশিন্দারা আমাদের সাহায্য করবে না? শুনলাম ভয়ে তারা মালমাত্তা সব কিছু মাটির নীচে পুঁতে রাখছে?

মুদার ঃ মালমাত্তা বেশি আছে তাদেরই, যারা কোম্পানীর অনুগ্রহে তুষ্ট। বাকী যারা, তারা কায়মনোবাক্যে কামনা করছে, কোম্পানীর জুলুমের অবসান হোক। অসহায় দৃষ্টি মেলে ওরা দেখছে, এ দেশের ধন–সম্পদ ব্যবসা–বাণিজ্য সব ওদের হাতে। শুনেছে শস্য–শ্যামলা বাংলার কাঁচা মালে বৃটেনের শোষণ–যন্ত্র শব্দমুখর। এদেশের এক ভাই দেখছে, জামদানী-শিল্পী অন্য ভাইয়ের আঙুল কেটে দিচ্ছে ওই সাদা বেনিয়া। শুনেছে ধানচাষের জমিতে নীলকরের পৈশাচিক উল্লাস। তাদের মৌন বেদনা আমাদের রাতের আঁধার দূর করে দেবে বোন। হ্যাঁ, পীতাম্বর বাবু কোথায়?

সৌদামিনী ঃ সাহেবরা ডেকেছে।

মুদার ঃ এত রাতে?

সৌদামিনী ঃ আমার দেবরকে সঙ্গে নিয়েছে। ওকে সঙ্গে নেবার নির্দেশও নাকি ছিল।

মুদার ঃ তাই নাকি? কারণ? (পীতাম্বর একা আসে) এই যে পীতাম্বর বাবু! এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

পীতাম্বর ঃ লালবাগে।

সৌদামিনী ঃ ঠাকুরপো কোথায়?

পীতাম্বর ঃ সে রয়ে গেছে। সাহেবরাই তাকে থাকতে বললেন।

সৌদামিনী ঃ কেন?

পীতাম্বর ঃ হয়তো প্রয়োজন আছে।

মুদার ঃ ওরা কি বলছে আমাদের সম্পর্কে?

পীতাম্বর ঃ আপনাদের কথা জেনেও যেমন ওদেরকে তা বলতে পারছি না, ওদের কথাও তেমনি আপনাদের কাছে বলা আমার উচিত নয়। আমি যে উভয় সঙ্কটে।

মুদার ঃ সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে অনুরোধ আপনাকে জানানো হয়েছে।

www.pathagar.com

পীতাম্বর ঃ হয়েছে, কিন্তু আমি নিরুপায়। আপনারা কামিয়াব হোন, আপনাদের বিজয়-উৎসবে যোগ না দিয়েও আমি ঘরে বসে মনের আনন্দে সে মুহূর্তকে বরণ করব।

মুদার ঃ তা আমরা জানি পীতাম্বর বাবু। আল্লাহ্ যদি সময় দেন, সে উৎসবের দিন যদি আমরা অর্জন করতে পারি, আপনি থাকবেন আমাদের পুরোভাগে।

পীতাম্বর ঃ আপনারা সফল হোন। কিন্তু যতটুকু জানি, নির্দিষ্ট নেতৃত্বের পরিকল্পিত নির্দেশ এখনো পর্যন্ত আপনারা পান নি। পাচ্ছেন যা, তা গুজব মেশানো খবরের হাঁক-ডাক। আর আমাদের প্রাপ্ত এ সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে সাফল্যের প্রার্থনাই শুধু স্বাভাবিক।

মুদার ঃ পথ চলার সর্বস্তরেই হিসাব মিলতে চায় না। তবু মানুষ পথ চলে।

পীতাম্বর ঃ আপনাদের সাফল্যে আমার মন আনন্দে নেচে উঠবে। সৌদামিনী! বাক্সের চাবিটা?

সৌদামিনী ঃ কি রাখতে হবে আমাকে দাও, রাখছি।

পীতাম্বর ঃ না, চাবিটা আমাকেই দাও।

[সৌদামিনী অবাক হয়ে ম্লান মুখে বাক্সের চাবি দেয়। পীতাম্বর বাক্স খুলে কতগুলো চাবি রাখে]

সৌদামিনী ঃ এই প্রথম তোমার কাছে চাবি দিতে হল।

পীতাম্বর ঃ নিতে হল বলে আমিও কম দুঃখিত নই।

মুদার ঃ আমি একটু আসি।

[চলে যায়]

সৌদামিনী ঃ কি রাখলে?

পীতাম্বর ঃ (মুখোমুখি দাঁড়িয়ে) আমার ভাইয়ের জীবন।

সৌদামিনী ঃ মানে?

পীতাম্বর ঃ দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে। সাহেবরা এদেশের কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আমাকেও না। অথচ না করেও উপায় নেই। বারুদ ঘরের চাবি আজ আমার হাতে। তাই আমার ভাই, যাকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি বলে ওরা জানে, তাকে

www.pathagar.com

রেখে আসতে হয়েছে ওদের জিম্মায়। – আর কেউ এসেছিল?

সৌদামিনী : হ্যাঁ, হাসান আর জেবুন্‌নিসা।

পীতাম্বর : হাসান আর জেবুন্‌নিসা? এই রাতের প্রান্তে দাঁড়িয়েও হৃদয়ের খেলা?

সৌদামিনী : কি বলতে চাও?

পীতাম্বর : না, বলছিলাম – মানে – ওরা নিশ্চয়ই বিপ্লবের পরিকল্পনা করছে না?

সৌদামিনী : না। প্রেম করছে। কিন্তু তাতে হয়েছে কি?

পীতাম্বর : কিছুই হয় নি, আর হবেও না। তাইতো বলছিলাম –

সৌদামিনী : কি বলছিলে?

পীতাম্বর : নারীর হাত চেপে ধরা আর বন্দুক চেপে ধরা এক কথা নয় সৌদামিনী। সে যাক। আমি বড় ক্লান্ত। যদি পার, নিজেকে বাঁচিয়ে পথ চলো। রাত বোধ হয় শেষ হয়েই এল। (বাইরে বন্দুকের আওয়াজ ও কোলাহল) তাহলে।

[মুদারেস ব্যস্ত হয়ে ঢোকেন]

সৌদামিনী : কি হয়েছে ভাইয়া?

মুদার : আমাদের বেরুতে হবে বোন। বারুদ ঘরের চাবিটায় আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

সৌদামিনী : (স্বামীকে) চাবিগুলো দাও।

পীতাম্বর : (দৃঢ় কণ্ঠে) না।

মুদার : ও চাবিতে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

পীতাম্বর : আমি দিতে পারি না ভাই!

সৌদামিনী : কিন্তু আমাকে তা দিতেই হবে।

পীতাম্বর : অসম্ভব সৌদামিনী। আমার ভাইকে আমি নিজের হাতে খুন করতে পারি না!

সৌদামিনী : দেশের হাজারো ভাইয়ের জন্য প্রয়োজন হলে তাই করতে হবে।

[কোলাহল বাড়ে, বন্দুকের আওয়াজ হয়]

মুদার : হাসান! হাসান!

(উদভ্রান্ত হাসান আসে, পেছনে জেবুন্‌নিসা)

www.pathagar.com

পীতাম্বর বাবু! আমরা মরণ পথের যাত্রী, পথের মুমূর্ষু সাথীকেও প্রয়োজনে আমাদের ফেলে যেতে হয়। এখনও ভেবে দেখুন।

পীতাম্বর : আমিও বলছি আপনাদের ভেবে দেখতে। আর আদেশ করছি, এখুখুনি আমার এ বাসা পরিত্যাগ করে চলে যান।

সৌদামিনী : আদেশ করছ?

পীতাম্বর : হ্যাঁ সৌদামিনী, আদেশ করছি। যদি তোমরা বাঁচতে চাও, তাহলে চলে যাও।

সৌদামিনী : বাঁচতে আমরা চাই না।

পীতাম্বর : কিন্তু আমি তোমাদের বাঁচাতে চাই।

মুদার : এ আপনার অনুগ্রহ। কিন্তু চাবি আমাদের চাই। এই মুহূর্তে।

পীতাম্বর : আমি বেঁচে থাকতে সে চাবি আপনারা পাবেন না। আমার মাতৃহীন ভাইকে আমি বুকে করে মানুষ করেছি।

মাদুর : কথার সময় আমাদের নেই বোন।

সৌদামিনী : (পিস্তল উঠিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে) চাবি দাও।

পীতাম্বর : না সৌদামিনী, না! আমি তা পারবো না! তোমরা এখনও গেলে না? মনে রেখো, আমার বিপদ–সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা এখানে আটকা পড়বে। এখনও চলে যাও।

মুদার : থাক বোন। অন্য পথও আমাদের আছে। হাসান! চলে এস। (সৌদামিনীকে রওনা করতে দেখে) তুমি নয় বোন। তোমার এখানে থাকার বিশেষ প্রয়োজন। – বোন জেবুন্‌নিসা, স্বামীকে বিদায় দাও। ভুলে গেছ সখিনার কথা?

[হাসান জেবুর চোখের পানি মুছে দেয়। ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে থাকে জেবুন্নিসা]

হাসান : ভয় কি, আমি আবার ফিরে আসব!

[হাসান ও মুদাররেস চলে যায়। বাইরে কোলাহল, বন্দুকের শব্দ। এমন সময় আসেন আম্মা ও দাদু]

দাদু : এটাই কি পীতাম্বর বাবুর বাসা?

সৌদামিনী : হ্যাঁ, কিন্তু আপনারা?

দাদু : আমার পুত্রবধূ, হাসানের মা।

পীতাম্বর : আপনারা এখানে? এত রাতে?

www.pathagar.com

আম্মা : হাসান কোথায় মা?

সৌদামিনী : চলে গেছে, কাজে। জেবুন্‌নিসা, সালাম কর।

[জেবু দাদুকে সালাম করে]

দাদু : এই মেয়েটি কে মা?

[জেবু আম্মাকে সালাম করে]

সৌদামিনী : আপনার নাতবৌ, হাসানের স্ত্রী।

দাদু : এ্যাঁ! হাসানের স্ত্রী!!

সৌদামিনী : আজ রাতেই ওদের বিয়ে হল। বউকে বুকে নিন মা।

আম্মা : হাসানের বউ!!

[জেবুর মুখের দিকে তাকান]

দাদু : বউমা! ওরে বউ! হাসান বিয়ে করেছে? আমরা যে বউ – এই আমার নাতবৌ! ওরে হাসান!

[আনন্দে কেঁদে ফেলেন। বাইরে বন্দুকের আওয়াজ ও কোলাহল। দাদু–আম্মা–জেবু দিশাহারা। সৌদামিনী বাইরে যাওয়ার জন্য এগোয়]

www.pathagar.com

চতুর্থ অঙ্ক

স্থান ঃ ঢাকা শহরের একটি পথ

কাল ঃ ১৮৫৭ সাল

[রাতের অন্ধকারে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত। অন্ধকারে গুলী ছুটছে। আর্তনাদ, কোলাহল। এক সময় থামে। থমথমে আবহাওয়া। অন্ধকার রাতে কেউ কাউকে খুঁজছে যেন। মরণ যজ্ঞের প্রমাণ রাস্তায় ছড়িয়ে রয়েছে। মানুষ মরে আহত হয়ে পড়ে আছে। পীতাম্বর এসে পথে দাঁড়ায়। হাসছে, কাঁদছে। পথ চলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছে। পীতাম্বর পাগল হয়ে গেছে]

পীতাম্বর ঃ এদিকে – না ওদিকে – না ঐদিকে – নাহ্, কোনদিকেই না। রাস্তা তো রাস্তাই। এর আবার দিক কি? এর পূবও নেই, পশ্চিমও নেই, উত্তরও নেই, দক্ষিণও নেই। ঈষাণ, নৈঋত অগ্নি – কোনটাই নেই। কারণ পথ সোজা নয়। এই গেছে, এই বাঁকা হচ্ছে। এই মোড় ঘুরছে, এই অন্য রাস্তায় মিশে যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, দুই দিক আছে। উর্ধ, অধঃ। কিন্তু বেঁচে থাকলে তো সে দিকে আর যাওয়া যায় না। তাইতো সৌদামিনী, আমি কেমন করে তোমার কাছে যাই বল? তুমি হারিয়ে গেছ জানি। এত গোলাগুলী, এত বিশৃঙ্খলা, এর মধ্যে তুমি যখনই ঝাঁপিয়ে পড়েছ, তখনই জানি, তোমার খবরা-খবর আমাকেই নিতে হবে। আমার খবর নিতে আসার সুযোগ তুমি আর পাবে না।– এই রাতটা কি এক মৃত্যুর ছায়ায় কালো হয়ে আছে। কিন্তু আমার ছোট ভাই? কেউ জানে না। কিন্তু আমি তো জানি, কি হয়েছে তার? সেই ছিপছিপে তরুণ, তাকে দাঁড় করিয়ে বন্দুক বাগিয়ে ধরেছে– কে? কে বন্দুক বাগিয়ে ধরেছে? আর পীতাম্বরচন্দ্র তুমি– ঐ, ঐ আসছে– না, না আমি যাই, আমাকে ধরবে। চাবি আমি দেই নি, তবু ধরবে। ওরা আমায় বিশ্বাস করবে না। আমার ভায়েরা করে নি, ওরাও করবে না। যাই।

[ভীত-সন্ত্রস্ত পীতাম্বর চলে যায়। দুটো গোরা সৈন্য ঢোকে। ওদের চোখ পড়ে পালিয়ে যাওয়া পীতাম্বরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক গর্জে ওঠে। একটু পর ওরা চলে যায়, রাত

www.pathagar.com

গড়িয়ে চলে। একটা আওয়াজ ভেসে আসে]

আওয়াজ : (নেপথ্যে) ভাইয়া, পানি! – ভাইয়া, পানি!

(একটা আর্তনাদ)

ভাইয়া পানি!

[ত্রস্তপায় মুদাররেস আসে। উন্মাদ–প্রায়। হাতে কলসী। পানি ভরা]

আওয়াজ : (নেপথ্যে) ভাইয়া, পানি!

মুদার : আসছি ভাইয়া, আসছি! তোর পানির পিপাসা, আমি কি না এসে পারি? কিন্তু কোন্ দিকে?

(একবার এদিকে যেতে চায়, আওয়াজ আসে অন্যদিক থেকে। অন্যদিকে যেতে চায়, আওয়াজ আসে এদিক থেকে)

আল্লাহ্! তুমি আমাকে পথের নিশানা দাও। আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!

আওয়াজ : (নেপথ্যে) ভাইয়া, পানি!

মুদার : আসছি ভাইয়া, আসছি!

[যেতে চান। অন্য দিক দিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত আম্মা আসেন। তাঁর ধাক্কা লেগে মুদাররেসের হাতের কলস ভেঙ্গে যায়]

আহ্, ভেঙে দিলে?– কে? আম্মা? আপনি এখানে, এই পথে?

[আম্মা শুধু ক্যাল্ ক্যাল্ করে তাকান। মুদাররেসের উদ্‌ভ্রান্তি কেটে যায়]

আমিই এতক্ষণ ভুল করছিলাম। কলসে পানি নিয়ে পাগলের মত ছুটছিলাম। – কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না যে আম্মা! – ওদের শক্তি ছিল বেশি, আর আমরা ছিলাম বিশৃঙ্খল – কিন্তু এসময়ে এসব কি বলছি আমি? – আম্মা! আপনি যে খবরের জন্য এই পথে ছুটে এসেছেন, সে খবর দিতে আমার যে–

আম্মা : আমি জানি।

মুদার : তবু এই পথে–

আম্মা : তবু এই পথে পথে খুঁজে দেখছি। এই পথে পথে তার কত রাতের, কত দিনের পায়ের চিহ্ন মিশে রয়েছে! ঐ জায়গাটা কোথায়? যেখানে–

মুদার : যেখানে– যেখানে ফাঁসিতে ঝুলে আছে মুক্তি–সংগ্রামীরা?

www.pathagar.com

আম্মা : কি যেন জায়গাটার নাম?

মুদার : আন্টাঘর ময়দান।

[যন্ত্রণায় ছটফট করে সে। দাদু আসেন, পথ চলতে তীব্র কষ্ট হচ্ছে]

দাদু : বউমা, আমি যে সমান তালে হাঁটতে পারছি না। কে?

মুদার : আমি— মানে আপনাদের —

দাদু : ও! সেই মুদাররেস সাহেব? আপনিই তো আমাদের হাসানকে — কিন্তু কোথায় আমাদের হাসান? কোথায়?

[উদ্‌ভ্রান্ত মুদাররেস কোন উত্তর না দিয়ে চলে যান। অন্যদিকে যান আম্মা। দাদু একবার মুদাররেসের গমন পথের দিকে তাকিয়ে আম্মাকে অনুসরণ করেন। পথে নামে গাঢ়তর নীরবতা]

www.pathagar.com

পঞ্চম অঙ্ক

স্থান ঃ ভিক্টোরিয়া পার্ক

কাল ঃ ধরা যাক, ১৯৬৪ সাল

[রাতের অন্ধকার। অন্ধকারে কয়েকটি তরুণ মিনারে ফুল দিয়ে চলে যাচ্ছে। অন্যদিক দিয়ে একটি মহিলা আসে। তরুণদের দিকে তাকায়। ওরা চলে যায়]

মহিলা ঃ কে!

[বুড়ো এগিয়ে আসে]

বুড়ো ঃ কি বলছিস রে বউমা?

মহিলা ঃ কারা যেন ঐ দিকে গেল আব্বাজান?

বুড়ো ঃ কারা?

মহিলা ঃ ভাল করে দেখি নি। ঠিক রহিমের বয়সী কয়েকটি ছেলে। দেখতে ওর মতই। কিন্তু ভাল করে দেখতে পাওয়ার আগেই চলে গেল। (কান্নায় ভেঙে পড়ে) আব্বাজান! আমার মন বলছে, রহিম নিশ্চয়ই বেঁচে আছে।

[পাগলাটে লোকটি ফুল হাতে ঢোকে]

পাঃ লোক ঃ ঠিক বলেছ মা, রহিমরা কোন দিন মরে না। চিরদিন বেঁচে থাকে। আজও রহিম বেঁচে আছে।

মহিলা ঃ বেঁচে আছে?

পাঃলোক ঃ বেঁচে আছে।

বুড়ো ঃ আহ্! দাদু আমার অনেক পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাক।

পাঃ লোক ঃ এক শ' বছর আগের যে কাহিনী শোনালাম, সে কাহিনী অমর। সে কাহিনীর নায়কের মৃত্যু নেই।

মহিলা ঃ সে কাহিনীর নায়কের মৃত্যু নেই। সে কাহিনী অমর?

পাঃ লোক ঃ সে কাহিনী অমর। আর যুগে যুগে তা নতুন করে রচিত হয়। সেই তো দুঃখ মা। এই নাও মা, ফুল। হাসান আর তার বন্ধুরা এখানে প্রাণ দিয়েছিল। এক শ' বছর আগে। তাদেরই স্মৃতি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে এই শহীদ মিনার। হাসানের আত্মার বেদনা মনে এনে, হাসানের উদ্দেশ্যকে মনে রেখে, সেই বীরদের

www.pathagar.com

মাযারে ফুল দিয়ে যাও।

মহিলা : একটু আগে ওরাও যে ফুল দিয়ে গেল!

বুড়ো : কয়েকটি তরুণ বাবা! ঠিক নাকি রহিমের মতই দেখতে! বউমা বলছিল–

পাঃ লোক : ও হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আসে। ফুল দিয়ে যায়। সম্মান জানিয়ে যায়।

মহিলা : রহিম কি এদের মধ্যে রয়েছে বাবা?

পাঃ লোক : হয়তো বা। আজ থেকে না হয় আমরা লক্ষ্য রাখব, রহিম আসে কি না।

[মহিলা ও দাদু মিনারে ফুল দেয়]

মহিলা : আল্লাহ্! হাসানের আত্মা যেন শান্তি পায়! আমার রহিম – বাবা!

পাঃ লোক : এতেই হবে মা, এতেই হবে। এক শ' বছরের দুই প্রান্তে দুই মা, দুই ছেলে। তোমরা এক হয়ে কত ছেলে, কত ছেলের মনের কথা দিয়ে এক রোদনভরা কাহিনীকে আপন করে নিয়েছ – ঐ দেখ মা, আসমানে কত তারা ফুটেছে! সব তারার ফুল। কালো রাতে ওসব তারার ফুল ফোটে। আর ঐ দেখ ছায়াপথ। তারায় তারায় গড়া, তারার আলোয় ভরা এক পথ। ওদের হাতছানি এক সময়ের সাগর পেরিয়ে অন্য সময়ে পৌঁছয়।

বুড়ো : ও, আসমানে বুঝি ছায়াপথ দেখা যাচ্ছে মা?
আমার তো নজর কমে গেছে, দেখতে পাই না। অনেক তারা বুঝি মা?

মহিলা : অনেক তারা!

পাঃ লোক : অনেক তারা। আরও তারার সৃষ্টি হয়েছে। অমর কাহিনী আরও রচিত হয়েছে। সে-কাহিনীর স্মৃতিতে রচিত হয়েছে আরও একটি মিনার, উনিশ শ' বায়ান্ন'র ভাষা-শহীদদের স্মৃতিতে নির্মিত মিনার, শহীদ মিনার!

[ছায়াদৃশ্যে ভেসে ওঠে শহীদ মিনার। ভিক্টোরিয়া পার্কের স্মৃতিস্তম্ভ আর শহীদ মিনার যেন মিলে মিশে যায়। অনেক তরুণ-তরুণী, অনেক লোকের ভীড় ছায়ায় ছায়ায় ফুটে ওঠে। মহিলা ও পাগলাটে লোকটির মত বুড়োও চোখের ওপর হাত রেখে আসমানের তারা দেখতে চেষ্টা করে]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে পরিচিত ১৮৫৭-৫৯ সালের ঘটনাটি এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ড, যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। যেমন, তদানীন্তন ভারতবর্ষের উপর ইংরেজ আধিপত্যকে 'বাস্তবসম্মতভাবে আইনানুগ' বলে স্বীকার করে নিলে সেই আধিপত্যকে যাঁরা ধ্বংস করে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, তাঁদের 'বিদ্রোহী' বলেই চিহ্নিত করতে হয় অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ওই ঘটনাটি সত্যিই ছিল বিদ্রোহ। অবশ্য সে 'বিদ্রোহ' সফল হয়ে গেলে তাকে নিশ্চিতই 'বিপ্লব' বলে চিহ্নিত করা হত। 'বিপ্লব' বলা হত আরও একটি কারণে। সেটা হচ্ছেঃ পুরনো মুঘল রাজতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ওই মহা-অভ্যুত্থানের লক্ষ্য ছিল না। অশীতিপর বৃদ্ধ শেষ মুঘল বাদশা বাহাদুর শাহ্ যাফরকে অভ্যুত্থানকারীরা তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় সর্বময় কর্তৃত্বের এক প্রতীক হিসাবেই বেছে নিয়েছিলেন।

বাহাদুর শাহ্ যাফরের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, অভ্যুত্থান সফল হলে হিন্দুস্তানে মুঘল রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হত না, প্রতিষ্ঠিত হত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত সংঘবদ্ধ রাজন্যবর্গের শাসন। যাঁরা ওই মহা-অভ্যুত্থানকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক অর্থহীন বিদ্রোহ বলে উড়িয়ে দিতে চান, তাঁরা হয়তো সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি থেকেই অথবা ভুলক্রমেই তা করেন।

'কালো রাত তারার ফুল'-এ লেখক ওই সময়কার কতকগুলো ঐতিহাসিক কাহিনীকে উপস্থাপিত করেছেন। সবগুলো কাহিনীর মিলিত অবদান হিসাবে পাঠকবৃন্দ একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে ওই সিপাহী যুদ্ধকে দেখতে পাবেন। এটারও প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। তাই এ-পুস্তকের প্রকাশনা। আঠার শ' সাতান্নর সেই মহা-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে আছে আরও অনেক চরিত্র। লেখকের মতে, সে-সব চরিত্র অত্যন্ত উজ্জ্বল ভাবে আগেই বাংলা সাহিত্যে উপস্থাপিত। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়াতোপী প্রমুখ এর দৃষ্টান্ত। এতদিন যাঁদের কথা তেমন বলা হয় নি, তাঁদের কথাই লেখক বলেছেন। আমরা আশা করব, 'কালো রাত তারার ফুল' আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে মূল্যহীন মনে হবে না।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ্‌র দরবারে হাজারো শুকরিয়া জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

অবতরণিকা

আঠার শ' সাতান্ন সালে তদানীন্তন ভারতবর্ষের মহা গণ-অভ্যুত্থানকে কেউ কেউ বলেন 'সিপাহী বিদ্রোহ', কেউ কেউ বলেন 'সিপাহী যুদ্ধ' বা 'মহাবিদ্রোহ', আবার কেউ কেউ বলেন 'সিপাহী বিপ্লব'। নামে বড় বেশি কিছু এসে যায় না। প্রকৃত অর্থে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল এই ঘটনাটি, যা সীমাবদ্ধ ছিল না শুধু সিপাহীদের মধ্যেই। তা ছিল তখনকার ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম এক জাতীয় অভ্যুত্থান; এবং এর পেছনে কার্যকর ছিল অনেকগুলো ঐতিহাসিক কারণ। ১৮৫৭ সালের এই মহা জাতীয় অভ্যুত্থান কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না, ছিল না কেবলমাত্র সিপাহীদেরই একটা সামরিক বিদ্রোহ মাত্র। অভ্যুত্থান সংঘটনের সময়ে 'হিন্দু প্রেট্রিয়ট' পত্রিকায় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন ঃ

> "এই বিদ্রোহ এখন আর সিপাহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইহা এখন ব্যাপক এক বিদ্রোহ। সিপাহীরা তাদের জীবনের সকল স্বার্থ উৎসর্গ করিয়াছে, এবং দেশবাসীরাও তাহাদিগকে মহান জাতীয় আদর্শরূপে মহান ব্রতে উৎসর্গীতপ্রাণ শহীদরূপে গণ্য করিয়াছে। বেসামরিক জনসাধারণ এই বিদ্রোহে সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছে।"
>
> (হিন্দু প্রেট্রিয়ট, ২১ শে মে, ১৮৫৭ সাল)

ইংরেজ লেখকেরাও সিপাহী-যুদ্ধ সংক্রান্ত তাঁদের রচনাসমূহে যেসব তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই বিদ্রোহ ছিল ভারতবর্ষের জন্য এক জাতীয় ঘটনা, ভারতবর্ষ থেকে বিদেশী ইংরেজ বিতাড়নের জন্য এক গণ-অভ্যুত্থান।

সে সময়ে বৃটিশ পার্লামেন্ট বিদ্রোহের প্রাথমিক ও আশু কারণগুলো নির্ণয় করবার জন্য জেনারেল স্যার রবার্ট গার্ডিনারকে নিযুক্ত করেন। ১৮৫৮ সালে স্যার রবার্ট গার্ডিনার তাঁর রিপোর্টে লিখেছেনঃ

> "ভারতের এই বিদ্রোহের দু'টি চরিত্র দেখা যায় ঃ প্রথমটির রূপ হল একটি জনসাধারণের বিদ্রোহ, আর দ্বিতীয়টির রূপ হল সিপাহীদের একটা সামরিক বিদ্রোহ। ...এই দুটি বিদ্রোহ মিশে গিয়ে একটা সামাজিক বিদ্রোহে পরিণত হল। সামরিক কারণের জন্যই এই বিদ্রোহ ঘটে নি; ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য

www.pathagar.com

শক্তিশালী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিদের প্ররোচনার ফলেই এই বিদ্রোহ ঘটেছিল।"

(জেনারেল স্যার রবার্ট গার্ডিনার ঃ মিলিটারি এনালিসিস অব দ্য রিমোট এন্ড প্রক্সিমেট কযেস্ অব দ্য ইন্ডিয়ান রেবেলিয়ন, পৃঃ ১৬)

তবুও এই মহা-ঘটনাকে কেউ কেউ ভারতে জাতীয় অভ্যুত্থানের মর্যাদা দিতে নারাজ। ভারতীয় স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, "কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্ব। কি কি কারণে এই মতটি আমি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাহা অন্যত্র বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। [History of the Freedom Movement in India-Vol.1 এবং History and Culture of the Indian People-Vol. XI.] একজন বিশিষ্ট ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, বাংলা দেশের স্বদেশী আন্দোলনই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্ব। আমিও এই মতই অবলম্বন করিয়াছি।" (বাংলা দেশের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড), ১৯৭৪, ভূমিকা-পৃঃ পাঁচ-ছয়)।

এ-প্রসঙ্গে বর্তমান ভারতের স্বনামখ্যাত প্রগতিপন্থী রাজনৈতিক নেতা অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, "ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা কেউ-কেটা, তাঁরা গম্ভীরভাবে এমনভাবে কথা বলে যাচ্ছেন যাতে ধারণা হয় যে, ১৮৫৭ সালের ঘটনাগুলো শুধুই একটা 'সিপাহী বিদ্রোহ', জাতীয় জীবনে তার বিশেষ ছাপ পড়ে নি, স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তার কোনই যোগাযোগ ছিল না ইত্যাদি ইত্যাদি। সবচেয়ে মারাত্মক কথা এই যে, যাঁদের আমরা ঘোর প্রগতিবাদী বলে জানি, তাঁদেরই কেউ কেউ 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিদ্রোহের' নিন্দাবাদ আরম্ভ করেছেন।...

"ইংরেজ রাজত্ব যাঁদের মনমত হয়েছিল, যাঁরা বলতে দ্বিধা করেন নি যে, বিধাতার মঙ্গলময় বিধানেই ইংরেজ এ-দেশের রাজা হয়েছে, ইংরেজ দয়া করে আমাদের টেনে না তুললে আমরা চিরকাল অন্ধকারাতেই বাস করতাম বলে যাঁদের বিশ্বাস, তাঁদের যত গুণই থাকুক, স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা বলে তাঁদের কথা ভাবা যায় না। 'সামন্ত প্রতিক্রিয়া' বলে 'সিপাহী বিদ্রোহ'কে যতই উড়িয়ে দেওয়া হোক না কেন, দেশের মানুষের মনে ১৮৫৭ যে দাগ কেটেছিল তাকে স্বাধীনতার অভিযানের সঙ্গে একান্তভাবে সংযুক্ত না করার মতো ঐতিহাসিক অন্যায় আর নাই।"

(প্রমোদ সেনগুপ্ত রচিত 'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭'-র ভূমিকা, পৃঃ ট)

www.pathagar.com

"কার্ল মার্ক্সও বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখান যে, "সিপাহীরা হাতিয়ারের বেশি কিছু নয়। অভ্যুত্থানের পেছনে প্রধান চালিকা শক্তি ছিল ভারতীয় জনগণ, অসহনীয় ঔপনিবেশিক পীড়নের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রামে নামে।... মার্কস ও এঙ্গেলস বিশেষ জোর দেন এই ঘটনায় যে, বিদ্রোহ শুধু বিভিন্ন ধর্মের (হিন্দু-মুসলিম) এবং বিভিন্ন জাতের (ব্রাহ্মণ, রাজপুত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিখ) লোককে নয়, বিভিন্ন সামাজিক পঙক্তির লোককেও একত্র করেছিল।"

(প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা-যুদ্ধ ১৮৫৭-১৮৫৯, পৃঃ ১০)

এ-দাবী কেউ করেন না বা করা উচিতও নয় যে, শতবর্ষ আগে সংঘটিত সেই মহা-অভ্যুত্থানে আজকের সংজ্ঞায়িত জাতিত্বের সুপরিণত রূপ দেখা সম্ভব। কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষের একটা বিশাল এলাকা জুড়ে আর সারা দেশের মন মাতিয়ে ঘটে গেল এক উদ্দীপ্ত অভ্যুত্থান, সবার কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠল ভারতবর্ষের বুক থেকে বিদেশী ইংরেজ শাসন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, আর তারই প্রেক্ষাপটে নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুরতা মরিয়া হয়ে দেখা দিল এক হিংস্র নারকীয় রূপে- অভূতপূর্ব এমনি ঘটনার কদর্থ করার পেছনে যে মন ও মানসিকতা তা কি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়?

নিশ্চিতভাবেই সেদিনকার এই উপমহাদেশ এক জাতিত্বের ধারণায়ই উদ্বুদ্ধ ছিল। কার্ল মার্ক্সের কথায়, "এই প্রথম সিপাহী বাহিনী হত্যা করল তাদের ইউরোপীয় অফিসারদের; মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের পারস্পরিক বিদ্বেষ পরিহার করে মিলিত হয়েছে সাধারণ মনিবদের বিরুদ্ধে; হিন্দুদের মধ্য থেকে হাঙ্গামা শুরু হয়ে আসলে তা শেষ হয়েছে দিল্লীর সিংহাসনে এক মুসলমান সম্রাটকে বসিয়ে,...।"

(কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস ঃ প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা-যুদ্ধ ১৮৫৭-১৮৫৯, পৃঃ ৪১)

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে, সেদিনের এক-জাতিত্বের ধারণায় উদ্বুদ্ধ যে মহা অভ্যুত্থান, আজকের 'এক জাতিত্বের' বিশ্বাসী কেওকেটা পণ্ডিতদের ওই মহা অভ্যুত্থানকে হেয় প্রতিপন্ন করার এ প্রয়াস কেন? আমাদের বিশ্বাসঃ কারণটা সাম্প্রদায়িক।

এই উপ-মহাদেশ জয় করার পর ইংরেজদের অবশ্য করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে কার্ল মার্ক্স বলেন, "ভারতবর্ষে দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করতে হবে ইংলন্ডকেঃ একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবনমূলক— পুরাতন এশীয় সমাজের ধ্বংস

www.pathagar.com

এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা।–

এই উজ্জীবনের প্রথম শর্ত হল ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য– মোগল-ই-আজম আমলের চেয়েও তা বেশি সংহত ও দূর প্রসারিত। বৃটিশ তরবারি দ্বারা আরোপিত সেই ঐক্য এখন বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ দ্বারা দৃঢ়ীভূত ও স্থায়ী হবে। ...কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছা সহকারে ও স্বল্প পরিমাণে শিক্ষিত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠছে যারা সরকার পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত।" (পূর্বোক্ত , পৃঃ ৩৩–৩৪)। ইংলন্ডের এই দ্বিবিধ কর্তব্য সাধনের প্রক্রিয়ায় দেশে এল 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ও 'নব জাগরণ' যাকে বলা যায় 'কলোনিয়াল রেনেসাঁ'। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রসঙ্গে হান্টার সাহেবের বক্তব্য ঃ "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যেসব নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা কৃষকদের সঙ্গে কায়–কারবার করত, সেসব কর্মচারীকে জমিদার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া।...এই বন্দোবস্তের ফলে যেসব হিন্দু নগণ্য পদে নিয়োজিত ছিল, তারা জমিতে লাভ করল মালিকানা স্বত্ব, এবং পূর্বে যে–ধন মুসলমানদের ঘরে যেত সেসব হিন্দুরা আত্মসাৎ করতে লাগল।" (ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স্, ১৯৪৫, পৃঃ ১৫৪ ও ১১৫)। এবং উনিশ শতকী ওই 'নব–জাগরণ'ও মুসলমান সমাজের জন্য বয়ে আনে নি কোন নতুন দিন। তারপর, কালের আবর্তে সংঘটিত হল যখন এক জাতিত্বের লক্ষ্যাভিসারী মহা গণ–অভ্যুত্থান, তখন নব জাগরণের ওই নতুন শ্রেণীটি কায়মনোবাক্যে ব্যর্থতা কামনা করেছে সেই অভ্যুত্থানের ব্যর্থ হল সেই অভ্যুত্থান। নীরব হয়ে গেল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই 'প্রথম অপক্ক অভিব্যক্তি।' 'নব–জাগরণের' সূর্য বিলাল আরও প্রখর আলো। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "বাস্তবিকই চট্টগ্রাম থেকে ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত ১৮৫৭ সালে ইংরেজের যে বিপদ দেখা দিয়েছিল, তা কাটল প্রধানতঃ বর্ধমানের মহারাজা প্রভৃতি বিভীষণের সহায়তায়। লাট কর্ণওয়ালিস বৃথাই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' করে যান নি।...ফিউডল্ বলে 'সিপাহী বিদ্রোহ'ই অশুদ্ধ হয়ে গেল, আর জমিদারদের আঁচল–ধরা বাক্যবাগীশেরা 'বুর্জোয়া জাতীয়তার' নেতা বনে গেলেন, এই অদ্ভুত যুক্তিই আজ যেন চল্ হয়ে এসেছে।"

(প্রমোদ সেনগুপ্ত রচিত মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭'–র ভূমিকা, পৃঃ ঢ)

খতম হয়ে গেল সেদিনের সেই এক–জাতিত্বের ধারণা। চল্ হয়ে এল ক্রমে বুর্জোয়া জাতীয়তার প্রভাব–বলয়ে অবস্থিত সাম্প্রদায়িক আধিপত্যপুষ্ট 'নব–জাগ্রত' নতুন শ্রেণীর সংজ্ঞায়িত 'এক–জাতিত্বের' ধারণা, এবং পরবর্তীকালে

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালে সেই ইংরেজেরই শল্য-চিকিৎসায় যে ধারণার বুক চিরে স্বাভাবিকভাবেই জন্ম নিল 'দ্বি-জাতিত্বের' বাস্তবতা।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। প্রখ্যাত ভারতীয় চিন্তাবিদ প্রমোদ সেনগুপ্তের মতে, "একশত বৎসর ধরে ইংরেজের অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণের প্রতিক্রিয়ার ফলেই এই মহাবিদ্রোহ ঘটে।...ইংরেজের পূর্বে যত বিদেশী ভারতে এসেছিল, তারা ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে মিশে যেত এবং ক্রমে ক্রমে নিজেরাও ভারতীয় হয়ে যেত, যার ফলে ভারতের জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ কোনো বিপর্যয় ঘটত না। কিন্তু ইংরেজরাই প্রথম সারা ভারতের পুরাতন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিল।...একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, আকবরের সময় থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত ভারতবর্ষ শিল্পক্ষেত্রে ইউরোপের চাইতে কোনো অংশে পশ্চাৎপদ তো ছিলই না,... বরং অনেক ক্ষেত্রে অগ্রসরই ছিল।... ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭- এই দীর্ঘ এক শ' বছর-জোড়া ইংরেজ-ভারতের ইতিহাস একটা ধ্বংস ও লুটপাটের ইতিহাস; সুস্থ সবল একটা কিছু গড়ে তোলার ইতিহাস নয়। এই ঘটনাটিই হল ইংরেজ শাসিত ভারতের ট্র্যাজিডি।" (প্রমোদ সেনগুপ্ত রচিত 'মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭', পৃঃ ২-৪)।

গোলামী নবাবী শাসনের শেষ বৎসরে ১৭৬৪-৬৫ সালে বাংলার রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৯০ লক্ষ টাকার কিছু কম। পরের বৎসর অর্থাৎ ইংরেজের প্রত্যক্ষ শাসনের প্রথম বৎসরে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ১৪৭ লক্ষ টাকা। ১৭৭০-৭১ সালে (বাংলা ১১৭৬ সন) ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বৎসরেও এক পয়সাও খাজনা মওকুব করা হয় নি। বরং পরের বৎসর আদায় করা হয় ২৩৫ লক্ষ টাকা। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে খাজনা ধার্য করা হয় ৩৪০ লক্ষ টাকা এবং তারই সঙ্গে পোষ্য জমিদারদের জন্য করা হয় আরও ১০/১২ কোটি টাকা প্রজাসাধারণের কাছ থেকে আদায় করার কায়েমী বন্দোবস্ত। শিল্পক্ষেত্রেও একই অবস্থা। ১৮১৫ সালে ভারত থেকে ইউরোপে ১৩০ লক্ষ টাকার কাপড় রপ্তানী হয়েছিল। এই রপ্তানী কমতে কমতে ১৮৩২ সালে এসে দাঁড়াল মাত্র ১০ লক্ষ টাকায় এবং পরের বৎসর একেবারে শূন্যের কোঠায়। উল্টোদিকে, ইংল্যান্ড থেকে ভারতে কাপড় আমদানি ১৮০০ সালে ছিল শূন্য পরিমাণ। তারপর থেকেই এই শূন্যের স্থানে সংখ্যা বসতে লাগল, এবং ১৮৩২ সালে আমদানির পরিমাণ দাঁড়াল ৪০ লক্ষ টাকায়।

১৮৪০ সালে স্যার চার্লস ট্রিভেলিয়ান এক পার্লামেন্টারি কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্যদান কালে বলেছিলেন ঃ "ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ১,৫০,০০০ থেকে

www.pathagar.com

৩০,০০০-এ কমে গিয়েছে। বর্ধিষ্ণু শহর মুর্শিদাবাদ, যা ভারতের মানচেষ্টার ছিল, তা আজ অত্যন্ত গরীব ও খর্ব হয়ে গিয়েছে, জঙ্গল ও ম্যালেরিয়া তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং তার দুর্দশার সীমা নেই।" ১৮৯০ সালে স্যার হেনরি কটন লিখেছিলেন ঃ "মাত্র এক শ' বছর আগেও ঢাকা শহরে ২ লক্ষ লোক বাস করত এবং তার বাৎসরিক ব্যবসায়ের পরিমাণ ছিল এক কোটি টাকার উপর। ১৭৮৭ সালে ঢাকা থেকে ৩০ লক্ষ টাকার মসলিন কাপড় বিদেশে রপ্তানি হয়েছিল। ১৮১৭ সালে তা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। এই অধঃপতন কেবলমাত্র ঢাকাতেই নয়, সব জেলাতেই হয়েছে।" অন্যান্য শিল্পপ্রধান শহরগুলোর অবস্থাও, ঐতিহাসিক মন্টোগুমারি মার্টিনের কথায়, "বর্ণনা করা বেদনাদায়ক।" আলোকজান্ডারের 'ইষ্ট ইন্ডিয়া এন্ড কলোনিয়াল ম্যাগাজিনে' (৯ম খণ্ড, ৫৪ নং, ১৮৩৬) লেখা হয়েছিল, "মসলিন তৈরির কুশলতা বৃটিশ শাসনের অসাধু ও অত্যাচারী বাণিজ্যনীতির ফলে লোপ পেয়ে গেছে।"

বাংলা দেশের দেওয়ানী লাভ করার পর রবার্ট ক্লাইভ কোম্পানীর ডিরেক্টরগণকে লিখলেন যে, বাংলার বার্ষিক রাজস্ব এখন হবে ২৫০ লক্ষ টাকা। সামরিক ও বেসামরিক বিভাগ দু'টির জন্য খরচ ৬০ লক্ষ টাকা, নবাবকে ভাতা দিতে হবে ৪২ লক্ষ টাকা এবং মোগল সম্রাটকে কর দিতে হবে ২৬ লক্ষ টাকা। এতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উদ্‌বৃত্ত থাকবে ১২২ লক্ষ টাকা।

অর্থাৎ রাজস্ব বাবদ যা আদায় হত, তার প্রায় অর্ধেকই চলে যেত ইংল্যান্ডে। এই পরিমাণটা ক্রমান্বয়েই বাড়তে থাকে এবং পরবর্তী ৬/৭ বছরে ইংল্যাণ্ডে চলে যাওয়া টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ কোটি টাকারও বেশি। তাছাড়াও ছিল কোম্পানীর ছোট বড় কর্মচারীদের ব্যক্তিগত লুন্ঠনের পরিমাণ। ক্লাইভ এদেশে নিঃস্ব হয়েই ঢুকেছিলেন। কিন্তু ফিরে গেলেন যখন, তখন তাঁর প্রাপ্তির পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা। তাছাড়া, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ভারতীয় সম্পত্তি থেকেও আয় করতেন বছরে আড়াই লক্ষ টাকারও বেশি। অন্যান্য বড় বড় রাজকর্মচারীরাও প্রায় এমনি ধরনের আয়-উপার্জন করতেন। এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ভারতের রাজস্ব থেকে ভোগ করতেন তাঁরা মোটা পরিমাণের পেন্সন। লর্ড কর্ণওয়ালিস বছরে পেন্সন পেতেন ৫০,০০০ টাকা, ওয়ারেন হেস্টিংস ৪০,০০০টাকা। ওয়েলেসলি থেকে ডালহাউসি পর্যন্ত গভর্নর-জেনারেলদের প্রত্যেককে যাবার সময় দিয়ে দেওয়া হত ৬ লক্ষ করে টাকা। ছোট কর্মচারীরাও শ্রেণীমত এইসব প্রাপ্তি রীতিমতই পেতেন। একজন সাধারণ ইংরেজ কেরাণীও ভারতে ১৫/২০ বছর চাকরী করে অনায়াসে তিন লক্ষাধিক টাকার মালিক হয়ে

www.pathagar.com

দেশে ফিরতে পারতেন।

হার্বার্ট স্পেনসার ১৮৫১ সালে তাঁর 'সোশ্যাল স্টাটিস্‌টিক্‌স্‌' নামক পুস্তকে লিখেছিলেন, "একটা নির্মম বিশ্বাসঘাতকতাই হল ভারতে ইংরেজ শাসকদের স্থায়ী নীতি... বর্তমানেও আমাদের চোখের সামনেই কত না অত্যাচার, কত না শোষণ চলছে। আমাদের চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি যে অতি ক্ষতিকর একচেটিয়া লবনের ব্যবসায় মারফত, আর নির্দয়ভাবে করের উপর করের বোঝা চাপিয়ে গরীব কৃষকদের কাছ থেকে তাদের অর্ধেক ফসল আমরা শুষে নিচ্ছি। আমাদের চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি, কি শয়তানী উপায়ে ভারতীয় রাজ্য জয় করবার জন্য এবং তাদের দাবিয়ে রাখার জন্য ভারতীয় সৈন্যদের ব্যবহার করছি। আবার এই সৈন্যদেরই, যখন তারা কিছু দিন পূর্বে উপযুক্ত পোশাকের অভাবে মার্চ করতে অস্বীকার করেছিল, তখন তাদের একটা গোটা রেজিমেন্টকেই হত্যা করা হয়েছিল। আমাদের চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি যে, পুলিশেরা ধনীলোকদের সঙ্গে জোট বেঁধে প্রতিষ্ঠিত আইন-আদালতকে নিজেদের লুণ্ঠন ও অত্যাচারের কাজে লাগাচ্ছে। আমাদের চোখের সামনে আরও দেখতে পাই যে, তথাকথিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা হাতী চড়ে কৃষকদের ফসল-ক্ষেত্রের উপর দিয়ে যদৃচ্ছা ঘুরে বেড়ান এবং কোন রকম মূল্য না দিয়েই কৃষকদের কাছ থেকে নিজেদের জন্য রসদ সংগ্রহ করেন।"

সুতরাং এতে আর সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, কার্ল মার্ক্স বর্ণিত সেই দ্বিবিধ কর্তব্য যথাযথভাবেই ইংরেজ শাসকেরা সাধন করেছিলেন। কাজেই, সেদিন, ১৮৫৭ সালে তদানীন্তন ভারতবর্ষের বুকে সংঘটিত হল এক মহা বিস্ফোরণ, আপামর ভারতবাসীর এক মহা-অভ্যুত্থান। পুঞ্জীভূত আক্রোশের বারুদ স্তূপের উপর অবস্থান করছিল ইংরেজ শাসন। সিপাহীদের বেলায় টোটা-কার্তুজের ঘটনা ছিল বারুদ স্তূপের উপর একটা স্ফুলিঙ্গ মাত্র। "অসন্তোষ ও চাঞ্চল্য সাধারণ মানুষের মধ্যে সর্বত্র এতই বিস্তার লাভ করেছিল যে, অনেক ক্ষেত্রে সিপাহীরা বিদ্রোহে যোগ দেবার অনেক পূর্বেই সাধারণ অধিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এমন কি গ্রামগুলিতে পর্যন্ত এই অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিদ্রোহের জন্য মানুষের মনকে প্রস্তুত করে রেখেছিল।"

(অক্সফোর্ড হিষ্ট্রি অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৭২২-২৩)

ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড টমসনের কথায় উক্ত অভ্যুত্থানে "এতগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সম্মিলিত সমাবেশ হয়েছিল যে পূর্বে আর কোন বহিরাগত বিজেতার বিরুদ্ধে এতগুলি শক্তির সমাবেশ ঘটে নি।"

www.pathagar.com

(এডওয়ার্ড টমসন রচিত 'এ হিষ্ট্রি অব ইন্ডিয়া', পৃঃ ৭০)

জাতীয় মহা-অভ্যুত্থানের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। অভ্যুত্থানও সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু তা সফল হতে পারল না। অসাফল্যের পেছনে কার্যকর অনেকগুলো কারণের মধ্যে প্রধানতম কারণ যেটা, তা হল নিপুণ নেতৃত্বের অভাব, যার ফলে সুসংগঠিত হতে পারছিল না অভ্যুত্থানকারীরা।

এই জাতীয় মহা-অভ্যুত্থানের সূচনা হয় তখনকার অবিভক্ত বাংলা দেশেই। এবং এই বাংলা দেশের অভ্যুত্থান সুসংগঠিত ও সুপরিচালিত হতে পারলে নিশ্চিত হতে পারত বিদেশী বণিকের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের সমাপ্তি। যাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এই মহা-অভ্যুত্থান হতে পারত সুসংগঠিত ও সুপরিচালিত, বিশেষ করে বাংলা দেশে তাঁরা ছিলেন ভীত-সন্ত্রস্ত, নিষ্ক্রিয়-নীরব। বরং উল্টোদিকে তাঁরা সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের ইংরেজ প্রভুকে।

১৮৫৭ সালের প্রায় সূচনাতেই জানাজানি হয়ে গেল সিপাহীদের তৎপরতা। বহরমপুর ও ব্যারাকপুরে ফেব্রুয়ারি-মার্চে ঘটে গেল সিপাহীদের এলোপাথারি বিদ্রোহ-অভিব্যক্তি। ২৬শে ফেব্রুয়ারি বহরমপুরের সিপাহীদলকে নিরস্ত্র করা হল। বহরমপুরের মাত্র দু'মাইল উত্তরে মুর্শিদাবাদ- সুবে বাংলার পুরাতন রাজধানী। বাংলার নবাবের (অবিশ্যি মীর জাফর আলী খানের) বংশধর নবাব মনসুর আলী খান বাংলার নবাব-নাজিম হয়ে বাস করছেন সেখানে। 'নবাবের' কাছে হাজির হয়েছেন বিদ্রোহী সিপাহী ও জনসাধারণ। বাংলার হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার ও বিদেশী শাসকদের হাত থেকে নিজেকে এবং নিজ বংশের মানকে রাহুমুক্ত করার সুবর্ণ সুযোগ পেলেন মুর্শিদাবাদের 'নবাব'। কিন্তু একটি কথাও বের হল না তাঁর মুখ থেকে। "সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনে বসেও তিনি মীর জাফরের অমানুষোচিত পথই বেছে নিলেন। তাঁর কাছ থেকে কোনো প্রকার নির্দেশ না পেয়ে মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ ২৬শে ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে শান্ত ভাবেই কাটাল। তাঁর মুখ থেকে একটি কথা, কিম্বা সামান্য একটুখানি ইঙ্গিতেই সর্বভারতীয় প্রথম সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম সেই স্থান থেকেই শুরু হতে পারত যেখানে একশত বৎসর পূর্বে ভারতের প্রথম বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মে মাসে দিল্লীতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল বাংলাতেও তাই হতে পারত।" (প্রমোদ সেনগুপ্ত, মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭, পৃঃ ৩৫) কিন্তু হল না। "এই কথাটা বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে, যদি বহরমপুরের সিপাহীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করত এবং মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ নবাবকে সামনে রেখে তাদের সঙ্গে হাত মেলাত, তাহলে সমগ্র বাংলা দেশে দেখতে দেখতে জ্বলে উঠত আগুন।" (স্যার জন

www.pathagar.com

উইলিয়াম কে', হিষ্ট্রি অব সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯৮–৯৯) অথচ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 'নবাবের' অসন্তুষ্টির কারণ ছিল যথেষ্ট। দেশের অবমাননা ছাড়াও 'নবাবের' ব্যক্তিগত ও বংশগত কারণও তার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর সময়েই 'নবাবের' ভাতা ১৬ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ১২ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়। 'নবাবের' ভোগ করা অনেকগুলো অধিকার খর্ব করে দেওয়া হয়। তাঁর সম্মানার্থে ১৯টি তোপধ্বনিকে ১৩টি তোপধ্বনিতে কমিয়ে আনা হয়। এতটুকু অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও নীরব রইলেন তিনি। শুধুই কি নীরব? "বিদ্রোহের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি যথাসাধ্য রাজভক্তির সহিত নিজেকে পরিচালিত করেছিলেন। তিনি সর্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করেছিলেন। তা ছাড়া আমাদের কি আবশ্যক না অনাবশ্যক, আমরা বলবার আগেই তিনি তা নিজে থেকে অনুমান করবার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতেন।"

(বেঙ্গল গেজেটিয়ার, মুর্শিদাবাদ, পৃঃ ৯৬)

এই তো গেল বাংলার পুরনো নেতৃত্বের কিছু আভাস। নতুন নেতৃত্ব ছিল যাঁদের হাতে, তাঁদের কি ভূমিকা ছিল? এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বাংলার নবসৃষ্ট জমিদারগণ। কোম্পানী আমলের আগেও জমিদারদের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তাঁরা ছিলেন রাজস্ব আদায়কারী। তখন খোদ্‌কাস্ত্ চাষীদের অধিকার ছিল জমির উপর। তারপর, কোম্পানী আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হল, আইনানুসারে তাঁরা হয়ে পড়লেন তাঁদের জমিদারির সকল জমির মালিক। খোদ্‌কাস্ত্ চাষীরাও জমির উপর থেকে হারাল তাদের বহুদিনকার অধিকার। ফলে, আগের জমিদার ও কোম্পানীসৃষ্ট জমিদারদের মধ্যে ঘটে গেল এক মৌলিক রূপান্তর। জমির উপর মালিকানার ক্ষেত্রে এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন, এর ফলে পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হলেন নবসৃষ্ট জমিদারগণ। এইসব জমিদারদের কথা বলতে গিয়ে গভর্নর-জেনারেল বেন্টিঙ্ক (১৮২৮–৩৫) বলেছিলেনঃ "যদি ভারতে গণবিক্ষোভ বা বিপ্লবের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কথা ভাবা যায়, আমি নিশ্চয়ই বলব যে এই প্রথায় অন্ততঃ একটি সুফল হয়েছে এই যে, এতে বহুসংখ্যাক শক্তিশালী ও ধনী জমিদার সৃষ্টি হয়েছে যারা ভারতে বৃটিশ শাসন বাঁচিয়ে রাখতে ব্যগ্র ও যারা জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে দমন করে রাখতে সক্ষম।"

(এইচ, বেরীঃ জমিদারি সেটেলমেন্ট অব বেঙ্গল, পৃঃ ২৭১)

তাহলে কথা দাঁড়ালঃ দেশের মালিক মোখতার হয়ে তখন অস্তিত্ববান আছে বিদেশী কোম্পানী সরকার। স্বভাবতই (এবং অভিজ্ঞতাক্রমে) সেই বিদেশী

www.pathagar.com

সরকার এ-দেশীয় জনসাধারণের বিদ্রোহ ভয়ে সন্ত্রস্ত এবং এমতাবস্থায় সর্বরকমে সাহায্য করে সেই সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য আছে শক্তিশালী ও ধনশালী নবসৃষ্ট জমিদারবৃন্দ। এবার বাংলার সেই জনসাধারণ ও জমিদারদের পরিচয়ে আসা যাক।

প্রমোদ সেনগুপ্ত বলেন, "বাঙ্গালী কৃষকরা কিন্তু তাদের সংগ্রামশীলতার পরিচয় ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় থেকেই দিয়ে আসছে। মহাবিদ্রোহের কয়েক বৎসর পূর্ব থেকে আবার তারা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ১৮৩১-৩২ সালে তিতুমীরের নেতৃত্বে ২৪-পরগণা, যশোহর, নদীয়ার কৃষকদের ব্যাপক বিদ্রোহ হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তিতুমীরের মৃত্যুর পর এ আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায় নি। বাংলার নীল চাষী ও অন্যান্য কৃষকদের এই আন্দোলন অনবরত চলতে থাকে ও অবশেষে তার পরিণতি ঘটে ১৮৫৮ সালে নীল বিদ্রোহে। ১৮৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহও বাংলার সীমান্তে কৃষক আন্দোলনের আর একটা পরিণতি।

ভারতের আরও কতকগুলি স্থানের ন্যায় বাংলাতেও বিদ্রোহাত্মক ওয়াহাবী ও ফরাজী আন্দোলন এই সময় জোরদার হয়ে ওঠে।"

(মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭, পৃঃ ৫৩-৫৪)

১৮৫৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় মহা-বিদ্রোহ প্রসঙ্গে লেখা হয়ঃ "—সরকার জমিদারদের কাছে আবেদন করলেন এবং জমিদাররা রাজভক্তির সঙ্গে আমাদের সাহায্য করতে লাগলেন।— তাঁদের ক্ষমতায় যা ছিল তার দ্বারা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে সরকারকে সাহায্য করেছিলেন।"

('মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭' থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৫৪-৫৫)

এক শ' বছরের ইংরেজ রাজত্বে বাংলায় গড়ে উঠেছিল কয়েকটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর লোক- বণিক, মহাজন, ব্যবসাদার, বেনিয়ান, দালাল, মুৎসসুদ্দি প্রভৃতি। এরা ছিলেন কম্প্রাডোর বুর্জোয়াসির অন্তর্ভুক্ত। যোগেশ চন্দ্র বাগলের মতে, "সেকালে যত বড় লোক উদ্ভূত হয়েছিল তার অধিকাংশই এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল। ইংরেজের আশ্রয়ে এক শ্রেণীর বাঙ্গালী আগেই বর্ধিত হয়ে উঠেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল তারাও অনেকটা ভোগ করতে পায়। এই শ্রেণীর বাঙ্গালী বড়লোকদের সঙ্গে কোম্পানির বড় বড় চাকরদের বেশ দহরম মহরম ছিল। সামাজিক মেলামেশা এদের দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল।— ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে যে শ্রেণীর বড়লোকের সৃষ্টি হল

www.pathagar.com

তারা ইংরেজকে পরিত্রাতা বলেই গণ্য করতে লাগল। কোনো দিন ইংরেজদের স্বার্থে ও তাদের স্বার্থে যে সংঘাত উপস্থিত হতে পারে এ তারা তখন ধারণাই করতে পারে নি।"

(যোগেশচন্দ্র বাগলঃ 'মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃঃ ১২)

বলা বাহুল্য, ১৮৫৭ সালের মহা অভ্যুত্থানে জমিদারদের সঙ্গে এই কম্প্রাডোর বুর্জোয়া শ্রেণীটিই সর্বরকমে এদেশীয় অভ্যুত্থানকারীদের বিপক্ষে বিদেশী ইংরেজ সরকারের সহায়তা করেছিল। প্রমোদ সেনগুপ্তের মতে, "নিজেদের ও শ্রেণীর স্বার্থবশেই ও বিপদের ভয়েই এক শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙ্গালী, অর্থাৎ ইংরেজদের পোষ্য জমিদার ও ধনীরা যে ইংরেজের দিকে গিয়েছিল তার প্রমাণের অভাব নেই, এবং এই শ্রেণীর লোকদের হাতেই ছিল তখনকার বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব।" (মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭, পৃঃ ৫৮)।

সেনগুপ্তেরই কথায়, "আর এক শ্রেণীর লোক, যাঁরা বিদ্রোহের অগ্রগামী নেতৃত্ব দিতে পারতেন তাঁরা হচ্ছেন বাংলার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা।...এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত লোকেরাও বিপ্লবের দিকে অগ্রসর না হওয়ার ফলে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন বাংলার কৃষক শ্রেণী একক ও অসহায় হয়ে পড়ল, এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও নেতৃত্বের অভাবে, সংগঠনের অভাবে, তারা বিদ্রোহের দিকে অগ্রসর হতে পারল না। শুধু বাংলা দেশেই নয়, ভারতের অন্যান্য স্থানেও, বিশেষ করে বম্বে ও মাদ্রাজে, ইংরেজী-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা সমশ্রেণীর বাঙ্গালীর মতো একই প্রকারের কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা ও ঘৃণ্য দাস-মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছিল। কৌশলের দোহাই দিয়ে, সিপাহীদের মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্নতার উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে এই শ্রেণীর কাপুরুষতা ও দাসসুলভ মনোভাবকে পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের অবদান যত বড়ই হোক না কেন। এই শ্রেণীর লোকদের এইরূপ ব্যবহার, কেবলমাত্র ১৮৫৭ সালেই নয়, পরবর্তীকালেও জাতীয় সংকট মুহূর্তে আরও অনেকবার দেখা গিয়েছে।" (পৃঃ ৫৯)

'মহাবিদ্রোহের পটভূমি' বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রী সেনগুপ্ত পরিশেষে বলেনঃ "এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ভারতীয় জনসাধারণের জাতীয় বিদ্রোহ ছিল, যদিও আংশিক ভাবে এটি সিপাহীদেরই বিদ্রোহ ছিল, এবং যদিও সিপাহীরাই এই বিদ্রোহে অধিকাংশ স্থলে তার পুরোভাগে ছিল।— সামরিক বিদ্রোহের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ; বিদ্যমান সরকারকে উচ্ছেদ করা তার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যখন সৈন্যরা বিদ্যমান সরকারকে ধ্বংস করবার জন্য ও তার স্থানে একটা নতুন সরকার স্থাপনের জন্য জনসাধারণের

www.pathagar.com

বিদ্রোহের সঙ্গে সামিল হয়ে যায়, তখন এই সৈন্য বিদ্রোহ জাতীয় বিদ্রোহের সঙ্গে মিশে যায়; ১৮৫৭ সালে ভারতেও ঠিক তাই ঘটেছিল।... ভারতের একটি বিস্তৃত অংশে, প্রায় সারা উত্তর ভারতে ও মধ্য ভারতে– রাজা, জমিদার, শহরবাসী, ব্যবসায়ী ও কৃষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই এই বিদ্রোহে স্বেচ্ছায় ও অধিক সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল।... তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহে জাতীয় বিদ্রোহের সর্বপ্রকারের রূপগুলিই বিদ্যমান ছিল।" (পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬–২৭)।

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের মানুষের জন্য ১৮৫৭ সালের ওই মহা–অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক কারণ–কার্য, তার ফলাফলের তাৎপর্য এবং পরবর্তীকালে এসবের সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনাবলীর গতিধারা জানার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। ১৮৫৭ সাল সম্পর্কে আমাদের এ–দৃষ্টিভঙ্গি সর্বগ্রাহ্য হবে, এমন আশা করি না। কিন্তু বিভিন্ন মতামতের টানাপ'ড়েনে এ–দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রয়োজন আছে বৈকি।

'কালো রাত তারার ফুল' সিপাহী-জনতার সেই বিপ্লব প্রচেষ্টার সময়কার কতগুলো ঐতিহাসিক কাহিনী গল্পাকারে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এসব কাহিনী সংগ্রহের জন্য যে সব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে (অন্যান্য গ্রন্থের উদ্ধৃতিসহ), তার একটা তালিকা 'গ্রন্থপঞ্জী'-তে সন্নিবেশিত করা হল। গল্পগুলিতে যে সব চরিত্র বিধৃত হয়েছে, সেসব চরিত্র পাঠক–পাঠিকাদের মনে দাগ কাটলে নিজেকে ধন্য মনে করব। তখনকার কালো রাতে অস্পষ্ট হলেও, এঁরা তারার ফুল। এসব ফুলের সঞ্চয় আমাদেরই প্রয়োজনে লাগবে।

বিনীত

আসকার ইবনে শাইখ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

সংকেত
মুহূর্তের ভুল
বিদ্রোহী বাংলাদেশ
একটি প্রাণ
এক বৃদ্ধ বিপ্লবী
এক প্রিয় গুপ্তচর
বীরের কৌশল
বেগম হাসরত মহল
নাম তার জানা নাই
উজনালার অন্ধকূপ
একজন বিদেশী
একটি জীবন-চরিত
এক ছিল শাহ্‌যাদী
দীপক সন্ধ্যার রূপ-কাহিনী
রক্তের ডাক

www.pathagar.com

সংকেত

সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে!

গ্রামের কোতোয়াল আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে খবরটি দিল।

সারাটা পথ সে দৌড়াইয়া আসিয়াছে। হাতে কিছু রুটি, খবরটির প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ সঙ্গে আনিয়াছে কোতোয়াল।

ক্যাপ্টেন টারনান মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সন্ধ্যার অবকাশে তিনি তাঁবুর বাহিরে বসিয়া সিগারেট টানিতেছিলেন। বলা চলে, সন্ধ্যাটা উপভোগ করিতেছিলেন। মনে-মগজে নানা কথা এলোমেলোভাবে আনাগোনা করিতেছিল। এই দেশের জীবন বড় আরাম আয়েসের জীবন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে যে সরকার, সেই সরকারের কর্মচারী হিসাবে এই দেশে আসিয়া বড় খুশি হইয়াছে সকল ইংরেজ। উমদা খানাপিনা, আরও আরও কত উমদা উমদা চিজ-প্রচুর। ফৌজের দেশীয় লোকেরা, নেটিভ্‌রা তো পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদিগকে 'নওয়াব সাহাবের' মত সম্মান করে। ইংরেজ বলিয়া বেতনের চাইতে অনেক বেশি উপার্জন করা যায় এই দেশে। বেশ মোটা টাকা নিয়মিতভাবে পাঠানো যায় ইংল্যান্ডে। রোদে পোড়া ঘর্মাক্তদেহ এই কালোর দেশের টাকার আলোয় ইংল্যান্ডের কুয়াশাও স্বচ্ছ হইয়া ওঠে। আর এই দেশটাও কী মনোরম! প্রকৃতির শ্যাম শোভা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। ক্যাপ্টেন টারনান সিগারেট টানিতে টানিতে সেই শোভা দেখিতেছিলেন। সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। চাহিলেন কোতোয়ালের দিকে।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। সকালে কে একজন কতকগুলি চাপাতি কোতোয়ালের হাতে দিয়া গেল। বলিয়া গেল, আশেপাশের প্রতি গ্রামের মাতব্বরদের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। কোতোয়াল অন্যান্য স্থানে এই চাপাতি বিতরণের খবর জানিত। কিন্তু জানিত না, কি রহস্য ইহার মধ্যে লুকাইয়া আছে। সে আরও জানিত, মাতব্বরেরা এই চাপাতি গ্রামের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছাইয়া দিবে। পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। অবশ্য মাতব্বরকে নিজে গিয়া প্রত্যেকের কাছে এই চাপাতি দিয়া আসিতে হইবে না। একজনের হাতে দিলেই তাহার কর্তব্য শেষ। একই চাপাতি একজনের হাত হইতে অন্যজনের হাতে চলিয়া যাইবে। কেউ তাহার নিজের কাছে রাখিয়া দিতে পারিবে না। নিজের কাছে রাখিবার নিয়ম নাই। তাই কোতোয়াল নিজেই তাহার কাছে দেওয়া চাপাতি মাতব্বরদের কাছে

www.pathagar.com

পৌঁছাইয়া দিয়াছে। সামান্য যাহা বাকী আছে তাহা নিয়াই সে দৌড়াইয়া আসিয়াছে কাপ্তান সাহেবের কাছে। চাপাতি বিতরণের এই রহস্যে হয়তো লুকাইয়া আছে কোন সর্বনাশের ইঙ্গিত। কিন্তু চাপাতিগুলি বিতরণ না করিয়া সে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে নাই। বাধ্য হইয়াই সে এই কাজ করিয়াছে। তাহার মন তাহাকে বাধ্য করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কাপ্তান সাহেবকে না জানাইয়াও তো সে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না! কোম্পানী সরকারের বিশ্বস্ত কর্মচারী সে! গ্রামের কোতোয়াল! উপরস্থ কর্মচারীকে ব্যাপারটা জানানো সে প্রয়োজন মনে করিয়াছে। তাই সে দৌড়াইয়া আসিয়াছে ক্যাপ্টেন টারনানের কাছে।

কিন্তু এই রুটি দিয়া আমি কি করিব? সহজভাবেই ক্যাপ্টেন টারনান প্রশ্ন করেন। ব্যাপারটা যে সর্বনাশের কিছু, ক্যাপ্টেন টারনানের কণ্ঠস্বর হইতে তাহা বোঝা গেল না।

ঃ না···মানে ব্যাপারটা হুজুরকে জানানো দরকার মনে করিয়াই জানাইয়া গেলাম। সহজভাবে উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়া আলগোছে কাটিয়া পড়িল গ্রামের কোতোয়াল। সন্ধ্যায় বিশ্রামের এই চমৎকার সময়টাতে সাহেব আরও ক্ষেপিয়া যাইতে পারেন।

তখন সময়টা ছিল আঠার শ' সাতান্ন সালের জানুয়ারি মাস। দেশের ভাগ্যাকাশে তখন ভাসিয়া বেড়াইতেছে একখণ্ড কালো মেঘ। বজ্রগর্ভ কালো মেঘ। দিনে দিনে সেই মেঘখণ্ড আকারে বাড়িয়া উঠিতেছে। দেশের বুক হইতে বিন্দু বিন্দু অসন্তোষ ও আক্রোশের বাষ্প পুঞ্জীভূত হইয়া সেই মেঘখণ্ডকে বাড়াইয়া তুলিতেছে। এখানে সেখানে আরও আরও মেঘখণ্ড দেখা দিতেছে।

বিদেশী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে এ দেশবাসীর পরিচয় এক শ' বছরের। এই এক শ' বছরেই দেশের প্রায় সকল শ্রেণীর লোকই কোম্পানীর প্রতি বিরূপ ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ নানাবিধ। তাই নানা শ্রেণীর লোক কোম্পানীর প্রতি অসন্তুষ্ট। রাজন্যবর্গ অসন্তুষ্ট, ভূস্বামীরা অসন্তুষ্ট, অসন্তুষ্ট দেশের জনসাধারণ। কাহারও রাজ্য গিয়াছে, কাহারও ভূমি গিয়াছে, কাহারও জাতি ও ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত লাগিয়াছে। অনেকেই হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছে, বিদেশী লুটেরা কোম্পানীকে এদেশ হইতে বিতাড়িত করা প্রয়োজন। দিনের কাজ রাতের ঘুম ত্যাগ করিয়া কেউ কেউ দেশবাসীকে এইসব কথা বুঝাইয়া চলিয়াছে। এক কথায়, দেশকে বিদেশীর কবল হইতে মুক্ত করার জন্য দেশবাসীকে সংগঠিত করার কাজে ব্রতী হইয়াছেন কেউ কেউ। স্বাধীনতার জন্য মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণা যোগাইতেছেন তাঁহারা। তাঁহারা দেশপ্রেমিক। কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস

www.pathagar.com

সুস্পষ্টভাবে এই দেশপ্রেমিকদের নাম ঘোষণা করে নাই। অনেক ঐতিহাসিকই এই দেশপ্রেমিকদের দেন নাই তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান।

কিন্তু সময়ের সাগর-বেলার একান্তে রহিয়াছে তাঁহাদের এই মহান প্রয়াসের স্বাক্ষর। সে-স্বাক্ষর বিলুপ্ত হইবার নয়। অন্যকালের কোন এক রাত জাগা পথিক হয়তো এমনি এক স্বাক্ষরের আকর্ষণে ছুটিয়া যাইবে সেই বেলা-ভূমে। খুঁজিতে খুঁজিতে সে পথ চলিবে। রাতের পর দিন, দিনের পর রাত। তারপর, এক সুবেহ্ সাদেকের আযানে সে উৎকর্ণ হইয়া উঠিবে। ভোরের আলো আসিয়া পৌঁছিবে সেখানে। ভোরের বাতাস তাহার কানে কানে বলিবেঃ এই তো পথিক, এইখানে।—আর একটু অগ্রসর হইয়া পথিক দেখিবে, তাহার হঠাৎ পাওয়া বহু কামনার স্বাক্ষর সূর্য কিরণে হাসিতেছে!

ঝড় আসিতেছে। কাল বৈশাখীর মত ঘন মেঘে সাজিয়া, ধ্বংসের ডাক ডাকিয়া, দিগ্বিদিক প্রকম্পিত করিয়া। আজ চৈতালী ঘূর্ণিতে তাহারই পূর্বাভাস। উৎকর্ণ, সন্ত্রস্ত, ভয়াকুল দেশ।

কোতোয়ালের কথাটি উড়াইয়া দিলেও ক্যাপ্টেন টারনান শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। সিগারেট টানিতে ভাল লাগিল না। ফেলিয়া দিলেন। চিন্তার রেখা তাঁহার ললাটে ফুটিয়া উঠিল। কতক্ষণ চিন্তার পর স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন টারনান। চাপাতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের পথে পা বাড়াইলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপরস্থ কর্মচারী মেজর এরস্কিনকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানাইলেন। ক্যাপ্টেন টারনানের সিদ্ধান্ত ঃ কোন একটি গোপন দল দেশের জনসাধারণকে উত্তেজিত করিবার জন্য এবং তাহাদের জাতি ও ধর্মনাশের ভয়কে বলবতী করিবার জন্য এই চাপাতির সংকেত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পাঠাইতেছে। এক আসন্ন বিপ্লবের আভাস দিয়া যাইতেছে সেই গোপন দল!

কিন্তু মেজর এরস্কিন এই সিদ্ধান্তকে সঠিক বলিয়া মনে করিলেন না। ক্যাপ্টেন টারনানকে জানাইলেন তিনি, মহামারীর সময় নেটিভ্‌রা কুসংস্কারের বশে এরকম করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, ইহাতে মড়ক এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে চলিয়া যায়।

চাপাতির রহস্য নিয়া কোম্পানী কর্তৃপক্ষের মধ্যে এবং খবরের কাগজে নানারকম আলোচনা চলিতে লাগিল। তবে গুরুত্ব সহকারে নয়। কেউ কেউ বলিল, লোকে চাপাতি পাঠাইয়া ইহাই সকলকে জানাইতে চেষ্টা করিতেছে যে এই চাপাতিতে অস্থিচূর্ণ আছে। ইংরেজরা এদেশবাসীর জাতি ও ধর্মনাশ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। অসঙ্গতিপূর্ণ এমনি আরও কথা আলোচিত হইল। কেউ

www.pathagar.com

কেউ আবার বলিল, চাপাতির মধ্যে লুকানো থাকে গোপন পত্র। চাপাতির মাধ্যমেই সেই পত্র গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়া যায়।

মেজর এরস্কিন জব্বলপুর হইতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্নরের সেক্রেটারি অর্নহিলকে লিখিলেন ঃ

> ২৭ শে ফেব্রুয়ারি মফঃস্বলের কাগজে দেখিলাম, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কোন কোন জেলাতে চৌকিদারের মারফত ছোট ছোট আটার চাপাতি বিলি করা হইয়াছে। আমি আপনাকে জানাইতেছি, আমার ডিভিশনে সাগর, ডুমোর, জব্বলপুর ও নরসিংহপুর জেলাতেও সেই সংকেত দেখা গিয়াছে। আমি প্রথমে নরসিংহপুরে এই চাপাতির কথা শুনিলাম। তদন্ত করিয়া জানিলাম, অন্যান্য জেলাতেও এই খবর ছড়াইয়াছে। অনেক খোঁজ করিয়াও ডেপুটি কমিশনাররা শুধু এই চাপাতির ব্যাপক প্রচারের কথাই জানিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, এইভাবে চাপাতি প্রচার করিলে শিলাবৃষ্টি বন্ধ হইবে, গ্রামে অসুখ হইবে না। আমি আরও শুনিলাম যে, রংরেজীরা কাপড়ে রং না ধরিলে এইভাবে তাহাদের ভাগ্যদেবীকে প্রসন্ন করে। সবাই বলিতেছে, সিন্ধিয়া ও ভূপালের রাজ্য হইতে এই খবর ছড়াইয়াছে।
>
> কোথাও এই সংকেত লুকাইবার কোন চেষ্টা নাই। এখনও খোঁজ চালাইতেছি। খবর পাইলেই আপনাকে জানাইব। কোন কুমৎলব আছে বলিয়া মনে হয় না। একখানা চাপাতি পাঠাইলাম।

কিন্তু সব সিদ্ধান্তই ছিল শুধু ধারণা। কাহার ধারণা যে সত্য, কেহই তাহা জোর দিয়া বলিতে পারিল না। রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিতে তেমন করিয়া যত্নবান হইল না কেউ। কিছুদিন পর অবশ্য বুঝা গিয়াছিল, চাপাতি বিতরণের উদ্দেশ্য একটা ছিল! আর সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে ক্যাপ্টেন টারনানের পত্র মারফত গোপন সংকেতের সিদ্ধান্তই ছিল সঠিক। মেজর এরস্কিনের ধারণা মিথ্যা।

কোম্পানীর বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সজাগ ও উত্তেজিত করার কাজে চাপাতির দানও কম ছিল না। দেখা গিয়াছে, যেসব জায়গা দিয়া এই চাপাতি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়াছে, সেসব জায়গায়ই বিপ্লবের আগুন প্রবল বেগে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আসন্ন ঝড়ের সংকেত দিয়া গিয়াছে এই চাপাতি। প্রস্তুত হইবার সংকেত। আসিতেছে মুক্তি-সংগ্রাম! সেই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইবার আহবান!

চাপাতির সংকেতে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।

www.pathagar.com

চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল নওয়াব ওয়াজেদ আলি শা'র অযোধ্যা, নওয়াব-বেগম হাসরত মহলের অযোধ্যা। এই সংকেত আসিয়াছিল বাংলা দেশেও। চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল জনসাধারণের বাংলা। আগুন জ্বলিয়াছিল সব জায়গাতেই। পেশোয়ার হইতে চট্টল- বিরাট বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে।

কিন্তু কোম্পানী-কর্তৃপক্ষ সেদিন সেই সংকেতের অর্থ সম্যক বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারে নাই- কোন্ গোপন দলটি এই সংকেত পাঠাইতেছে। কাহারা সেই দলটি গঠন করিয়াছেন। তাহাদের পক্ষে বুঝা সম্ভবও ছিল না। এক শ' বছর তাহারা দেশকে শোষণ করিয়াছে, ছলনা ও ষড়যন্ত্র করিয়া দেশকে শাসন করিয়াছে। কিন্তু দেশের অন্তরকে তাহারা চিনিতে পারে নাই। চিনিতে চেষ্টাও করে নাই। অন্তরের কথা না জানিলে, অন্তরকে না বুঝিলে, কি করিয়া জানিবে- অন্তরের কোন্ অতলে কি ক্ষোভের সাগরে ঢেউ উঠিতেছে! কি করিয়া বুঝিবে- নয়া সভ্যতার একটা ঝাপসা ধারণা দিয়াই একটা দেশকে অনুগত রাখা যায় না! আর এমন লোকও তো দেশে অনেক থাকেন, দেশের স্বাধীনতার বিনিময়ে যাঁহারা সুখ-ঐশ্বর্য লাভ করিতে চাহেন না! প্রয়োজনে ইহারাই গোপন দল গঠন করিতে পারেন।

* * * *

ঘন বন। বনের বুকে এক স্থানে কুটির। আল্লা'র রাহের এক ফকিরের কুটির। হযরত মেহরাব আলি শা'র কুটির। রাত তখন গভীর। চরাচরে ঘুম নামিয়াছে। সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন। কালো কাফনে ঢাকা যেন দূর-অদূরের গ্রাম, গ্রামের পর গ্রাম, সারাটা দেশ। ঘুমায় নাই শুধু কয়েকটি চোখ। দূর আকাশের তারার মতই অতন্দ্র সেই কয়েকটি চোখ। সেসব চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অন্ধকার সাগরে পাড়ি জমাইয়াছে। দুশ্চিন্তার ঝড়ে উত্তাল সাগর, কিন্তু লক্ষ্য স্থির। বিদেশী বেনিয়া কোম্পানীর অক্টোপাশের বাঁধন হইতে দেশকে মুক্ত করিতে হইবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন করিতে আসিয়া যাহারা এ দেশের রাজদণ্ড ধারণ করিয়া বসিয়াছে, তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিতে হইবে সাগর-পারে। দেশের স্বাধীনতাকে যে কোন মূল্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

কুটিরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন কয়েকজন যুবক। শাহ্ আহমদুল্লাহ্ সুফী, আজিমুল্লাহ্ খান, মুহাম্মদ আলি খান। দেখা করিতে আসিয়াছিলেন হযরত মেহরাব আলি শা'র সঙ্গে। আসিয়াছিলেন আসন্ন বিপ্লবের প্রাণ-শক্তির ধারক হযরত মেহরাব আলি শা'র নির্দেশ গ্রহণ করিতে। সংগঠন ও পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করিতে। আলোচনা শেষ হইয়াছে। এখন ফিরিয়া

www.pathagar.com

যাইবার সময়। কুটিরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন যুবকবৃন্দ। চারদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ঘন অন্ধকার। দৃষ্টিপাত করিলেন উপরের দিকে। আকাশে তারা ফুটিয়াছে, অনেক তারা!

যুবকবৃন্দ অগ্রসর হইলেন। অন্ধকারেও পথের দিশা তাঁহাদের সঠিক। মুজাদ্দেদ আল্‌ফে সানী, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী, সৈয়দ আহমদ বেরেল্‌বীর চিন্তার ধারক শাহ্ আহমদুল্লাহ্ সুফী। বিধুরের অধিপতি ধুন্দুপন্থ নানাসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি ইংরেজী শিক্ষিত যুবক আজিমুল্লাহ্ খান, আর নেপালের রাজা জং বাহাদুরের বিশ্বস্ত কর্মচারী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আলি খান। আজিমুল্লাহ্ খান ও মুহাম্মদ আলি খান উভয়েই ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশ। দুইজনের প্রথম পরিচয় বিলাতেই। তাঁহারা স্থির করেন– দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রয়োজন গণ-অভ্যুত্থানের, এক মহা বিপ্লবের।

যুবকবৃন্দ পথ চলিতেছেন। নীরবে। তিনজনেই নীরব। চিন্তায় রহিয়াছে একটি কথা– বিপ্লবের আহবান ছড়াইয়া দিতে হইবে সারা দেশে। আপামর জনসাধারণের জন্য চাপাতি হইবে অন্যতম সংকেত। আর সংগঠনের ঘনিষ্ঠ মহলে বিপ্লবী প্রতীক হইবে রক্তপদ্ম।

কতক্ষণ একত্রে চলিয়া বিভিন্ন পথে মোড় নিলেন যুবকবৃন্দ। পরিকল্পনা প্রস্তুত। এখন সেই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা। যোগ্যতার সঙ্গে, শৃঙ্খলার সঙ্গে।

দেশের জনসাধারণকে তাঁহাদের পাশে চাই। তাঁহারা যদি কামিয়াব হন, জনসাধারণের কল্যাণের রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে এদেশে। তাই জনসাধারণকে এই বিষয়ে সজাগ ও প্রস্তুত করা প্রয়োজন। আর বিদেশী বেনিয়া কোম্পানীকে এই দেশ হইতে উৎখাত করিতে হইলে প্রয়োজন একতার, ধর্মমত নির্বিশেষে সকল দেশবাসীর একতার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

আগামী কাল হইতেই আরম্ভ হইবে সংগঠন ও প্রচারের কাজ। আগামী কাল হইতেই আরম্ভ হইবে চাপাতির অভিযান। হযরত মেহরাব আলি শা'র সঙ্গে বিপ্লব পরিকল্পনার রূপকার এই যুবকবৃন্দ আজ রাতে এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। আর শপথবদ্ধ হইয়াছেন ঃ আসন্ন এই মুক্তি–সংগ্রামে তাঁহারা নিজেদের জান–মাল কোরবান করিবেন!

পরদিন হইতে কোম্পানী–রাজের ধারণার অন্তরালে দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল চাপাতির গোপন সংকেত।

www.pathagar.com

মুহূর্তের ভুল

একই দিনে, একই সময়ে দেশব্যাপী বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন আসন্ন বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ।

সমগ্র দেশ চেষ্টা করিবে সাগর-পারের জালেম শক্তিকে সাগরের পানিতে ভাসাইয়া দিতে। আর সকলের সমবেত চেষ্টায় তাঁহারা এই কাজে সফল হওয়ারই আশা রাখেন।

কেউ কেউ বলেন, মিরাটে ১০ই মে জাতীয় অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার কথা ছিল। কেবলমাত্র সিপাহীদেরই বিদ্রোহ নয়। মূলতঃ সমগ্র জনসাধারণই এই অভ্যুত্থানের পেছনে সক্রিয় ছিল। বহু যন্ত্রণায় এই উপমহাদেশের ধুকিয়া মরা জীবন একটা অগ্ন্যুদ্গারে ফাটিয়া পড়িবার জন্য তখন উদ্গ্রীব। ১০ই মে রবিবার। সূর্যাস্তকালে নিরস্ত্র অবস্থায় ইংরেজরা রবিবারের প্রার্থনার জন্য যখন জড় হইবে, ঠিক তখনই হইবে অগ্ন্যুদ্গারের শুরু।

সূর্যাস্তকালে গীর্জায় জড় হইতে লাগিল ইংরেজরা। ঠিক তখনই হঠাৎ বন্দুকের গুলীর আওয়াজে তাহারা চমকিয়া উঠিল। এই আওয়াজের মুহূর্ত হইতেই শুরু হইয়া গেল ১৮৫৭ সালের তদানীন্তন ভারতের জাতীয় মহা অভ্যুত্থান। মিরাটের ক্যান্টনমেন্টে তৃতীয় অশ্বারোহী বাহিনীই অগ্রণী হইয়া বাহির হইয়া আসিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র ধারণ করিয়া তাহাদের অনুসরণ করিল একাদশতম ও বিশতম বাহিনীর পদাতিক সিপাহীরাও। সমস্ত মিরাট শহরে জ্বলিয়া উঠিল বিদ্রোহের আগুন।

কিন্তু ভুল হইয়া গেল সামান্য। দিনক্ষণ সবই ঠিক ছিল। পরিস্থিতি বুঝিবার ভুলের জন্য এই অভ্যুত্থান ঘটিয়া গেল সন্ধিক্ষণের আধ ঘন্টা আগে। তখন গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইয়াছে। মিরাটে গরম পড়িয়াছে খুব। এবং এর জন্যই সেইদিন সেই রবিবার হইতেই ইংরেজদের মধ্যে একটি নিয়ম চালু হইল যে, উত্তাপ বাড়িয়া যাইবার জন্য গীর্জায় প্রার্থনার কাজ আধ ঘন্টা দেরীতে শুরু হইবে। কর্নেল ম্যাকেঞ্জী তাঁহার মিউটিনি মেময়ার্স-এ লিখিয়াছেন ঃ

> "সময়ের এই পরিবর্তন আমাদের একটা ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। তখনকার দিনে ইংরেজ সৈন্যরা প্রায় নিরস্ত্র অবস্থাতেই গীর্জার প্রার্থনায় যেত। অবশ্য বিদ্রোহীরা সময়ের এই পরিবর্তনের কথা জানত না। তারা অর্ধ ঘন্টা আগেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল। ষাটতম

www.pathagar.com

ইংরেজ বাহিনী সম্পূর্ণভাবে গীর্জায় সমবেত হওয়া পর্যন্ত যদি তারা অপেক্ষা করত, তাহলে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় গার্ডদের অভিভূত করে ফেলতে তাদের কতটুকুই বা বেগ পেতে হত? স্বয়ং গড আমাদের সহায় হলেন। বিদ্রোহী অশ্বারোহীদের অগ্রণী স্কাউটরা যখন ইংরেজ সৈন্যদের লাইনে এসে পৌছল, তখন তারা দেখতে পেল– ইংরেজ সৈন্যবাহিনী প্যারেডে লাইন করে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বিপদ জ্ঞাপন ঘন্টা (এলার্ম) বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আকস্মিক আক্রান্ত হওয়ার শঙ্কা আর রইল না।" (প্রমোদ সেনগুপ্তের 'মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭' হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ৬৭–৬৮)

বৃটিশ লাইন দখল করা সিপাহীদের পক্ষে আর সম্ভব হইল না। তাহারা ক্যান্টনমেন্ট পরিত্যাগ করিয়া জেলখানায় গিয়া সমস্ত কয়েদীদিগকে মুক্তি দিল। তাহাদের একটা অংশ ট্রেজারি আক্রমণ করিল। কিন্তু ট্রেজারির প্রহরী সিপাহীরা তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল না। বিদ্রোহী সিপাহীরা দেখিল– ট্রেজারি দখল করিতে হইলে নিজেদের ভাইদের রক্তক্ষয় করিতে হয়। কিন্তু তাহারা তা করিতে পারে না। সুতরাং ট্রেজারি দখল করা হইল না। ব্যর্থ মনোরথ সিপাহীরা অগ্রসর হইল দিল্লীর পথে।

আবার কেউ কেউ বলেন, ২৩ শে জুন বিপ্লবের এই আগুন জ্বলিয়া উঠিবে– বিপ্লবের নেতৃবর্গের ইহাই ছিল সিদ্ধান্ত। আবার কাহারও মতে ৩১ শে মে। ক্যাক্রফ্‌ট্ উইলসন বলেন ঃ

"আমি জোর করে বলতে পারি যে, সমগ্র বেঙ্গল আর্মিতে বিদ্রোহ শুরু করবার দিন স্থির করা হয়েছিল ৩১শে মে, ১৮৫৭, রবিবার এবং প্রত্যেক রেজিমেন্টে তিন জন সভ্য নিয়ে বিদ্রোহ চালনা করবার জন্য এক-একটা করে কমিটি হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ সিপাহীরা এই সব প্ল্যান সম্বন্ধে কিছুই জানত না।" (স্যার জন উইলিয়াম কে'ঃ এ হিষ্ট্রি অব দ্য সিপয় মিউটিনি ইন ইন্ডিয়া;, ২য় খণ্ড, পৃ.১১০)।

* * * *

১৭৫৭ সাল হইতে ১৮৫৭ সাল। এক শ' বছর। শতবর্ষ আগের একটি ২৩শে জুনের কথা মনে পড়ে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা, পলাশীর যুদ্ধ, ১৭৫৭ সাল। বিপ্লবীদের ভাবনা– আল্লাহ্ যদি তৌফিক দেন, এক শ' বছরের পর বেনিয়া কোম্পানীর জন্যও তেমনি এক ২৩শে জুনের সৃষ্টি হইবে। তাঁহাদের ভাবনায় ছিল আরও কত কথা।

www.pathagar.com

কলিকাতা আর দিল্লী। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নতুন রাজধানী কলিকাতা, আর মুঘলের চিরপ্রসিদ্ধ পুরাতন রাজধানী দিল্লী! সূর্য-কিরণে ঝলসিত হইয়া-ওঠা কলিকাতার গভর্নর-জেনারেলের নূতন প্রাসাদ, আর অস্ত সূর্যের ম্লানিমায় রাঙা-মলিন হইয়া-ওঠা মুঘলের প্রাচীন মহলগুলি! তবুও, দিল্লীর কাছে কলিকাতার উঁচু মাথা হেঁট হইয়া যায়। দিল্লীর ইংরেজ রেসিডেন্ট পাদুকা পায়ে দিল্লীশ্বরের দরবারে গর্বিত পদবিক্ষেপে উপস্থিত হন না। কোম্পানীর কোন প্রতিনিধিই সম্রাটের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে কথা বলেন না। নিঃশব্দে, নগ্নপদে, দূর হইতে অভিবাদন করিতে করিতে তাঁহাকে সম্রাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। পুরাতন এই রীতি তখন পর্যন্তও চলিয়া আসিতেছে। এই সব রীতির জ্বালা কোম্পানী-সরকারের প্রতিনিধিদের মনে বড় লাগে!

সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মুঘল শক্তি বিধ্বস্ত, পর্যুদস্ত। মারাঠা শক্তিও নির্জীব। ফরাসীরাও এই দেশে ক্ষমতা হারাইয়াছে। কাজেই, কালক্রমে প্রাধান্য রহিয়া গিয়াছে শুধু ইংরেজ কোম্পানীরই। তাই, যাহারা এক সময়ে এই দেশে পদার্পণ করিয়াছিল ব্যবসায়ের লাভের কড়ি গণনার জন্য, তাহারাই এই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিল নিজেদের প্রভুত্ব। এবং ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইল নিজেদের প্রভুত্ব ও প্রাধান্যের পরিচয় দিতে। সম্রাটের অবশিষ্ট অধিকারগুলিও একের পর এক উঠিয়া যাইতে লাগিল। বছরের পর বছর ইংরেজ কোম্পানী এক-একটি করিয়া দিল্লীর নামে মাত্র বাদশাহী চিহ্নসমূহের উচ্ছেদ করিতে লাগিল। দিল্লীর অধিপতি ও তাঁহার ওয়ারিশান প্রভুত্ব ও প্রাধান্যের সর্বপ্রকার চিহ্ন হইতে বঞ্চিত হইয়া কয়েদীর মত দিল্লীর প্রাসাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮৩৫ সালে দিল্লীশ্বরের নামাঙ্কিত মুদ্রার পরিবর্তে দেশে কোম্পানীর মুদ্রা চলিতে লাগিল। যাঁহার ওয়ালেদান এক সময়ে এই বিদেশী কোম্পানীটিকে এই দেশে আশ্রয় দিয়াছিলেন, যাঁহার ওয়ালেদানের সৌজন্যে এই বেনিয়া কোম্পানীটি বাংলা দেশে ব্যবসায় চালাইবার অনুমতি পাইয়াছিল, তিনিই এখন সেই বেনিয়া কোম্পানীর ব্যবহারে ক্ষমতাশূন্য এবং আধিপত্যহীন হইয়া পড়িলেন! 'দিল্লীশ্বরের'ই যখন এই অবস্থা, তখন দেশের অন্যান্য রাজা-নবাবদের অবস্থা সহজেই চিন্তা করা যায়। চিন্তা করা যায় দেশের জনসাধারণের অবস্থা। দেশের সকলেই এখন বিদেশী বেনিয়া কোম্পানীর অধীনস্থ প্রতিবাদহীন প্রজামাত্র। লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট ঘটনায় এই 'প্রজাত্বের' লাঞ্ছনার কাহিনী মূক হইয়া আছে। রচিত হইয়া আছে এক অলিখিত ইতিহাস। ইংরেজ কোম্পানীর উদ্দেশ্য কাহারও কাছে অবিদিত নাই। বিরাট বিস্তীর্ণ দেশের কোটি কোটি মানুষ অসহ্য অত্যাচারে

www.pathagar.com

নিষ্পিষ্ট হইয়া অধীর আগ্রহে কামনা করিতেছে একটি মহান অগ্ন্যুদ্‌গারের। বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ জানেন, সমগ্র দেশ সেই প্রচণ্ড অগ্ন্যুদ্‌গারে প্রতিবাদমুখর হইয়া উঠিবে যে-দিনটিতে, তা আঠার শ' সাতান্ন সালের ৩১শে মে অথবা ২৩শে জুন।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন শাহ্ আহমদুল্লাহ্ সুফী, অযোধ্যার বেগম হাসরত মহল, বিধুরের ধুন্দুপন্থ নানাসাহেব, আজিমুল্লাহ্ খান, মুহাম্মদ আলি খান প্রমুখ দেশপ্রেমিকেরা। অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্ আজ কলিকাতায় নির্বাসিত। তাঁহার উযীর আলি নকী খান। আলি নকি খান জানেন এই সিদ্ধান্তের কথা। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈও তাঁহাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

ফৌজী ব্যারাক হইতে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ফিরিতেছে হাতে তৈরী চাপাতি। আসন্ন অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত ছড়াইয়া পড়িতেছে সারা দেশে। দিল্লীর লালকেল্লার দেয়ালে পড়িতেছে ইশ্‌তাহার। দেশের ধন-সম্পদ রক্ষা করিতে, দেশের সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে, দেশের ধর্মসমূহকে টিকাইয়া রাখিতে সবাইকে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানাইতেছে এইসব ইশ্‌তাহার। ইশ্‌তাহার ঘুরিয়া ফিরিতেছে কলিকাতা, মিরাট, কানপুর প্রভৃতি স্থানে। ফকির-দরবেশ ও সাধু-সন্ন্যাসীরা গ্রামে-গঞ্জে প্রচার করিতেছেঃ এদেশে ইংরেজ-শোষণের শতবর্ষ পূর্ণ হইতে চলিল। সতের শ' সাতান্নর পর আসিল আঠার শ' সাতান্ন। আসন্ন বিপ্লবের ক্ষণ।

চঞ্চল হইয়া উঠিল চট্টল হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। চঞ্চল হইয়া উঠিল ইহার বিশাল জন-সমুদ্র। মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িলঃ যে ইংরেজ তাহাদের ধনসম্পদ-সংস্কৃতি-ধর্ম নষ্ট করিতে চায়, জাতিনাশ করিতে চায়, তাহাদের ধ্বংস-কাল আসন্ন!

কখন, কোন্ দিন আসিবে সেই শুভ মুহূর্ত? সকলের মনেই এ জিজ্ঞাসা। ২৩শে জুনের সিদ্ধান্তের কথা নেতৃবৃন্দ ছাড়া আর কেউ জানে না।

মুহূর্ত দিয়া রচিত হয় কাল। মুহূর্তের সঠিক কার্যে সাফল্যের আলোকে হাসিয়া ওঠে মুহূর্ত, উজ্জ্বল হইয়া ওঠে কাল। আবার মুহূর্তের ভুলে সাফল্যের আশা বিলীন হইয়া যায় ঘন অন্ধকারে, ম্লান হইয়া যায় কাল। ব্যর্থ হইয়া যায় সকল আশা-আকাঙ্খা।

মার্চ মাস। ব্যারাকপুরের সিপাহীদের মধ্যে উত্তেজনা ও উদ্বিগ্নতার মাত্রা চরমে পৌছিল। সৈনিক নিবাসে খবর রটিয়া গেল যে অনেক ইউরোপীয় সৈন্য জাহাজে করিয়া কলিকাতায় পৌছিয়াছে। শ্রীঘ্রই তাহারা ব্যারাকপুরে পৌছিবে।

www.pathagar.com

সিপাহীরা ভাবিল– তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা হইবে। সকল সিপাহীকেই বলপূর্বক অপবিত্র টোটা দাঁতে কাটিয়া ব্যবহার করানো হইবে। তাই সকলেই অস্থির, সকলেই চিরন্তন জাতি-ধর্ম, চিরন্তন জীবন–বিশ্বাস রক্ষার জন্য অধীর।

২৯শে মার্চ, ১৮৫৭ সাল। মঙ্গল পান্ডে নামক ছাব্বিশ বছর বয়সের এক তরুণ সিপাহী আবেগ ও উত্তেজনায় উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, ভয়ানক সময় উপস্থিত। সকলেরই জাতিনাশ হইবে, ফিরিঙ্গির হাতে ধর্ম–আচার–সংস্কৃতি সবকিছু বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং সময় থাকিতেই, তাহাদের নিরস্ত্র করার আগেই ফিরিঙ্গির বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতেই হইবে এবং এক্ষণই। পান্ডে তাঁহার ইউনিফর্ম পরিয়া কোমরে তলোয়ার ও কাঁধে বন্দুক নিয়া কুঠি হইতে সবেগে বাহিরে আসিলেন। মুহূর্তের জন্যও তাঁহার মনে পড়িল না, বিপ্লবের শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হইলে নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে নির্দেশ আসিবে। তরুণ সিপাহী ভাবিতে ভুলিয়া গেলেন অসময়ের উত্তেজনা সমগ্র জাতির আশা-তরুর মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারে। আবেগের বন্যায় তিনি ভাসিয়া গেলেন। যোদ্ধা বেশে সজ্জিত মঙ্গল পান্ডে জাতির ধর্ম ও সম্মান বাঁচাইবার জন্য সাথীদের আহবান জানাইলেন।

এই ঘটনার সংঘটন–স্থল কোয়ার্টার গার্ডের সম্মুখে, যেখানে জমাদার ঈশ্বর পান্ডের অধীনে পাহারায় রত ছিল ৩৪ নম্বর রেজিমেন্টের ২০ জন সিপাহী।

দেখিতে দেখিতে অন্যান্য উত্তেজিত কিছু সংখ্যক সিপাহীও পান্ডের চারপাশে জমা হইতে লাগিল। মঙ্গল পান্ডে উপস্থিত সার্জেন্ট-মেজর হিউসনকে গুলী করিলেন।। গুলী লক্ষ্যচ্যুত হইল। আতঙ্কিত হিউসন জমাদার ঈশ্বর পান্ডেকে আদেশ করিল উন্মত্ত মঙ্গল পান্ডেকে গ্রেপ্তার করিতে। জমাদার একপদও অগ্রসর হইলেন না। তদুপরি, গম্ভীর কণ্ঠে উপস্থিত সকল সিপাহীকে বলিলেনঃ মঙ্গল পান্ডেকে যে ধরিতে আসিবে, গুলী করিয়া তাহার মাথা উড়াইয়া দিব।

সকলেই নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। হিউসন চলিয়া গেল। খবর পাইয়া ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিল লেফ্‌টেনান্ট্ বগ। মঙ্গল পান্ডেকে লক্ষ্য করিয়া বগ গুলী ছুঁড়িল। সরিয়া গেলেন পান্ডে। পান্ডেও গুলী ছুঁড়িলেন বগ–কে লক্ষ্য করিয়া। তাতে বগের ঘোড়া নিহত হইল। আরম্ভ হইল তলোয়ার যুদ্ধ। মঙ্গল পান্ডের হাতে তাঁহার তলোয়ার হইয়া উঠিল বিষধর সাপ। ক্ষত বিক্ষত হইল বগ। বগকে শেষ আঘাত হানিবার জন্য যেই তলোয়ার তুলিলেন মঙ্গল পান্ডে, ঠিক সেই মুহূর্তে শেখ পল্টু নামক এক সিপাহী পিছন হইতে আসিয়া মঙ্গল পান্ডের কোমর জড়াইয়া ধরিল। এই সুযোগে রক্তাক্ত কলেবরে টলিতে টলিতে পলায়ন করিল লেফ্‌টেনান্ট বগ।

www.pathagar.com

পন্টু পান্ডেকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু নিজের দেশবাসী বলিয়া মঙ্গল পান্ডে পন্টুকে কিছুই করিলেন না। আবার আহ্বান জানাইলেন সাথী ভাইদের, "নিকাল আও পন্টন, নিকাল আও হামারা সাথ।"—কেউ আসিল না। নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল সবাই।

এমন সময় ৩৪ নম্বর রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল হুইলার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রহরারত সিপাহিগণকে হুকুম করিলেন তাঁহার সঙ্গে আসিতে। বারবার তিনবার এই হুকুম করিবার পর সিপাহীরা কয়েক পা অগ্রসর হইল। তারপর হঠাৎ থামিয়া গেল সিপাহীরা, আর এক পাও অগ্রসর হইল না। কর্নেল হুইলার হেড কোয়ার্টার্সে ফিরিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে খবর পাইয়া জেনারেল হিয়ার্সে দমদম ও চুঁচুড়ার সমস্ত ইংরেজ সৈন্যদের তৎক্ষণাৎ আসিবার জন্য হুকুম দিয়া নিজে কয়েকজন ইংরেজ অফিসার ও শিখ সিপাহী সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে হাজির হইলেন। জেনারেল হিয়ার্সেকে আসিতে দেখিয়াই মুহূর্তের মধ্যে মঙ্গল পান্ডে নিজের বন্দুক নিজের বুকের দিকে লক্ষ্য করিয়া পা দিয়া ঘোড়া টিপিয়া দিলেন। গুলী ছুটিল। ধূলায় লুটাইয়া পড়িলেন মঙ্গল পান্ডে।

নিজের গুলীতে মঙ্গল পান্ডের মৃত্যু হয় নাই। গুরুতরভাবে জখম হইয়াছিলেন তিনি। তারপর, সামরিক আদালতের বিচারে ৮ই এপ্রিল ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিলেন মঙ্গল পান্ডে।— আর ২১শে এপ্রিল ফাঁসি হইল জমাদার ঈশ্বর পান্ডের।

মঙ্গল পান্ডেকে ফাঁসির দড়ি গলায় পরাইয়া দেওয়ার জন্য ব্যারাকপুরের কেহই রাজী হইল না। অগত্যা এই কাজের জন্য "চারজন নীচ জাতীয় নেটিভকে কলকাতা থেকে আসতে বাধ্য করা হয়।"

বন্দী অবস্থায় আহত মঙ্গল পান্ডের কাছ হইতে ইংরেজরা চক্রান্তকারী সিপাহীদের নাম জানিবার জন্য সব রকম চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কাহারও নাম প্রকাশ করেন নাই মঙ্গল পান্ডে।

এমনি করিয়া অসময়ে, বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের পরিকল্পনা সুষ্ঠু রূপ নেওয়ার পূর্বেই জ্বলিয়া উঠিল বিপ্লবের আগুন। যে সুপরিকল্পিত অভ্যুত্থান সংঘটিত হইত ২৩শে জুন, এক তরুণের মুহূর্তের ভুলে তাহা এলোপাথাড়ি ভাবে আরম্ভ হইয়া গেল ২৯ শে মার্চ।

মঙ্গল পান্ডে ছিলেন আবেগপ্রবণ এক তরুণ সিপাহী। কিন্তু ছিলেন না কি তিনি দেশপ্রেমিক?

মঙ্গল পান্ডে হইলেন তদানীন্তন ভারতের প্রথম জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রথম প্রাণদানকারী।

www.pathagar.com

বিদ্রোহী বাংলাদেশ

"আমারা একটা প্রকাণ্ড বিস্ফোরক বোমার উপর বাস করছি– যে কোন মুহূর্তে তার বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।"

উদ্ধৃতিটি ইংরেজ সরকারকে লিখিত একটি চিঠি হইতে গৃহীত। মিঃ ফরেস্ট প্রণীত 'স্টেট পেপার্স'–এর ১ম খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠায় ঐ চিঠি মুদ্রিত রহিয়াছে। তদানীন্তন বাংলার প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল হিয়ার্সে ঐ চিঠি সরকারকে লিখিয়াছিলেন ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৭ সালে।

সত্যিকার ভাবেই সাতান্নর মহা–অভ্যুত্থানের জন্য বাংলা দেশ ছিল একটা প্রকান্ড বিস্ফোরক বোমা। ১৮৫৭ সালের জাতীয় এই মহা–অভ্যুত্থানের সূচনা হয় বাংলা দেশেই।

জানুয়ারী মাসের শেষাশেষি এন্‌ফিল্ড রাইফেলের টোটার প্রশ্নটাই সারা দেশে গুরুতর প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায়। ব্যারাকপুর হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত প্রতিটি সিপাহী ব্যারাকে, গঞ্জে–গ্রামে আন্দোলনের সূচনা হয়। পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলের বহরমপুর, ব্যারাকপুর হইয়া ওঠে ঘটনাময় স্থান। ২৬শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যরাত্রে বহরমপুরের ৮০০ সিপাহী বারুদখানা আক্রমণ করিয়া তাহার দরজা ভাঙ্গিয়া পুরাতন মাস্কেট বন্দুক ও তাহার টোটা নিয়া নিজেদের লাইনে চলিয়া গেল। সিপাহীদের বিদ্রোহমূলক এই কাজের খবর পাইয়াই সেনানায়ক মিচেল নিজ নিয়ন্ত্রিত ২০০ অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ নিয়া প্যারেড গ্রাউন্ডে হাজির হইলেন। সিপাহীদের উপর হুকুম হইলঃ অস্ত্র সমপর্ণ কর। মিচেলের হুকুম পালিত হইল না। কি ভাবিয়া অগত্যা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন মিচেল।

২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরে ঘটিয়া গেল মঙ্গল পান্ডের আবেগোত্তেজিত কাহিনী। ৮ই এপ্রিল ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ দিলেন মঙ্গল পান্ডে, আর ২১শে এপ্রিল ঈশ্বর পান্ডে।

ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার জন উইলিয়াম কে'র ভাষায়, "এপ্রিল মাস শেষ হইতে না হইতেই লর্ড ক্যানিং বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, এশিয়ার জাতিগুলির মধ্যে যে আত্মকলহ এই পর্যন্ত আমাদের ক্ষমতার ও নিরাপত্তার প্রধান উপাদান বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইয়াছিল তাহা হইতে আর কিছু আশা করা যায় না। মুসলমান ও হিন্দুরা সকলেই আমাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে দাঁড়াইল।"

(এ হিষ্ট্রি অব দ্য সিপয় ওয়ার ইন ইন্ডিয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬৫)

www.pathagar.com

তখনকার বাংলার যে অংশটুকু নিয়া আমাদের বর্তমানের বাংলাদেশ, অভ্যুত্থানের জোয়ার এই এলাকায় কতটুকু আসিয়াছিল, এখন তাহারই একটা রূপরেখা দেওয়া যাইতে পারে।

চট্টগ্রামে ছিল ৩৪ নম্বর রেজিমেন্টের সিপাহী দল। ১৮৫৭ সালের ১৮ই নভেম্বর রাত্রিকালে তাহারা কোম্পানীর বিরুদ্ধে উত্তেজনা প্রকাশ করে। সিপাহীদের বুঝাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করেন তাহাদের ইংরেজ অধিনায়ক। কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। বরং কোন কোন সিপাহী সেই অধিনায়ককে গুলী করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু অন্যেরা ইহাতে বাধা দেয় এবং অধিনায়ককে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করে। অধিনায়ক উপায়ান্তর না দেখিয়া ইউরোপীয়দিগকে সংবাদ দিবার জন্য তাহাদের গৃহে গমন করেন। তাঁহার উপস্থিতির পূর্বেই কেহ কেহ সিপাহীদের মেজাজ-মর্জির সংবাদ পাইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এইবার সিপাহীদের অধিনায়ক এবং বাদবাকী ইউরোপীয়গণ ছদ্মবেশে সাধু-সন্ন্যাসী সাজিয়া এবং কবীর প্রমুখ সাধকদের দুই-এক লাইন দোঁহা অশুদ্ধভাবে গাহিয়া গাহিয়া জঙ্গলময় পথ দিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহাদের পথ-প্রদর্শক হইল কালেক্টর সাহেবের বিশ্বস্ত বেয়ারাগণ।

এইদিকে উত্তেজিত সিপাহীরা খাজাঞ্চীখানার প্রায় তিন লক্ষ টাকা হস্তগত করিয়া জেলখানার কয়েদীদের মুক্ত করিয়া, সেনানিবাস ভস্মীভূত করিয়া, অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিল। কোম্পানী সরকারের তিনটি হাতী ও দুইটি ঘোড়ার উপর নিজেদের জিনিসপত্র বোঝাই করিয়া চট্টগ্রামের সিপাহীদল ত্রিপুরা অভিমুখে যাত্রা করিল। তাহাদের পরিচালক নির্বাচিত হইলেন এক হাবিলদার- নাম রজব আলি খান।

চট্টগ্রামের সিপাহীদল কোন ইউরোপীয়কে আক্রমণ করে নাই, কাহাকেও হত্যা করে নাই। শুধু মাত্র জেলখানার একজন বরকন্দাজ তাঁহাদিগকে বাধা দিতে গিয়া নিহত হন। সুতরাং ধারণা করা চলে যে, দেশকে স্বাধীন করার মহান এক অনুভবে তাঁহারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার পথে চলিতে চলিতে তাঁহাদের এই আশা আরও দৃঢ় হইতেছিল যে, ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর দেশের স্বাধীনতাব্রতী সিপাহীদলকে আশ্রয় দিবেন, নেতৃত্ব দিবেন। কিন্তু যে একটি সামান্য ভুল তাঁহারা করিয়াছিলেন, তাহা এই যে কোম্পানীর নিজ হাতে সৃষ্টি করা মাণিক্য বা অন্য কোন বাহাদুর সহসাই প্রভু-সেবার ব্রত ত্যাগ করেন নাই। তাই চট্টগ্রামের কমিশনার সাহেব যখন ত্রিপুরার মহারাজাকে উত্তেজিত সিপাহীদের

www.pathagar.com

গতিরোধ বা ধ্বংস সাধন করিতে অনুরোধ জানাইলেন, তখনই এক পরম ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ত্রিপুরার মাণিক্য বাহাদুর। সিপাহীবৃন্দ সীতাকুণ্ডে উপস্থিত হইয়া কোম্পানীর রাজ্য পরিত্যাগের বাসনায় 'স্বাধীন' ত্রিপুরার মাটিতে পা রাখিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ত্রিপুরার যে মহারাজা কোম্পানীর 'হিত কামনায়' ব্রতী হইয়াছেন, সিপাহীদের আগমন সংবাদ পাইয়াই সেই মাণিক্য বাহাদুর বহু সংখ্যক অস্ত্রধারী লোক তাঁহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সব অস্ত্রধারী ২রা ডিসেম্বর সিপাহীদের গতিরোধ করিল।

মর্মাহত সিপাহীবৃন্দ আর অগ্রসর হইলেন না। পুনর্বার কোম্পানী রাজ্যে ফিরিয়া কুমিল্লার অদূরবর্তী লালমাই পাহাড়ের দিকে যাইতে লাগিলেন। এই পার্বত্য স্থান অতিক্রমের সময় তাঁহাদের কষ্টের একশেষ হইল। ত্রিপুরা-রাজ ও অন্যান্য 'সম্ভ্রান্ত' জমিদারগণের নিয়োজিত অস্ত্রধারীদের হাতে সিপাহীদল বারবার নিপীড়িত হইতে লাগিল। হাতী তিনটি তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইল, মুক্ত কয়েকদীদের অনেকেই ধৃত হইল। সিপাহীদের দশ হাজার টাকা হস্তভ্রষ্ট হইয়া গেল। উপায়ান্তর না দেখিয়া রজব আলি খান তাঁহার সিপাহীদলকে নিয়া মণিপুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা বাধাপ্রাপ্ত হইলেন শ্রীহট্টে। ১৫ই ডিসেম্বর শ্রীহট্টের এতদ্দেশীয় পদাতিক দলের অধিনায়ক মেজর বাইণ্ডকে সিপাহীদের মোকাবিলা করিতে আদেশ দিলেন শ্রীহট্টের প্রধান রাজ-কর্মচারী এলেন সাহেব। মেজর বাইণ্ড তদনুসারে নিজ সৈন্যদল নিয়া প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। শ্রীহট্ট হইতে ৮০ মাইল দূরবর্তী প্রতাপগড় নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি শুনিলেন যে, সিপাহীরা শীঘ্রই লাতু নামক স্থানে উপনীত হইবে। লাতু প্রতাপগড় হইতে শ্রীহট্টের দিকে প্রায় ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। তদনুযায়ী মেজর বাইণ্ড চলিলেন লাতুর দিকে। লাতুতে মুখোমুখি হইল চট্টগ্রামের স্বাধীনতাব্রতী সিপাহীদল এবং কোম্পানীভুক্ত শ্রীহট্টের সিপাহীদল। কোম্পানীভুক্ত শ্রীহট্টের সিপাহীরা সঙ্গীন উঁচু করিয়া ধরিল। অগত্যা আরম্ভ হইল যুদ্ধ। মেজর বাইণ্ড নিহত হইলেন। কিন্তু তাহাতেও অবদমিত হইল না শ্রীহট্টের সিপাহীরা। প্রবল পরাক্রমে তাহারা চট্টগ্রামের সিপাহীদের আক্রমণ করিয়া চলিল। জয়ের কোন আশা না দেখিয়া স্বাধীনতাব্রতী সিপাহীরা লাতু ও মণিপুরের মধ্যবর্তী দুর্গম অরণ্যে আত্মগোপন করিলেন। অনেক কষ্টের পর প্রবেশ করিলেন তাঁহারা মণিপুর রাজ্যে।

কিন্তু মণিপুরেও তাঁহাদের অবস্থিতি হইল না নিরাপদ। ১৮৫৮ সালের ৯ই জানুয়ারী শ্রীহট্টের সিপাহিগণ আবার আক্রমণ করিল এইসব আশ্রয়প্রার্থী

www.pathagar.com

স্বাধীনতাব্রতী সিপাহিগণকে। ইহাতে মণিপুর–রাজের সায় ছিল নিশ্চয়ই। এইবার শ্রীহট্টের সিপাহীদলের অধিনায়ক জমাদার জগধীর সিংহ। দুই ঘন্টা ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। মুষ্টিমেয় স্বাধীনতাব্রতীর সম্মুখে ঘনাইয়া আসিল পরাজয়ের গ্লানিভরা অন্ধকার রাত্রি। আবার তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল পার্বত্য প্রদেশের জঙ্গলে। এই সিপাহীবৃন্দ কোথাও কোন লুঠতরাজ করেন নাই, আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই কোন হীন কার্যের। তাঁহারা শুধুমাত্র কামনা করিয়াছিলেন, এই দেশ স্বাধীন হোক। প্রয়োজনে নিজেদের জীবন দানে প্রস্তুত হইয়া তাঁহারা পথে নামিয়াছিলেন। আশা ছিল, এই মহৎ কাজে তাঁহাদিগকে নেতৃত্ব দান করিবেন ত্রিপুরার মহারাজা, মণিপুরের মহারাজা।

নেতৃত্বের আশায় তাঁহারা পথে প্রান্তরে পাহাড়ে জঙ্গলে অশেষ দুঃখ কষ্টই ভোগ করিলেন শুধু। আগাইয়া আসিতে দেখিলেন না 'সম্ভ্রান্ত' 'প্রাতঃস্মরণীয়' কোন 'রাজপুরুষ'কে। শেষে শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম পার্বত্য জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন দেশের স্বাধীনতাব্রতী কয়েকজন বীর সিপাহী! চিরদিনের জন্য!

চট্টগ্রামে সিপাহী অভ্যুত্থানের পর চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলে সৃষ্ট হয় এক প্রচন্ড আতঙ্ক। আতঙ্কটা ছিল সুবিধাভোগী শ্রেণীসমূহের মধ্যেই। কাজেই শ্রেণীগুলি ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে বিদ্রোহ দমনের জন্য সর্ব রকমে সাহায্য করিয়াছিল। ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর এবং অন্যান্য জমিদারগণ তাঁহাদের সৈন্য, পাইক, বরকন্দাজ সবই ইংরেজের সাহায্যে নিয়োজিত করিলেন।

চট্টগ্রামের বিদ্রোহের চারদিন পর, ২২শে নভেম্বর ঢাকায় অবস্থিত ৭৩ নম্বর রেজিমেন্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই সময় ঢাকায় প্রায় ২০০ ইংরেজ নৌসেনা ও অন্যান্য ভলান্টিয়ার উপস্থিত ছিল। চট্টগ্রামের সিপাহীদলের খবর পাওয়া মাত্র ঢাকার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ওই ২০০ জন ইংরেজ সৈন্যের সাহায্যে ঢাকার সিপাহীদের নিরস্ত্র করিতে আরম্ভ করে। ঢাকার লালবাগ দুর্গে সিপাহীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল দুইটি কামান। ঐ কামানের সাহায্যে দুর্গের সিপাহীরা ইংরেজ নৌসেনাদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ায়। যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে প্রাণ হারায় ৪১ জন সিপাহী এবং ইংরেজের হাতে বন্দী হয় ২০ জন। অবশিষ্ট সিপাহীরা লালবাগ দুর্গ ত্যাগ করিয়া সাঁতরাইয়া নদী পার হইয়া যায়। নদী পার হওয়ার সময়েও ইংরেজদের গুলীতে প্রাণ হারায় কয়েকজন। যাহারা প্রাণ নিয়া নদী পার হইয়া গেল, তাহারা ময়মনসিংহ, রংপুর, উত্তর বিহার অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হইল অযোধ্যায়। অযোধ্যায় তখন সিপাহীবিদ্রোহ গণবিদ্রোহে রূপ নিয়াছে। ঢাকার এইসব সিপাহীরাও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল সেই গণবিদ্রোহে।

www.pathagar.com

একটি প্রাণ

পাটনা। ওয়াহাবী আন্দোলনের অন্যতম ঘাঁটি ছিল এই মুসলমান-প্রধান নগরী পাটনায়। অগ্নিপুরুষ সৈয়দ আহমদ বেরেল্‌বীর অনুসারীরা পাটনায় তখনো প্রভাবশালী।

স্বাধীনতার আহবানে সমগ্র পাটনা সেদিন উচ্চকিত, চঞ্চল। বিপ্লবের ঢেউ পাটনাবাসীর হৃদয়-তটে দোলা দিতেছে। মিরাট ও দিল্লীর খবর ছড়াইয়া গিয়াছে সর্বত্র। চাপাতির সংকেত নাড়া দিয়াছে সকলকেই। কিন্তু এখনো সক্রিয়ভাবে সাড়া দেয় নাই পাটনা। পাটনায় তেমন অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই তখনো। তখনকার একটি খবর।

খবরটি শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছেন পাটনার পুস্তক-বিক্রেতা পীর আলি। খবরটি অভাবনীয় না হইলেও অপ্রত্যাশিত।

পীর আলির আদি বাসস্থান ছিল লাখ্‌নৌতে। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য তিনি পাটনায় চলিয়া আসিয়াছেন বহুদিন আগে। আরবী ও ফারসী সাহিত্যে তাঁহার দখল আছে যথেষ্ট। এই সাহিত্য-পরিচিতি ও সাহিত্য-প্রীতিই তাঁহাকে পুস্তক-ব্যবসায়ে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। শিক্ষিত মহলে পীর আলির ভাল জানা-শোনা।

খবরটি তাঁহাকে ভাবাইয়া তুলিল। লোকমুখে শুনিয়া তিনি গিয়াছিলেন মৌলবী এলাহি বক্‌সের সঙ্গে দেখা করিতে। খবরটির সত্যতা নিরূপণ করিতে। জানিয়াছেন, খবরটি সত্য। বৃদ্ধ ও অন্ধ মৌলবী এলাহি বক্‌স্ খুবই দুঃখিত হইয়াছেন। আর দুঃখিত হওয়ার কথাও। আজীবন সংগ্রামী হইলেও মৌলবী সাহেব একজন পিতা। পিতার মনকে তিনি আশ্বস্ত করিবেন কি ভাবে? পুত্রের বিপদে পিতার মন তো কাঁদিয়া উঠিবেই! তবে তিনি ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই। জানেন, সংগ্রামের পথে এই রকম হওয়াই স্বাভাবিক। সংগ্রামের পথ তো কুসুমাস্তীর্ণ নয়!

পাটনার কমিশনার টেলর সাহেবের মন-মেজাজই বিচিত্র, আলাদা। আঠার শ' সাতান্নর এই দিনে দানাপুরের প্রধান সৈনিক কর্মচারী যখন ইউরোপীয় ও এদেশীয়দের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষা করাই প্রধান কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন, পাটনার কমিশনার টেলর তখন পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে এদেশীয়দিগকে ফাঁসিতে ঝুলাইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। এই টেলর সাহেব সেদিন মৌলবী আহ্‌মদুল্লাহ্, মাহ্‌মুদ হোসেন ও ওয়াজুল হককে নিজের বাসগৃহে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য, রাজকীয় কার্য সম্পর্কে পরামর্শ করা। যথা

www.pathagar.com

সময়ে মৌলবী সাহেবান কমিশনার টেলরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ক্ষণপরে টেলরও সে গৃহে প্রবেশ করিলেন। মৌলবী সাহেবানের সঙ্গে সিপাহীদের গোলযোগ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে টেলরের সহচরবর্গ ও সৈনিক পুরুষেরা বিদায় গ্রহণ করিলে মৌলবী সাহেবানও বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বিদায় মঞ্জুর করিলেন না টেলর সাহেব। বলিলেন—

ঃ যতদিন না পাটনায় বা তাহার আশেপাশে উপস্থিত গোলযোগের শান্তি না হয়, ততদিন সাধারণের মঙ্গলের জন্যই আপনাদিগকে অবরুদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি।

ব্যাপারটি বুঝিতে বিলম্ব হইল না মৌলবী সাহেবানের। গম্ভীর ও সংযতভাবে তাঁহারা উত্তর দিলেন–

ঃ আপনার যেমন দয়া, তেমনি অভিজ্ঞতা। আপনি যে হুকুম করিতেছেন, তাহা আমাদের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক। আমাদের দুশমনেরা আর আমাদের বিপক্ষে মিথ্যা অভিযোগ আনিতে পারিবে না।

ঃ যাহা আপনাদের নিকট ভাল, তাহা আমারও মনঃপুত।

ধীরভাবেই বলিলেন টেলর সাহেব। হাসিমুখে বন্দীশালার দিকে যাইবার জন্য উঠিলেন মৌলবী সাহেবান। মৌলবী আহ্‌মদুল্লাহ্‌কে স্মরণ করাইয়া দিলেন টেলর সাহেব–

ঃ মনে রাখিবেন, আমি আপনার পিতাকে, বৃদ্ধ ও অন্ধ মৌলবী এলাহি বক্‌স্‌কে অবরুদ্ধ করিলাম না। কিন্তু তাঁহার জীবন আপনার হাতে এবং আপনার জীবন তাঁহার হাতে রহিয়াছে।

বিশ্বাসঘাতক টেলরের সঙ্কল্প স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

খবর শুনিয়া মর্মাহত হইল সমগ্র পাটনাবাসী। মর্মাহত হইলেন মৌলবী আহ্‌মদুল্লাহ্‌র বৃদ্ধ অন্ধ পিতা মৌলবী এলাহি বক্‌স্‌। মর্মাহত হইলেন পুস্তক বিক্রেতা পীর আলি। তাঁহার প্রশস্ত ললাটে ফুটিয়া উঠিল চিন্তার রেখা। সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন তিনি।

বিশ্বাসঘাতক টেলরের আশা সম্পূর্ণভাবে সফল হয় নাই। এই ব্যবস্থায় পাটনায় ইউরোপীয়দের শান্তি অব্যাহত থাকে নাই। অবস্থা বুঝিয়া পাটনার অধিবাসীদিগকে ভয় দেখাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করা হয়। সে চেষ্টাও সম্পূর্ণভাবে ফলবতী হয় নাই। ৩রা জুলাই সন্ধ্যাকালে পাটনাবাসীরা সমবেতভাবে প্রকাশ্য পথে বাহির হইয়া তাহাদের প্রতিবাদ ব্যক্ত করে। এই উত্তেজনার সময়ে ডাক্তার লায়াল নামক একজন কর্মচারী উত্তেজিত জনতার হাতে প্রাণ দেয়।

www.pathagar.com

তারপর শিখ সৈন্যের আগমনে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। কিন্তু টেলরের মনে জাগিয়া ওঠে জহ্লাদের স্পৃহা।

পীর আলির ব্যবসা এখন আর চলে না। আর বিপ্লবের এই দিনে তাহার ব্যবসা চলিবে, ইহা তিনি আশাও করেন না। এই বিপ্লবকে তিনি মনেপ্রাণে সমর্থন করেন। দেশের সত্যিকার স্বাধীনতা ফিরিয়া আসুক, শেষ হোক বিদেশী কোম্পানীর জুলুম, তিনিও তাহা চান। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পীর আলিঃ আর পরোক্ষ সমর্থন নয়, এবার তিনিও বিপ্লবে প্রত্যক্ষভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। দেশকে দুশমনের হাত হইতে রক্ষা করার এ প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করা যে প্রতিটি দেশবাসীর কর্তব্য! কিন্তু আরেকটি খবরে তাঁহার মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ডাক্তার লায়ালের মৃত্যুর জন্য দায়ী করিয়া টেলর সাহেব অনেককেই ধরিতেছেন এবং বিচারের প্রহসন করিয়া ফাঁসিতে ঝুলাইতেছেন। ইহা কোন্ রকমের বিচার, তিনি ভাবিয়া পান নাই। হত্যার জন্য শুধু হত্যাকারীরই প্রাণদণ্ডের বিধান আছে। কিন্তু টেলর যে একের পর এককে হত্যাকারী সাব্যস্ত করিয়া চলিয়াছেন! সেদিন পীল আলির চিন্তার মধ্যেই ছেদ পড়িল। তিনিও ধৃত হইলেন ডাক্তারের হত্যাপরাধে।

বিচার?

হ্যাঁ, 'বিচার' হইয়াছিল পীর আলির। আর 'বিচারে' তিনি দোষীও সাব্যস্ত হইয়াছিলেন।

তিনি যখন কমিশনার টেলরের সমক্ষে আনীত হন, তখন তাঁহার হাত পা' কঠিন লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। আর প্রহরীদের অস্ত্রাঘাতে তাঁহার ঘর্মাক্ত পরিচ্ছদ শোণিত-রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল। টেলর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, উপস্থিত গোলযোগ সম্পর্কে তিনি এমন কোন গোপনীয় খবর দিতে পারেন কিনা, যাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া কোম্পানী সরকার তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে পারেন।

গোপন খবর? গোপন খবর কিছু জানিতেন পীর আলি। বিপ্লবী নেতাদের উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে তিনি যে কিছু জানিতেন না, তাহা নয়। প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি কি সেসব খবর ফাঁস করিয়া দিবেন?... দৃঢ় ও গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন পীর আলি—

ঃ এমন কতকগুলি কাজ আছে, যাহার জন্য জীবন রক্ষার প্রয়োজন হয়। আবার এমন কাজও আছে, যাহার জন্য জীবন বিসর্জনেরও প্রয়োজন দেখা দেয়।

বিশ্বাসঘাতক টেলরের সমস্ত জুলুমের কথা স্মরণ করিয়া উত্তেজিত হইয়া

www.pathagar.com

উঠিলেন পীর আলি। নির্ভীক কণ্ঠে তিনি বলিয়া গেলেন —

ঃ আপনি আমায় ফাঁসি দিতে পারেন, আমার মত অপর লোকও ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতে পারে। কিন্তু আমার জায়গায় দণ্ডায়মান হইবে হাজার হাজার মানুষ। আপনার উদ্দেশ্য কখনও সফল হইবে না।

বিস্মিত চোখে চাহিয়া রহিলেন কমিশনার টেলর। এত সাহস সামান্য একটি পুস্তক বিক্রেতার? কিন্তু জালেম টেলর কি করিয়া বুঝিবেন, দেশপ্রেমিকের কাছে প্রাণের চেয়েও দেশ বড়!

পীর আলি কমিশনারকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

ঃ আমার কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে।

ঃ জিজ্ঞাসা কর।

ঃ আমার বাসগৃহ সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত?

ঃ ভূমিসাৎ হইবে।

ঃ আমার সম্পত্তি?

ঃ বাজেয়াপ্ত হইবে।

ঃ আমার সন্তান পরিজন? তাহারা কোথায়?

ঃ অযোধ্যায় পালাইয়া গিয়াছে।

আর কোন উত্তর দিলেন না কমিশনার। অযোধ্যা যে তখন বিপ্লবীদের শক্তিশালী ঘাঁটি, তাহা জানিতেন কমিশনার টেলর। তাঁহার বা কোম্পানীর জুলুমের হাত অযোধ্যায় না-ও পৌঁছিতে পারে।

মনে হইল- পুস্তক-বিক্রেতা পীর আলি যেন অনেকটা আশ্বস্ত! আর কোন কথা না বলিয়া ধীরভাবে বধ্যভূমিতে গমন করিলেন পীর আলি। যেন একটি নিষ্কম্প প্রদীপ শিখা! সাধারণ হইলেও স্মরণীয় একটি প্রাণ!

www.pathagar.com

এক বৃদ্ধ বিপ্লবী

পঁচিশে জুলাই, আঠার শ' সাতান্ন সাল।

বিহারের অন্তর্গত পাটনার কাছাকাছি দানাপুর ও জগদীশপুর। জগদীশপুরের রাজা কুমার সিংহের বয়স তখন ৮০ বৎসরেরও বেশি। দানাপুর হইতে একদল সিপাহী অভ্যুত্থানে যোগ দেওয়ার জন্য জগদীশপুরে কুমার সিংহের কাছে উপস্থিত হইল। রাজা কুমার সিংকে তাহারা নেতা হিসাবে চায়। পূর্ব হইতেই সঙ্কল্পে স্থির আশি বৎসরের বৃদ্ধ রাজা সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হইয়া গেলেন। দেশকে বিদেশী কবল হইতে মুক্ত করা তাঁহার যে পবিত্র কর্তব্য!

সাহাবাদ জেলার প্রধান শহর আরা। আরাতে আছে ইংরেজদের রেজিমেন্ট। রাজা কুমার সিং তাঁহার সিপাহীদল নিয়া আরা আক্রমণ করিয়া দখল করিলেন। ইংরেজদের অধীনে রহিল কেবলমাত্র একটি সুরক্ষিত গৃহ। তিনদিন ইংরেজগণ তাহাদের স্বপক্ষীয়দের নিয়া সেই গৃহে অবরুদ্ধ। ইতিমধ্যে আবার খবর পৌঁছিয়া গিয়াছে দানাপুরে। রাজা কুমার সিং-কে আক্রমণ ও ইংরেজদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য দানাপুর হইতে সেনানায়ক ডানবারের নেতৃত্বে ৩৫০ জন ইংরেজ ও ১৫০ জন শিখ সৈন্য ২৯ শে জুলাইর মধ্যরাত্রে আরার তিন মাইলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের সামনে একটি মাত্র আমবাগান, তার পরেই আরা। কিন্তু হঠাৎ আকাশ হইতে যেন বাজ পড়িল। আমবাগানেই ওঁৎ পাতিয়া ছিল কুমার সিংহের সিপাহীরা। চারদিক হইতে অতর্কিতে আক্রান্ত হইল ইংরেজগণ। নিহত হইলেন সেনানায়ক ডানবার। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ ও শিখগণের পলায়ন। কিন্তু পলায়ন পথেও যে সমূহ বিপদ! মাইলের পর মাইল যেখান দিয়াই তাহারা পালাইবার চেষ্টা করে, সেখানেই ওঁৎ পাতিয়া আছে রাজা কুমার সিংহের সিপাহীরা। পরের দিন ৩০শে জুলাই ইংরেজ-শিখ মিলাইয়া ৫০০ জন হইতে মাত্র ৫০ জন কোন মতে প্রাণ লইয়া দানাপুরে পৌঁছিতে সমর্থ হইল।

৩রা আগস্ট। মেজর এইর-এর নেতৃত্বে কাশী হইতে একটি সৈন্যবাহিনী বড় বড় কামানসহ আরা আক্রমণ করিল। রাজা জানিতেন, বড় বড় কামানের বিরুদ্ধে লড়িবার শক্তি তাঁহার সিপাহীদের নাই। তাই তিনি সিপাহীদলসহ আরা পরিত্যাগ করিয়া জগদীশপুর চলিয়া আসিলেন। কিন্তু ইংরেজগণ কি তাঁহাকে এমনিভাবে ছাড়িয়া দিতে পারে? ১২ই আগস্ট মেজর এইর জগদীশপুর আক্রমণ করিলেন। উন্নততর অস্ত্রের জোরে ধ্বংস করিয়া দিলেন জগদীশপুর। জগদীশপুর

www.pathagar.com

হারাইয়া রাজা কুমার সিং আশ্রয় নিলেন নিজেরই আতাউরা শহরে। সেখানেও তিনি আক্রান্ত হইলেন। মেজর এইর গভর্নর-জেনারেলকে লিখিলেন, "আমি এই শহর ধ্বংস করে দিচ্ছি, রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য অট্টালিকাগুলিকেও উড়িয়ে দিচ্ছি। আজ আমি একটা হিন্দু মন্দিরও ধ্বংস করে দিলাম– যে মন্দির সম্প্রতি কুমার সিং অনেক টাকা খরচ করে বড় করে গড়ে তুলেছিলেন। আমি এটা করেছি এই কারণে যে, ব্রাহ্মণরা বিদ্রোহের উস্কানি দিয়েছিল।" (ফরেস্ট ঃ হিস্ট্রি অব দ্য ইন্ডিয়ান মিউটিনি, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৫)

আশ্রয় নেওয়ার জন্য নিজ আয়ত্তের কোন স্থান আর রাজা কুমার সিংহের জন্য রহিল না। সিপাহীদলসহ রাজা এইবার তাঁহার নিকটাত্মীয় রেওয়ার রাজার আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। কিন্তু রেওয়া–রাজের কাছে ইংরেজগণ যে কুমার সিংহের চাইতেও 'বড় আত্মীয়' হইয়া আছেন! সুতরাং আশ্রয় মিলিল না। রাজা কুমার সিং ও তাঁহার সিপাহীদলের জন্য বাকী রহিল শুধু স্বদেশের বন জঙ্গল, পথ–প্রান্তর। বৃদ্ধ রাজা ছয়–সাত মাস ধরিয়া আশ্রয়ই গ্রহণ করিয়া কাটাইলেন। আর এই ছয়–সাত মাস ধরিয়া সেই ইংরেজরা রাজা কুমার সিং–কে ধরিবার চেষ্টা করিল। অনেক ফাঁদই পাতা হইল এই বৃদ্ধ বিপ্লবীকে ধরিবার জন্য। কিন্তু প্রত্যেকবারই গ্রামবাসীদের সাহায্যে তাহাদের প্রিয় রাজা ইংরেজের ঘেরাও কাটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। শুধু কি তাই? রাজার সিপাহীদলের জন্য রসদ ও অর্থ চাই তো। যে সকল স্থানে ইংরেজরা রাজা কুমার সিংহের ঝটিকা–উপস্থিতি কল্পনাও করিতে পারে নাই, সেইসব স্থানে অকস্মাৎ হানা দিয়া রসদ ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিয়া গেলেন বৃদ্ধ বিপ্লবী রাজা কুমার সিং।

১৭ই মার্চ, ১৮৫৮ সাল। হঠাৎ ইংরেজরা শুনিল, রাজা কুমার সিং তাঁহার সিপাহীদল নিয়া গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব-অযোধ্যায় গিয়া হাজির হইয়াছেন। ইংরেজরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

২১শে মার্চ কর্নেল মিলম্যান আজিমগড় হইতে আগাইয়া গিয়া আত্রোলিয়াতে কুমার সিংহের সেনাদলকে আক্রমণ করিলেন। সিপাহীরা কিছুটা বাধা দিয়াই পিছনে হটিয়া গেল। তাহারা পলায়ন করিয়াছে মনে করিয়া ইংরেজপক্ষীয়রা পরমানন্দে রাতের আহার প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। যুদ্ধজয় তো সম্পন্ন! এবং এই ঢিলা–ঢালা অবস্থার সুযোগে তাহারা অতর্কিতে আক্রান্ত হইল সিপাহীদের দ্বারা। ফলে, ইংরেজপক্ষীয়দের মধ্যে মুহূর্তে আসিয়া গেল বিশৃঙ্খলা, পরাজয় ও পলায়নের তাড়াহুড়া। মিলম্যান কোন রকমে পলায়নে সক্ষম হইয়া আজিমগড়ে পৌছিলেন। জরুরী সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তিনি খবর পাঠাইলেন কাশী, লক্ষ্ণৌ

www.pathagar.com

এবং এলাহাবাদে।

এইবার কাশী হইতে বাহিনীসহ আসিলেন কর্নেল ডেইম্‌স্‌। কিন্তু পথে তিনিও রাজার সিপাহীদের হাতে লাভ করিলেন একই রকম অভ্যর্থনা। পথে পথে অতর্কিত আক্রমণে ডেইম্‌সের সৈন্যরা প্রাণ হারাইতে লাগিল। মুষ্টিমেয় বিপন্ন সৈন্য লইয়া তিনিও আজিমগড়ে মিলম্যানের মত আশ্রয় নিলেন। গভর্নর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং তখন এলাহাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন। কর্নেলদ্বয়ের অবস্থার কথা জানিয়া তিনি প্রমাদ গণিলেন। উদ্বিগ্ন হইলেন তিনি। উদ্বেগের বিশেষ কারণ এই যে, রাজা কুমার সিংহের এই জাতীয় গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধের সাফল্য "বাংলা দেশে গুরুতর প্রভাব বিস্তার করবে। তাছাড়া কুমার যদি কাশীর দিকে রওয়ানা হন, তাহলে কলকাতা ও লক্ষ্ণৌর মধ্যে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাবে।" (ফরেস্ট ঃ হিস্ট্রি অব দ্য ইন্ডিয়ান মিউটিনি, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬০)

এই পরিকল্পনাই ছিল রাজা কুমার সিংহের। লর্ড ক্যানিং বুঝিতে ভুল করেন নাই এবং তদনুসারে বৃদ্ধ চতুর রাজাকে দমনার্থে নিয়োগ করিলেন এমন এক জেলারেলকে যিনি অত্যন্ত সাহসী, সুচতুর এবং ক্রিমিয়া যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তিনি হইলেন জেনারেল লর্ড মার্কক। ইতিমধ্যে আবার ২০শে মার্চ লক্ষ্ণৌতে সিপাহীদের পরাজয় ঘটিয়াছে। কাজেই, রাজাকে তাঁহার সেই পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে হইল।

৬ই এপ্রিল, ১৮৫৮ সাল। লর্ড মার্কক আটটি কামানসহ এক বিরাট বাহিনী নিয়া আজিমগড়ের আট মাইল দূরে রাজার বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। কামানবিহীন রাজার বাহিনী কিন্তু যুদ্ধের কৌশল বদলাইয়া ফেলিলেন। রাজা নিজ বাহিনীকে এমনভাবে সন্নিবেশিত করিলেন যে, লর্ডের বাহিনী পশ্চাতে ও পার্শ্বে আক্রান্ত হইয়া খুবই বিপন্ন হইয়া উঠিল। ইংরেজ পক্ষের জবানীতে, "কতক্ষণ ধরে আমাদের কামানগুলি খুব গোলা বর্ষণ করতে থাকল। কিন্তু শত্রুদের উপর তার কোনো প্রতিক্রিয়াই হল না। অট্টালিকাগুলি ও আমবাগানের প্রতিটি গাছের শাখা বন্দুকধারী সিপাহীতে ভর্তি ছিল। আমাদের লম্বা কনভয়টি ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল, হাতীর মাহুত ও গরুর গাড়ির চালকরা সকলেই পলায়ন করেছিল।... এই সময় শত্রুরা সুসংগঠিতভাবে আমাদের পার্শ্বভাগে আক্রমণ শুরু করল। আমাদের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করল।" (ফরেস্ট ঃ হিস্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউনিটি, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬১-৬২)। সুতরাং সুচতুর, সাহসী ও ক্রিমিয়ার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জেনারেলকেও সাত তাড়াতাড়ি রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া আজিমগড়ে পৌছিয়া হাঁফ ছাড়িতে হইল।

www.pathagar.com

লর্ড মার্কক যখন কাশী হইতে রাজাকে দমনার্থে আজিমগড়ের দিকে আসিতেছিলেন, ঠিক ওই সময়েই এলাহাবাদ হইতেও একই উদ্দেশ্যে আজিমগড়ের দিকে আর এক বাহিনীসহ আসিতেছিলেন জেনারেল স্যার এডওয়ার্ড লুগার্ড। সেই লুগার্ড ইতিমধ্যে কুমার সিংহের এলাকায় পৌঁছিয়া গিয়াছেন। দুই বাহিনীর সামনে শুধুমাত্র টন্স নদী। টন্স নদীর সেতু পার হইলেই জেনারেল লুগার্ড কুমার সিংহের বাহিনীকে বেকায়দায় ফেলিতে পারেন। রাজা কুমার সিং তাঁহার ৩০০ জন বাছাই করা সিপাহীকে সেই সেতুর কাছে সন্নিবেশিত করিলেন। তাহাদের নির্দেশ দেওয়া হইলঃ অন্তত কয়েক ঘন্টা যেন ইংরেজ বাহিনী ওই সেতু কিছুতেই পার হইতে না পারে। এই অবসরে রাজা তাঁহার বাদবাকী সিপাহীদল নিয়া নিরাপদ দূরত্বে চলিয়া যাইবেন।

"এই সিপাহীরা অত্যন্ত ঝানু সৈনিকের মতো অসীম দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে এই সেতুটি রক্ষা করেছিল। শুধু তখনই তারা এই সেতু ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল, যখন তারা জানল যে তাদের দলটি নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গিয়েছে।" (ম্যালিসন ঃ হিস্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৩০)।

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এই বৃদ্ধ বিপ্লবীকে দমন করার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিল। আরও বেশ কয়েকবার রাজা কুমার সিং ও তাঁহার বাহিনীকে ঘেরাও করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রতিবারই এই কাজে ব্যর্থ হয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। অবশেষে ১৮৫৮ সালের ২১শে এপ্রিল রাজা কুমার সিং তাঁহার বাহিনীসহ গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য, গঙ্গা পার হইয়া অযোধ্যার পানে অগ্রসর হইবেন। অযোধ্যা তখন গণ-সংগ্রামের বিস্ফোরণ ভূমি। খবরটি ইংরেজরাও পাইয়া গেল। ইংরেজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এই কাজটি যাহাতে রাজা কুমার সিং না করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে জেনারেল ডগলাসের নেতৃত্বে উন্মত্তের মত গঙ্গাতীরে ছুটিয়া আসিল ইংরেজ-বাহিনী। কিন্তু গঙ্গাতীরে পৌঁছিয়াই ইংরেজরা দেখিল, গঙ্গা পার হইয়া গিয়াছে সকলেই। শুধুমাত্র শেষ নৌকাটি গঙ্গার মাঝামাঝি রহিয়াছে। ওই নৌকায় ছিলেন বৃদ্ধ বিপ্লবী রাজা কুমার সিং স্বয়ং। গুলীগোলা ছুটিল। ইংরেজের একটি গুলী আসিয়া লাগিল রাজার হাতে। গুরুতরভাবে জখম হইলেন তিনি এবং প্রাণ বাঁচানোর জন্য ওই জখমী হাতটি কাটিয়া ফেলিবার প্রয়োজন দেখা দিল। নিজেরই তলোয়ার দিয়া রাজা কাটিয়া ফেলিলেন নিজের জখমী হাত। কাটা হাত বিসর্জিত হইল গঙ্গায়। ইংরেজরা রাজাকে ধরিতে পারিল না। কিন্তু অন্য ইংরেজ বাহিনী অযোধ্যার পথ আগলাইয়া রহিল।

www.pathagar.com

আট মাস ধরিয়া অনবরত যুদ্ধ করার পর এক হাজার সৈন্য এবং দুইটি কামানসহ ১৮৫৮ সালের ২২শে এপ্রিল রাজা কুমার সিং ফিরিয়া আসিলেন জন্মস্থান জগদীশপুরে। কিন্তু পরদিনই ইংরেজ বাহিনী জগদীশপুর আক্রমণ করিল। এইবার ইংরেজ-বাহিনীর নেতৃত্বে থাকিলেন আরার কমান্ডিং অফিসার লেগ্রান্ড। দুই ঘন্টা ধরিয়া চলিল মরণপণ সংগ্রাম। তারপর, হঠাৎ ইংরেজপক্ষীয়রা দেখিল, তাহারা ডান-বাম ও পশ্চাৎ দিক দিয়া অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং, এবারও ইংরেজবাহিনীর আশু কর্তব্য হইয়া উঠিল প্রাণপণে পলায়নের পথ পরিষ্কার করা। "যে যেদিকে পারল ঊর্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। কেউ কারও কথা শুনল না-সামরিক হুকুমে কেউ কান দিল না; লোকগুলি তখন হিংস্র উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করছে। এইভাবে খোলা রাস্তার উপর যখন তারা এসে পৌছল, তখন তাঁরা যেন সন্ন্যাস রোগে ধরাশায়ী হতে লাগল; তাদের শুশ্রুষার কোন উপায় ছিল না-ঐ অবস্থাতেই তাদের ফেলে রেখে আসতে হল।" (ফরেস্ট ঃ হিস্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭২)। কয়েকশত ইংরেজ সৈন্যের মধ্যে মাত্র ৮০ জন প্রাণসহ আরায় ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইল। আর এমনি পরাজয়ের লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল ইংরেজ-বীরত্ব।

এই বিজয়ের তিনদিন পর, ১৮৫৮ সালের ২৬শে এপ্রিল বৃদ্ধ রাজা কুমার সিং জগদীশপুরের নিজ প্রাসাদে সংগ্রামী জীবনের সমাপ্তি টানিয়া পরপারে চলিয়া গেলেন।

আশি বৎসরেরও বেশি বয়সের এই বিপ্লবী দেখাইয়া গেলেন, তদানীন্তন ভারতের ওই জাতীয় মহা-অভ্যুত্থানে এই দেশ হইতে ইংরেজদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিবার একমাত্র উপায় ছিল সুকৌশলে পরিচালিত গেরিলা যুদ্ধ-পদ্ধতি। কিন্তু সকল বিপ্লবী নেতাই সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই। দেশের লোক, লোকালয়, বন-জঙ্গল সবই ছিল অভ্যুত্থানের প্রবল সহায়ক। কাজেই, উন্নততর এনফিল্ড রাইফেল ও বড় বড় কামান সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীকে নাজেহাল ও পরাজিত করার জন্য অনুন্নত মাস্কেট বন্দুকের অধিকারী সিপাহীদের পক্ষে অতি-উপযোগী গেরিলাযুদ্ধের ক্ষেত্র ছিল প্রশস্ত ও উন্মুক্ত।

বিপ্লব সাফল্যের পথ দেখাইয়াছিলেন বৃদ্ধ রাজা কুমার সিং এবং বিপ্লব প্রচেষ্টা শেষে নিজ প্রাসাদ চূড়ায় উত্থিত জাতীয় অভ্যুত্থানের স্বাধীন পতাকা যখন বাতাসে দুলিতেছিল, তখনই পরপারের পথে পাড়ি জমাইলেন স্বাধীন আত্মার অধিকারী রাজা কুমার সিং, অশীতিপর এক বৃদ্ধ বিপ্লবী।

www.pathagar.com

এক প্রিয় গুপ্তচর

"পিঠা চাই, পিঠা। আঙ্গুর-কিস্‌মিসের পিঠা। মিষ্টি ফল।"

একজন গুপ্তচরের কাহিনী। কাহিনীকার '৯৩-হাইল্যান্ডার' ইংরেজ সৈন্যদলের একজন সার্জেন্ট- নাম ফরবেস-মিচেল। সিপাহীযুদ্ধের স্মৃতিকথায় সার্জেন্ট মিচেল বিবৃত কাহিনীটি তাহারই জবানীতে তুলিয়া ধরা হইল।

আঠার শ' আটান্ন। ফেব্রুয়ারীর শেষের দিক। লাখ্‌নৌ উদ্ধারের জন্য জমায়েত হইয়াছে বিভিন্ন সেনাদল। যুদ্ধের প্রথম দিকেই লাখ্‌নৌ এবং অযোধ্যার অন্যান্য ঘাঁটি বেগম হাসরত মহলের সিপাহীদের দখলে চলিয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের শেষের দিকে চলিয়াছে সে সবের পুনর্দখল। সমবেত শক্তির স্ফুরণের অপেক্ষায় উনাও-এর শিবিরে শিবিরে আমাদের সময় কাটিতেছে। একঘেয়ে সময়। মাঝে মাঝে দূরের কামান গর্জন শোনা যায়। আলমবাগে হাসরত মহলের সিপাহীরা জেনারেল আউটরামের সেনাদলকে আক্রমণ করে। গোলাগুলী ছোটে। তারই শব্দ। মাঝে মধ্যে কানপুরের ঘাট হইতেও শব্দ ভাসিয়া আসে। সেখানে কানপুর ঘাটে স্যার রবার্ট নেপিয়ারের লোকজন শিব ও কালী মন্দির উড়াইয়া দিতেছে।

আমাদের তখনও কোন কাজ নাই। কর্মহীন সময়াবসানের জন্য তাঁবুতে শুইয়া থাকি। ইংল্যাণ্ড হইতে সদ্য আনা পত্রিকা খুলিয়া পড়ি। প্রতিটি খবর, প্রতিটি লাইন। সেদিনও তাহাই পড়িতেছিলাম। শুনিতে পাইলাম ফেরিওয়ালার ডাক।

"পিঠা চাই, পিঠা। আঙ্গুর-কিস্‌মিসের পিঠা। মিষ্টি ফল।"

একঘেয়ে সময়ের মত রেশন-বাঁধা খাবারেও বিরক্তি ধরিয়াছিল। ফলওয়ালার ডাকে অনেকের মত উঠিয়া বসিলাম। বলা বাহুল্য, ফলওয়ালাকে বিফলে ফিরিতে হইল না। তাহার ফলের রস রেশন-নিয়মের শুষ্ক বিরক্তির মাঝে ব্যতিক্রমের আনন্দ বিতরণ করিয়া দিল। কি জানি কেন, ফলের মতই ফলওয়ালাকেও আমার ভাল লাগিয়া গেল। আর ভাল লাগিবার কথাও। সুদর্শন তরুণ ফলওয়ালা। প্রশস্ত ললাট, চোখাল নাক, উজ্জ্বল মুখ। সাদা পোষাকে সংযত সম্ভ্রম। দেখিলে কিছুতেই সাধারণ ফলওয়ালা বলিয়া মনে হয় না। তাহার ফলের ঝুড়ি বহন করিতেছিল একটি কুলি। কদাকার, ভীষণ চেহারার একটি লোক। লোমশ হাত দেখিলে মনে হয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ। চোখে মুখে বন্য হিংস্রতার আভাস। এই কুলির পাশে ফলওয়ালাকে আরও সুন্দর, আরও বুনিয়াদি দেখাইতেছিল। কিন্তু যতই ভাল লাগুক, আর ফল যতই সরস হোক, ফলওয়ালার

www.pathagar.com

কাছে সেনা-শিবিরে ঢুকিবার হুকুমনামা চাহিতে ভুলি নাই। হুকুমনামা নিয়াই সে আসিয়াছে। ব্রিগেডিয়ার আড্রিয়ান হোপের দস্তখতী হুকুমনামা। ব্রিগেডিয়ার হোপ জেমিগ্রিনকে সব কয়টি শিবিরে যাতায়াতের অবাধ অধিকার দিয়াছেন। লোকটির নাম জেমিগ্রিন।

শুধু যে জেমিগ্রিনের চেহারাই আমার ভাল লাগিয়াছিল, তা-ই নয়। জেমিগ্রিনের বিশুদ্ধ ও সাবলীল ইংরেজী আমাকে অবাক করিয়া দিয়াছিল। সাগ্রহে সে আমার হাতের ইংরেজী পত্রিকা নিয়া পড়িল। দেখিল সিপাহীযুদ্ধ সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের পত্রিকা কি লিখিয়াছে। তারপর নবাগত ইংরেজ সৈন্যরা এখানকার আবহাওয়া কি রকম সহ্য করিতে পারে, লাখ্‌নৌ পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদের রণসজ্জা কতটুকু ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় আমার সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনা করিল। আমার প্রশ্নের জওয়াবে সে জানাইল যে, তাহার পিতা এক ইউরোপীয় সেনাদলের মেস-খানসামা ছিল। ছেলেবেলা হইতেই জেমিগ্রিন রেজিমেন্টের স্কুলে পড়াশুনা করিয়াছে, ইংরেজদের সঙ্গে মিশিয়াছে। এসবই রহিয়াছে তাহার ইংরেজী জানার মূলে। জেমিগ্রিনের সঙ্গে অল্পেতেই আমার ভাব জমিয়া গেল। অদূরে ফলের দাম নিয়া জেমিগ্রিনের কুলির সঙ্গে জনকয়েক ইংরেজ সৈন্যের বচসা হইতেছিল। ফল নিয়া দাম না দেওয়ার তালে ছিল কেউ কেউ। জেমিগ্রিনের কুলির কদর্য চেহারার প্রতি ইঙ্গিত করায় জেমিগ্রিন রসিকতা করিয়া বলিল-

'ও একজন আইরিশ। হ্যাঁ। নাম মিকি। মানে ওর মা এক আইরিশ সেনাদলের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। বলিতে গেলে সেই সেনাদলের সবাই মিকির খুব আপন জন। সে যাক, এটা নেহায়েতই ঠাট্টা। তবে ফল খাইয়া দাম না দেওয়া বোধ হয় হাইল্যাণ্ডের ঠাট্টা, কি বলেন?'

আমাদের সকলের হাসিতে তাহার হাসি মিশিয়া গেল।

ইহার পর ফলের দাম কোন ইংরেজ সেনাই বাকী রাখে নাই। এইভাবে হাসি-খুশীর মধ্যেই জেমিগ্রিনের সঙ্গে হইল আমার প্রথম পরিচয়, প্রথম সাক্ষাৎ।

কিন্তু দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ না হইলেই হয়তো ভাল ছিল। ভাল লাগার সঙ্গে কল্পনার অতিরঞ্জন মিশিয়া থাকে। একটু অপ্রত্যাশিত আঘাতেই সে কল্পনা ভাঙ্গিয়া যায়। জেমিগ্রিন আমার কাছ হইতে বিদায় নেওয়ার পরপরই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। ঘনাইয়া আসিল আঁধারঘেরা মৃত্যু-বিভীষিকা। জীবনের আলো-কে গ্রাস করিতে আসিল মৃত্যুর অন্ধকার। এই অন্ধকারের বুকে কৌশলী চিতার মত ওঁৎ পাতিয়া থাকিবে মানুষ, মানুষেরই প্রাণ হননের জন্য। ধূর্ত শৃগালের

www.pathagar.com

নিঃশব্দ চলার মত গুপ্তচরের অভিযান চলিবে এক সেনা-শিবির হইতে অন্য সেনা-শিবিরে। বাতাসে ভাসিয়া আসিবে খবর-সন্ধানী গুপ্তচরের গায়ের গন্ধ। শিবিরের অন্ধকারে উৎকর্ণ হইয়া উঠিবে সজাগ প্রহরী। তারপর আঁধার রাত্রির একটানা পথচলা, গভীর হইতে আরও গভীরে। হয়তো তখনই ক্রুদ্ধ পশুর মত গর্জন করিয়া উঠিবে কোনও শিবিরের কামান। দূর পল্লীর কোনও নীরব কুটিরে মায়ের বুক জড়াইয়া ধরিবে কোন নিষ্পাপ শিশু!... যাক, যে-সন্ধ্যার কথা বলিতেছি, সে-সন্ধ্যায় আমাদের সেনা-শিবিরের পাহারার দায়িত্বে ছিলাম আমি। সন্ধ্যার পর একজন সৈনিক আসিয়া আমাকে জানাইল যে, আঙ্গুর-কিস্‌মিসের পিঠাওয়ালা লাখ্‌নৌর একজন চর বলিয়া ধৃত হইয়াছে। এখন রাত্রি হওয়াতে তাহার ফাঁসি হইবে না। তাহাকে আমার তত্ত্বাবধানে রাখা হইবে। শিবিরে পাহারা দেবার জন্য অতিরিক্ত প্রহরীও থাকিবে।

এই সংবাদে আমি যে খুবই দুঃখিত হইয়াছিলাম, তাহা বলাই বাহুল্য। যদিও চরেরা সব সময়ই সেনাদলের মধ্যে অত্যন্ত ঘৃণা ও বিরক্তি জন্মাইয়া থাকে, এবং যদিও তাহাদের প্রতি কাহারও দয়া প্রকাশ হয় না, তবুও ওই ব্যক্তিটির প্রতি আমার খুবই মমত্ববোধ জন্মিয়াছিল। অল্পক্ষণের আলাপেই আমি তাহার ক্ষমতা বুঝিয়াছিলাম। এইরূপ সৌম্য দর্শন ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি কিরূপে সামান্য অনুচর বা পরিচারকের মত নিম্ন শ্রেণীর করণীয় কার্যভার গ্রহণ করিল, আমি তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। এখন বুঝিতে পারিতেছি, চর বলিয়াই এই ব্যক্তি উক্তরূপ সামান্য বেশে আসিয়াছিল।...

এখন আমার কথা বলিতেছি। জেমিগ্রিন চর বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। এই সংবাদ শুনিবার পরক্ষণেই কতিপয় সৈনিক তাহাকে আমাদের তাঁবুতে আনিয়া আমার হাতে সমর্পণ করিয়া ভোর হওয়া পর্যন্ত সাবধানে রাখিতে বলিয়া গেল। তাহার সঙ্গে পিঠার ঝুড়ির সেই বাহকও ছিল। সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, যেসব লোক ১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে কানপুরে ইউরোপীয় নরনারীদিগকে বধ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এই ব্যক্তিও (মিকি) ছিল। -- আমি যখন কয়েদী দুইজনের প্রহরার ভার গ্রহণ করিলাম, তখনই কতিপয় প্রহরী তাহাদের জাতিনাশের জন্য বাজার হইতে শুকর-মাংস আনিবার প্রস্তাব করিল। তখন ফাঁসি দিবার পূর্বে এইভাবে প্রতিশোধ লওয়া হইত। আমি এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী হইলাম, এবং স্পষ্টভাবে বলিলাম, আমি যে পর্যন্ত প্রহরার দায়িত্বে থাকিব সে পর্যন্ত কিছুতেই ইহা করিতে দিব না। অপর প্রহরীদিগকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিলাম যে, যদি কয়েদীদের ধর্মনাশের জন্য কেহ কোনরূপ চেষ্টা করে, তবে

www.pathagar.com

তাহার সৈনিক চিহ্নের পরিচয় সূচক কোমরবন্ধ খুলিয়া নেওয়া হইবে।– যে হতভাগ্য নিজেকে জেমিগ্রিন বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, আমার এই আদেশ শুনিয়া তাহার মুখমণ্ডলে যেরূপ কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইল, তাহা আমি কখনই বিস্মৃত হইব না। জেমিগ্রিন বলিল যে, আমার নিকট এমন ব্যবহার সে কখনো প্রত্যাশা করে নাই। এর জন্য সে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ যুদ্ধের সময়ে আমাকে যাবতীয় বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবেন।

আমি কয়েদীকে ধন্যবাদ দিলাম, এবং রাতের উপাসনার জন্য তাহার হাতের বন্ধন খুলিয়া দিলাম।– আমি নিদ্রাহীন রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া রেজিমেন্টের বাজার হইতে একজন মুসলমানকে আনাইয়া আমার খরচায় কয়েদীদের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে বলিলাম। ইহাতে মুসলমান দোকানদার দাবী জানাইল, 'আপনি যখন মুসলমানের এমনি শোচনীয় অবস্থার সময়ে তাহার প্রতি এত মেহেরবানী দেখাইয়াছেন, তখন যদি আপনি এর জন্য আমাদের একটি পয়সাও ব্যয় করিতে অনুমতি না দেন, তবে আমাদের স্বধর্মের সম্মান হানি হইবে।'

বাজার হইতে খাদ্য আসিল। জেমিগ্রিন আহারান্তে একখানি মাদুরের উপর বসিয়া হুকা টানিতে টানিতে বলিল, আল্লাহ্‌কে হাজার শোকর, তিনি আমাকে জীবনের এই শেষ রাত্রিতে এমন দয়াশীল সাহেবের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছেন!

তারপর সে আমাকে বলিল, 'আপনি আমাকে আমার জীবনের ঘটনা বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই কথা ঠিক যে আমি একজন চর। কিন্তু চর বলিতে সচরাচর যাহা বুঝায়, আমি কখনো সে-শ্রেণীর লোক নই। লাখ্‌নৌর বেগম সাহেবার সেনাদলের একজন কর্মচারী আমি, লাখ্‌নৌ সেনাবাহিনীর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার। আমাদের বিরুদ্ধে যে সৈন্য ও কামানাদি যাইতেছে, সে সবের শক্তি সম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ জানিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছিলাম। কিন্তু ভাগ্য আমার কার্য সিদ্ধ হইতে দিল না। ইচ্ছা করিয়াছিলাম, আজ সন্ধ্যায় লাখ্‌নৌ ফিরিয়া যাইব। অদৃষ্ট যদি প্রসন্ন হইত, তা' হইলে কাল সূর্যোদয়ের পূর্বেই সেখানে পৌঁছিতে পারিতাম। যাবতীয় অভীষ্ট বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু উনাও লাখ্‌নৌর পথে থাকায় আপনাদের কামান ও বারুদ-গোলাগুলী প্রভৃতি লাখ্‌নৌতে যাইতেছে কিনা দেখিবার জন্য আর একবার এই স্থানে আসিয়াছিলাম। কিন্তু একটি দেশীয় লোক আমাকে চর বলিয়া ধরাইয়া দিয়াছে। এই পাষণ্ড ফাঁসির কাঠ হইতে নিজের গলা বাঁচাইবার জন্য এইরূপে তাহার স্বদেশবাসীর জীবন

www.pathagar.com

নাশের কারণ হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য, সেই ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে নিজ বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার পাইবে। (যে ব্যক্তি জেমিগ্রিনকে চর বলিয়া ধরাইয়া দেয়, বেরিলির বিপ্লবকালে সে নিজ প্রতিপালক ইউরোপীয়কে বধ করে। এই অপরাধে পরবর্তী মে মাসে তাহার ফাঁসি হয়।)

'আপনি আমার নাম জানিতে চাহিয়াছেন। আমার দুর্ভাগ্যের বিবরণ স্কটল্যাণ্ডে আপনার বন্ধুদের নিকট লিখিয়া পাঠাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমার নাম ইত্যাদি বলিতে কোন আপত্তি নাই। ইংল্যাণ্ডের লোক– ইংল্যাণ্ড বলিতে আমি স্কটল্যাণ্ড সমেত বুঝাইতেছি– ন্যায়পর। আল্লাহ্‌র এই বান্দার অদৃষ্টে তাহাদের কেউ কেউ দুঃখিত হইতে পারেন। আমি দুইবার লণ্ডন ও এডিনবরা দেখিয়াছি। এই দুইস্থানে আমার অনেক বন্ধু আছেন। আমার নাম মুহাম্মদ আলি খান। রোহিলাখণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত বংশে আমার জন্ম। বেরিলি কলেজে আমার শিক্ষা লাভ। আমি সেখানে যাবতীয় ইংরেজী বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছি। বেরিলি কলেজ হইতে রুড়কি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঢুকিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিয়াছি। এই কলেজের শেষ পরীক্ষায় সৈনিক এবং সাধারণ বিভাগের কর্মপ্রার্থী সমুদয় ইউরোপীয় ছাত্র অপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়াছি। কিন্তু ইহার ফল কি হইয়াছে? আমি কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে জমাদারের কাজ পাইয়াছি। একজন ইউরোপীয় আমার উপর কর্তৃত্ব করিয়াছে। বোধ হয়, কেবল পাশবিক শক্তি ছাড়া ওই ইউরোপীয় সর্ব প্রকারে আমার তুলনায় অপকৃষ্ট। ইংল্যাণ্ডে ওই ব্যক্তি কখনো উচ্চপদ লাভ করিতে পারিত না। মূর্খের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ ওই ব্যক্তি ইউরোপীয়দের সাধারণ দোষ– ঔদ্ধত্য, গর্ব ও স্বার্থপরতার এমন পরিচয় দিত যে, উহাতে আমরা উত্তেজিত ও বিরক্ত হইতাম। এইরূপ লোকের দ্বারা আপনাদের জাতীয় প্রতিপত্তির কতদূর ক্ষতি হইতেছে, আমাদের ভাষায় না জানিলে এবং আমাদের দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে না মিশিলে, তাহা আপনারা কখনো জানিতে পারিবেন না। আপনাদের জাতীয় স্বার্থপরতা এবং দাম্ভিকতা সম্বন্ধে আপনাদের শত্রুরা যাহা বলিয়া থাকে তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এইরূপ একটি দৃষ্টান্তই পর্যাপ্ত। ইহাতে লোকে আপনাদের উদারতা এবং সমবেদনা কেবল ভণ্ডামি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে।– আমি পিতাকে এ বিষয়ে জানাইয়া তাঁহার নিকটে চাকুরি ছাড়িয়া দিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তিনি এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, রাজবংশীয়গণ এইভাবে কোম্পানীর চাকুরি করিতে পারেন না। আমি অযোধ্যার নবাব নাসীরুদ্দিনের সরকারে কাজ করিবার ইচ্ছা করিয়া চাকুরি

www.pathagar.com

ছাড়িয়া বাড়ি গেলাম। যখন আমি লাখ্‌নৌতে হাজির হই, তখন নেপালের জং বাহাদুর ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার একজন ইংরেজী জানা সেক্রেটারীর প্রয়োজন ছিল। আমি অবিলম্বে ওই পদের জন্য আবেদন করিলাম। অনেক রাজা ও ইংরেজ রাজকর্মচারী আমার আবেদনের সমর্থন করিলেন। মহারাজার সেক্রেটারী হইয়া আমি তাঁহার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে উপনীত হইলাম। অন্যান্য স্থানের মধ্যে এডিনবরায়ও গিয়াছিলাম আমরা। সেসময়ে মহারাজার সম্মানার্থে আপনাদের এই '৯৩ হাইল্যাণ্ডার রেজিমেন্ট' সামরিক বেশে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। যখন আমরা হাইল্যাণ্ডের পরিচ্ছদধারী এই রেজিমেন্ট পরিদর্শন করিলাম, তখন ভাবি নাই যে, হিন্দুস্তানের সমতলে ইহাদেরই শিবিরে একদিন আমি বন্দী হইব।—

'ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া আমি ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত স্বদেশের ভিন্ন ভিন্ন রাজ-দরবারে চাকুরী করি। ১৮৫৪ সালেই আজিমুল্লা'র সঙ্গে আবার আমি ইংল্যাণ্ডে যাই। উপস্থিত বিপ্লব প্রসঙ্গে আপনি নিশ্চয়ই আজিমুল্লা'র নাম শুনিয়াছেন। পেশোয়া'র দেহত্যাগের পর নানাসাহেব আজিমুল্লা'কে নিজের এজেন্ট নিযুক্ত করেন। আমার মত আজিমুল্লাহ্ খানও কানপুরের গভর্নমেন্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক গঙ্গাদীনের প্রদত্ত শিক্ষাগুণে ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, যদি তিনি ইংল্যাণ্ডে যাইতে পারেন, তবে নানাসাহেবের বিরুদ্ধে লর্ড ডালহৌসীর গৃহীত ব্যবস্থাকে উল্টাইয়া দিতে পারিবেন। আজিমুল্লাহ্ খান সর্বোৎকৃষ্ট আইনজীবীদের নিযুক্ত করিবার জন্য এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবশ্যকীয় অর্থসহ ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করেন। আপনি হয়তো জানেন, লণ্ডনের সমাজে তিনি সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজনীতি সংক্রান্ত কাজে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। পাঁচ লক্ষ টাকারও অধিক ব্যয় করিয়া আমরা ১৮৫৫ সালে কনষ্টান্টিনোপল দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার জন্য ইংল্যাণ্ড পরিত্যাগ করি। কনষ্টান্টিনোপল হইতে আমরা ক্রিমিয়া দেখিতে যাই। এই স্থানে ১৮ই জুন ইংরেজ সৈন্যের আক্রমণ এবং পরাজয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সেবাস্তোপলের পুরোভাগে উভয় সৈন্যদলের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে আমাদের মানসিক ভাবের পরিবর্তন ঘটে। ফিরিয়া আসি আমরা কনষ্টান্টিনোপলে। এইস্থানে কতিপয় ব্যক্তির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। ইহারা রুশীয় রাজকর্মচারী বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহারা আজিমুল্লাহ্‌কে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যদি ভারতবর্ষে বিদ্রোহ ঘটাইতে পারেন, তবে তাঁহারা কার্যতঃ যথোচিত সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। এই সময়ে আমি এবং আজিমুল্লাহ্ খান কোম্পানীর গভর্নমেন্টের বিপর্যয়

www.pathagar.com

সাধনে কৃতসংকল্প হই। আল্লাহ্‌কে অশেষ শোকর, আমরা এ বিষয়ে কৃতকার্য হইয়াছি। আপনি আমাকে যেসব সংবাদপত্র দিয়াছেন, তাহাতে দেখিলাম যে, কোম্পানীর রাজত্ব গিয়াছে। তাহাদিগকে আর পরস্বাপহরণ বা পররাজ্য অধিকারের জন্য সনদ দেওয়া হইবে না। যদিও আমরা এই দেশ ইংরেজের হাত হইতে কাড়িয়া নিতে পারিলাম না, তথাপি আমরা কিয়দংশে ভাল কাজ করিলাম। আমাদের জীবনেরও বৃথা উৎসর্গ হইল না; যেহেতু আমার বিশ্বাস যে, এদেশের শাসনকার্য সরাসরি পার্লামেন্টের অধীন হইলে উহা কোম্পানীর অধিকারে যেমন ছিল, তদপেক্ষা অধিকতর ন্যায়ানুগ হইবে। এবং আমি দেখিয়া যাইতে না পারিলেও আমার বিশ্বাস যে, আমার নিপীড়িত ও পদদলিত স্বদেশীয়গণ ভবিষ্যতে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

'সাহেব! আপনাকে তোষামোদ বা আপনার অনুগ্রহ লাভের জন্য বলিতেছি না। আমি আপনার যথোচিত অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। আমি জানি যে, আপনি ইহা অপেক্ষা আমার আর অধিক কিছু সাহায্য করিতে পারিবেন না। করিবার ইচ্ছা থাকিলেও আপনার কর্তব্য জ্ঞান তাহা করিতে দিবে না। আমাকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। আপনি আমার প্রতি যেরূপ অচিন্ত্যপূর্ব দয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেই আমার মনের কথা আপনাকে খুলিয়া বলিলাম। আমার হৃদয়ে আপনাদের প্রতি ঘৃণার ভাব নিহিত আছে। আমার মুখে, আপনার প্রতি প্রয়োগ করা যায়, এরূপ কঠোর কথাও রহিয়াছে। এই মনোভাবসহই আমি আপনাদের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার মত হতভাগ্যের প্রতি আপনার দয়া দেখিয়া, লাখ্‌নৌ পরিত্যাগের পর এই দ্বিতীয়বার আমি উপস্থিত বিপ্লবঘটিত অত্যাচারের জন্য লজ্জাবোধ করিতেছি। কয়েকদিন পূর্বে কানপুরে থাকিতে একটি ঘটনায় প্রথমবার আমার লজ্জার উদ্রেক হইয়াছিল। কর্নেল নেপিয়ার যখন কানপুরের ঘাটে কয়েকটি হিন্দু দেব-মন্দির কামানে উড়াইয়া দিতে উদ্যত হন, তখন পাণ্ডারা তাঁহার নিকটে গিয়া মন্দির রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনার উত্তরে কর্নেল নেপিয়ার তাহাদিগকে বলেন,-'এখানে যখন আমাদের কুলনারিগণ, আমাদের বালক-বালিকাগণ নিহত হয়, তখন আপনারা সকলেই এখানে ছিলেন। আপনারা জানেন যে, নৌসেতু নিরাপদে রাখিবার জন্য মন্দিরগুলি আমরা বিনষ্ট করিতেছি। কিন্তু আপনাদের মধ্যে যদি কেহ এরূপ প্রমাণ দিতে পারেন যে, তিনি একটি খৃষ্টধর্মাবলম্বী পুরুষ স্ত্রী বা শিশু সন্তানের সম্বন্ধে কিয়দংশ দয়ার কাজ করিয়াছেন, অন্ততঃ তিনি যদি এরূপও প্রমাণ দেখাইতে পারেন যে, ইহাদের জীবন রক্ষার জন্য একটি কথাও বলিয়াছেন, আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি- তিনি যে স্থানে

www.pathagar.com

দেবারাধনা করেন, আমি সেই স্থান যথাযথ রাখিয়া দিব।' আমি ওই সময়ে জনতার মধ্যে কর্নেল নেপিয়ারের নিকট দণ্ডায়মান ছিলাম। কর্নেল নেপিয়ার চমৎকার কথা বলিয়াছিলেন। কেহ এই কথার উত্তর দিল না। ব্রাহ্মণেরা নীরবে চলিয়া গেল। কর্নেল নেপিয়ার ইঙ্গিত করিলেন। মুহূর্ত মধ্যে মন্দিরগুলি বায়ুস্তরের মধ্যে উড়িয়া গেল। নেপিয়ারের ন্যায়-সঙ্গত কথায় আমি লজ্জাভারে অধোবদন হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।'

এই কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,-'যখন বিদ্রোহ ঘটে, তখন আপনি কানপুরে ছিলেন কি না?' মুহাম্মদ আলি খান উত্তর করিলেন,-'না। আল্লাহ্‌কে শোকর, তখন আমি রোহিলাখণ্ডে নিজের বাড়িতে ছিলাম। মিঃ মিচেল, আমি কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু নিপাত করিয়াছি। অন্যভাবে কাহারও শোণিতে আমার হাত কলংকিত হয় নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, ঝড়ের সঞ্চার হইয়াছে। সুতরাং স্ত্রী ও সন্তানদিগকে নিরাপদে রাখিবার জন্য বাড়ি গিয়াছিলাম। যখন আমি বাড়িতে ছিলাম, তখন মিরাট ও বেরিলির বিপ্লবের কথা আমার শ্রুতিগোচর হয়। আমি অবিলম্বে বেরিলিতে গিয়া সেখানকার সৈনিকদলের সহিত মিলিত হই, এবং তাহাদের সহিত দিল্লীতে পদার্পণ করি। দিল্লীতে আমি প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কাজে নিয়োজিত হইয়া নগর রক্ষার জন্য যাবতীয় বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজরা নগর অধিকার করে। ঐ পর্যন্ত আমি দিল্লীতেই থাকি, পরে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন সিপাহীদিগের মধ্যে যাহাদিগকে একত্র করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাদিগকে লইয়া লাখ্‌নৌ যাত্রা করি। লাখ্‌নৌতে উপস্থিত হইলে আমাকে প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কাজ দেওয়া হয়। নভেম্বর মাসে যখন আপনাদের সৈন্যেরা রেসিডেন্সির উদ্ধারের জন্য উপস্থিত হয়, তখন আমি লাখ্‌নৌতে ছিলাম। সেকান্দারবাগের ভয়ঙ্কর নরহত্যা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যেদিন উহা আক্রান্ত হয়, তাহার পূর্ব রাত্রিতে আমি উহার রক্ষার জন্য যাবতীয় বিষয়ের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলাম। লাখ্‌নৌর সর্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত সৈনিকদিগের মধ্যে তিন হাজারের অধিক লোককে সেকান্দারবাগ রক্ষার জন্য সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম। ইহাদের একটিও রক্ষা পায় নাই। পূর্ব রাত্রিতে যখন আমার স্থাপিত দণ্ড হইতে আমাদের সবুজ পতাকা তুলিয়া আপনাদের হাইল্যাণ্ডের পতাকা বসানো হয়, তদ্দর্শনে তখন আমি মূর্চ্ছিতপ্রায়! বুঝিয়াছিলাম, আমাদের সমস্তই শেষ হইতে চলিল। সেকান্দারবাগে গোলাবর্ষণের জন্য শাহ্ নযীফে কামান সন্নিবেশ করিয়াছিলাম। এই সময় হইতে আমি লাখ্‌নৌ শহরে এবং তাহার চারিদিকে যেভাবে প্রাচীর প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা নির্দিষ্ট করি, এবং সেসবের নির্মাণ কাজে

www.pathagar.com

ব্যাপৃত থাকি। আপনি লাখ্‌নৌ গেলে উহা দেখিতে পাইবেন। যদি সিপাহীরা এবং গোলন্দাজগণ উহার পশ্চাতে দৃঢ়তা সহকারে দণ্ডায়মান থাকে, তাহা হইলে এইবার লাখ্‌নৌ অধিকারের জন্য আপনাদের অনেক সৈন্য হারাইতে হইবে।'—

বন্দীর সঙ্গে এমনি কথোপকথনে রাত্রি অতিবাহিত হইল। আমি বন্দীকে প্রাতঃকালের উপাসনা সমাপন করিতে দিলাম। উপাসনা শেষ করিয়া, তিনি এইরূপ দয়া প্রদর্শনের জন্য আবার আমাকে ধন্যবাদ দিলেন।

মুহাম্মদ আলি খান জানিতেন তাঁহার দণ্ডের কথা। কিন্তু এইজন্য তাঁহার কোন কাতরতা আমার চোখে পড়ে নাই। শুধু একবার, যখন তিনি বলিলেন যে তাঁহার স্ত্রী ও দুইটি পুত্র রোহিলাখন্ডের বাড়িতে আছে, কেবল তখন একবার মাত্র তাঁহার দৃঢ়তার পরিবর্তে দুর্বলতা দেখা গিয়াছিল। পরক্ষণেই তিনি এই ভাব গোপন করিয়া বলিলেন,– 'আমি ইংল্যান্ডের ইতিহাসের সঙ্গে ফরাসীদেশের ইতিহাসও পড়িয়াছি। দাঁতুনের বিষয় আমার মনে আছে। কোন দুর্বলতা আমি দেখাইব না।'

তারপর নিজের কেশগুচ্ছে লুক্কায়িত একটি স্বর্ণাঙ্গুরীয় বাহির করিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তিনি আমাকে দিতে চাহিলেন। বলিলেন, 'এখন কেবল আমার এই একটিমাত্র জিনিস আছে। ধরা পড়িবার সময় অন্যান্য জিনিস আমার নিকট হইতে নিয়া যাওয়া হইয়াছে। এই জিনিসটি অতি সামান্য। মূল্য দশ টাকার বেশি হইবে না। কিন্তু কনষ্টান্টিনোপলের এক সাধু পুরুষ আমাকে এই অঙ্গুরীয় দিয়া বলিয়াছিলেন, ইহা ধারণ করিলে যাবতীয় বিপদ হইতে ত্রাণ পাওয়া যাইবে।' অঙ্গুরীয়টি আমি গ্রহণ করিলাম। পবিত্র কালাম উচ্চারণ করিয়া উহা আমার আঙ্গুলে পরাইয়া দিয়া মুহাম্মদ আলি খান বলিলেন,– 'যখন আপনি লাখ্‌নৌতে থাকিবেন, তখনই এই অঙ্গুরীয়টি দেখিবেন, আর স্মরণ করিবেন মুহাম্মদ আলি খানের নাম! কোনরূপ অনিষ্ট আপনার ঘটিবে না।'

* * * *

এগারোই মার্চ লাখ্‌নৌর বেগম–কুঠি আক্রমণকালে আমি মুহাম্মদ আলি খানকে স্মরণ করিয়াছিলাম। হাতের আঙ্গুলের দিকে তাকাইয়া দেখিয়াছিলাম তাঁহার পরাইয়া দেওয়া সেই অঙ্গুরীয়টি। যুদ্ধের সময়ে আমার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে নাই। —

বিপ্লবের সময়ে অনেকেই অনেক মূল্যবান দ্রব্য লুটিয়া লইয়াছিল। আমি কিছু স্পর্শ করি নাই। কেবল এই অঙ্গুরীয়টি মাত্র আমার হাতের আঙ্গুলে শোভা পাইতেছিল!

www.pathagar.com

বীরের কৌশল

দুই-দুইবার ব্যর্থ মনোরথ হইলেন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান সেনাপতি স্যার কলিন ক্যাম্পবেল। দুই-দুইবার তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিলেন সিপাহী বিপ্লবের প্রধান নায়ক শাহ্ আহ্মদুল্লাহ্ সুফী। স্যার কলিন সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াও শাহ্ সাহেবকে হাতের মুঠায় পাইলেন না।

আঠার শ' আটান্ন সালের এপ্রিল মাস। শাহ্জাহানপুরে জমায়েত রহিয়াছেন বিপ্লবী নায়ক শাহ্ আহ্মদুল্লাহ্ সুফী, নানাসাহেব ও আরও কয়েকজন। স্যার কলিনের ইচ্ছা শাহ্ আহমদুল্লা'কে পরাজিত করা। সম্ভব হইলে তাঁহাকে বন্দী করা। তদনুযায়ী তিনি আক্রমণের পরিকল্পনা করিলেন। চারিদিক হইতে শাহ্জাহানপুর ও বেরিলিতে আক্রমণ কেন্দ্রভূত করিতে সেনানায়কদিগকে হুকুম দিলেন। কিন্তু ৩০ শে এপ্রিল সেনানায়ক ওয়ালপোল ও সেনাপতি স্যার কলিন নিজে শাহ্জাহানপুর পৌঁছিয়া দেখিলেন, শাহ্জাহানপুর সিপাহীশূন্য! স্যার কলিনের রচিত ব্যূহ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন বিপ্লবী নেতা শাহ্ আহ্মদুল্লাহ্। বোকা সাজিয়া গেলেন কোম্পানীর প্রধান সেনাপতি। এই প্রথম বার প্রধান সেনাপতি যুদ্ধ কৌশলে হারিয়া গেলেন। অতঃপর কর্ণেল হেইলকে শাহ্জাহানপুরে রাখিয়া স্যার কলিন বেরিলির দিকে অগ্রসর হইলেন। রোহিলানায়ক খান বাহাদুর খান বেরিলিতে অবস্থান করিতেছিলেন। বেরিলি অধিকার করা এখন স্যার কলিনের অবশ্য করণীয় হইয়া উঠিল। কিন্তু বাহাদুর খানও তাঁহাকে হতাশ করিয়া চলিয়া গেলেন।

৭ই মে জনশূন্য নগরীর অধিকার লাভ করিলেন স্যার কলিন। কিন্তু সেইদিনই খবর পাইলেন যে কর্ণেল হেইল শাহ্জাহানপুরে আক্রান্ত হইয়াছেন। আক্রমণ করিয়াছেন শাহ্ আহ্মদুল্লাহ্। কর্ণেল সমস্ত নগরীর অধিকার হারাইয়াছেন। আর অবরুদ্ধ অবস্থায় সাহায্যের আশায় সময় কাটাইতেছেন। দ্বিতীয়বারের মত তিনি স্থির করিলেন, চারিদিক হইতে শাহ্জাহানপুর আক্রমণ করিতে হইবে। ভাগ্যক্রমে সেইদিনই তিনি রুড়কিস্থিত ব্রিগেডিয়ার জোন্সের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন। ব্যূহ রচনা করিয়া আবার তাঁহারা অগ্রসর হইলেন শাহ্জাহানপুরের দিকে। যাহাতে শাহ্ আহ্মদুল্লাহ্ তাঁহাকে ফাঁকি দিতে না পারেন, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিলেন। তিনি জানিতেন, এই শাহ্ সাহেবকে ধরিতে পারিলেই বিপ্লবের অবসান হইবে।

কিন্তু শাহ্ সাহেব অশ্বারোহী সৈন্যে অধিকতর বলশালী ছিলেন। তাঁহার

www.pathagar.com

পরাজয় সুসাধ্য ছিল না। ইতিপূর্বে ভয় পাইয়া কর্ণেল হেইল নগর ছাড়িয়া সমস্ত সৈন্যসহ জেলখানায় আশ্রয় নিয়াছিলেন। আর শাহ্ আহমদুল্লাহ্ নগরের ধনী অধিবাসীদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তদুপরি নানা স্থান হইতে তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য আসিতে লাগিল। শাহ্জাদা ফিরোজ শাহ্ আসিলেন, আসিলেন অযোধ্যার বেগম হাসরাত মহল। নানাসাহেবের সৈন্য আসিয়াও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিল।

অপর পক্ষেও বিপুল রণসজ্জা। তবে তখনও প্রধান সেনাপতি আসিয়া পৌছান নাই। ১৫ই মে শাহ্ আহ্মদুল্লাহ্ ইংরেজ সৈন্যকে আক্রমণ করিলেন। সমস্ত দিন যুদ্ধ হইল। কিন্তু জয় পরাজয় স্থির হইল না। তখন প্রধান সেনাপতি আসিয়া পৌছিয়াছেন। পান্হাট নামক স্থানের যুদ্ধে বিপ্লবীদল যথোচিত সাহস ও বীরত্ব দেখাইল। কিন্তু ইংরেজ সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করা গেল না। ফলে হটিয়া আসিলেন শাহ্ আহ্মদুল্লাহ্। ইংরেজ সৈন্যও তাহাদের প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করিতে আর অগ্রসর হইল না।

আরও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া স্যার কলিন ২৪ শে মে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তখন বিপ্লবীরা ছিলেন মোহাম্দীতে। তাঁহাদের অশ্বারোহীরা ইংরেজের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল। শাহ্ আহ্মদুল্লাহ্ এখানেই স্যার কলিনের বিপুল মিলিত বাহিনীর মোকাবিলা করিয়া এই বিপ্লবের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার নীতি গ্রহণ করিলেন না। তিনি জানিতেন, এই কাজ বর্তমান পর্যায়ে ফলপ্রসূ হইবে না। তাই তিনি অশ্বারোহীদের আড়াল রচনা করিয়া শাহ্জাহানপুরের দুর্গ নষ্ট করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। এমনটি হইতে পারে, তাহা স্যার কলিন ধারণা করিতে পারেন নাই। কাজেই দ্বিতীয়বারও স্যার কলিন শাহ্ আহ্মদুল্লা'র কাছে যুদ্ধ কৌশলে ঠকিয়া গেলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই নেতাটিকে দমন করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইবে না।

দুই-দুইবার এমনিভাবে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া স্যার কলিন ক্যাম্পবেল চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। শাহ্ আহ্মদুল্লা'কে জানিতে তাঁহার বাকী রহিল না। বিপ্লবী অযোধ্যায় কি তিনি শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইবেন? উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের এই অংশ কি কোম্পানী-অধিকারের বাহিরেই থাকিয়া যাইবে? বিপ্লবের অন্যান্য নায়কদের সম্বন্ধে তিনি মোটেই চিন্তা করেন না। তিনি জানেন, এইসব নায়কেরা অনেকেই স্বার্থ বশে কোম্পানীর বিরোধিতা করিতেছেন। কিন্তু শাহ্ আহ্মদুল্লাহ্ সুফী সম্পর্কে এই কথা খাটে না। বিদেশীর হাত হইতে দেশের আযাদী রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত এই শাহ্ সাহেব। দেশের স্বার্থই তাঁহার কাছে বড়। তাই

www.pathagar.com

শাহ্ সাহেবকেই স্যার কলিনের বড় ভয়। অথচ বারবার তাঁহাকে পর্যুদস্ত করিতে আসিয়াও তিনি কামিয়াব হইতে পারেন নাই। যতদিন এই শাহ্ সাহেবের মত বিপ্লবী জীবিত থাকিবেন, ততদিন বিপ্লবের শেষ হইবার নয়।

হঠাৎ স্যার কলিনের ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গেলেন স্যার কলিন। এমন ব্যবস্থা যদি করা যায়, যাহাতে শাহ্ সাহেব জীবিত না থাকেন– তবে? তবেই বিপ্লবী সিপাহীরা পর্যুদস্ত হইবে। চঞ্চল হইয়া উঠিলেন স্যার কলিন ক্যাম্পবেল। কিন্তু তিনি জানিতেন যে বীরধর্মে ষড়যন্ত্রের স্থান নাই। ষড়যন্ত্র করিয়া দুশমনকে ধ্বংস করায় কোন বীরত্ব নাই। কিন্তু যে দুশমনকে হাতের মুঠায় পাওয়া যায় না, তাহার প্রতি বীরের কর্তব্য কি? তখন স্যার কলিনের শিবিরে অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে।... কর্তব্য স্থির করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন স্যার কলিন ক্যাম্পবেল।

শাহ্ আহ্মদুল্লাহ্ সুফী ইংরেজের কাছে ফৈজাবাদের 'মৌলবী' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করিয়াছেনঃ

"মৌলবী আহ্মদুল্লাহ্ শাহ্ অনেক গুণ ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তিনি এইরূপ অসমসাহসী ছিলেন যে কোন ভয়ই তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। তিনি ছিলেন সংকল্পে দৃঢ় ও বলীয়ান। 'বিদ্রোহী'দের মধ্যে তাঁহার চাইতে সেরা যোদ্ধা আর কেউ ছিলেন না। তাঁহার এই গৌরব ছিল যে তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্যার কলিন ক্যাম্পবেলকে বিজয়ের গৌরব হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। 'বিদ্রোহী'দের মতে তিনিই ছিলেন বাদশাহী পদ লাভের যোগ্যতম ব্যক্তি। দেশপ্রেমের অর্থ যদি হয় হৃত স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনার সংগ্রাম চালনা করা, তবে মৌলবী সাহেব ছিলেন একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। তাঁহার তলোয়ার কোনদিন গুপ্ত হত্যায় কলঙ্কিত হয় নাই। অসীম সাহস ও আত্মমর্যাদা নিয়া তিনি তাঁহার রাজ্য হরণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন। বীরত্ব ও সততার অধিকারী মৌলবী আহ্মদুল্লা'কে দুনিয়ার সমগ্র জাতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে স্মরণ করিবে।" (ম্যালিসন ঃ হিষ্ট্রি অব দ্য ইন্ডিয়ান মিউটিনি, পৃঃ ৫৪১)

শাহ্ আহ্মদুলাহ্ সাতান্নর পূর্বেই গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। প্রতিটি মনে প্রজ্বলিত করিয়া যাইতেন দেশপ্রেমের অম্লান শিখা। এই প্রতিটি শিখাই মিলিত হইয়া যে দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভাগ্য। ইংল্যাণ্ডের লোক বুঝিতে পারিয়াছিল, এত বড় একটা দেশের শাসনভার একটি খেয়ালী ব্যবসায়ী দলের হাতে রাখা যায় না।

www.pathagar.com

সুগঠিত দেহ সুদর্শন যুবক শাহ্ আহ্‌মদুল্লাহ্। তাঁহাকে নিয়াই বর্তমানে কোম্পানী-কর্তৃপক্ষের যত মাথা ব্যথা।

* * * *

পোবাইন একটি ছোট্ট রাজ্য। রাজার নাম জগন্নাথ সিংহ। নড়িতে চড়িতে অনিচ্ছুক বিশালদেহী এই রাজাটির ব্যবহারিক বুদ্ধি কম ছিল না। সিপাহী বিপ্লবে যখন যে পক্ষ বিজয়ের পথে বেশি অগ্রসর হয়, তিনি সেই পক্ষেই থাকিতে ভালবাসেন। শাহ্ আহ্‌মদুল্লাহ্ শক্তি বৃদ্ধি করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পোবাইনের রাজা তাঁহাদের পক্ষে যোগ দিলে শক্তি কিছুটা বাড়িবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অযোধ্যা-বেগমের পক্ষ হইতে এই নিয়া রাজার সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলিতে লাগিল।

অবশেষে স্থির হইল, শাহ্ আহ্‌মদুল্লাহ্ নিজে যাইবেন রাজার কাছে। গিয়া রাজাকে বুঝাইবেন যে, এই বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করা সকল দেশবাসীরই কর্তব্য। সুতরাং রাজারও কর্তব্য। তদনুসারে আটান্ন সালের ৫ই জুন শাহ্ সাহেব মুষ্টিমেয় লোক নিয়া পোবাইন পৌঁছিলেন। বড় আশা তাঁহার মনে। তাঁহাদের সঙ্গে রাজাও যোগ দিবেন। শক্তি বৃদ্ধি হইবে, বিদেশী বিতাড়নের প্রয়াস আরও জোরদার হইবে! হয়তো তখন বাস্তবায়িত হইয়া উঠিবে আযাদীর মুমূর্ষু স্বপ্ন!

রাজবাড়িতে ঢুকিয়া তিনি আশ্চর্য হইয়া গেলেন। হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়াই লক্ষ্য করিলেন, রাজার লোক-লস্কর সারি সারি চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে, পিছনে সিংহদ্বার বন্ধ! রাজার পাশে রাজার ভাই!

ব্যাপারটি বুঝিতে শাহ্ সাহেবের বিলম্ব হইল না। মুহূর্ত মধ্যে তিনি কর্তব্য স্থির করিলেন। মাহুতকে হুকুম করিলেন হাতী চালাইতে। সুশিক্ষিত হাতী মুহূর্ত মধ্যে বন্ধ সিংহদ্বারে মাথা ঠেকাইল। মত্ত হাতীর শক্তির কাছে সিংহদ্বারের বাধা হার মানিল। ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল সিংহদ্বার। আর মুহূর্ত মাত্র বাকী। তারপরই শাহ্ আহ্‌মদুল্লাহ্ ষড়যন্ত্র-জাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসিবেন! কিন্তু তাহা হইতে পারিল না। রাজার ভাই রাজার পাশে দাঁড়াইয়া এইসব অবলোকন করিতেছিল। সিংহদ্বারের অবস্থা দেখিয়া সে গুলী করিল শাহ্ সাহেবকে। গুলীবিদ্ধ শাহ্ সাহেব হাতীর পিঠ হইতে পড়িয়া গেলেন। আমন্ত্রণকারী বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি বুকের রক্ত ঢালিয়া দিলেন। ভিজাইয়া দিলেন পোবাইনের মাটি।

* * * *

পোবাইনের রাজবাড়ি ছিল শাহ্‌জাহানপুর হইতে ১৩ মাইল দূরে। তখন

www.pathagar.com

শাহ্‌জাহানপুরের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নৈশভোজের টেবিলে উপস্থিত ছিলেন। সহসা সেখানে উপস্থিত হইলেন পোবাইনের রাজা ও তাঁহার ভাই। কেউ তাঁহাদিগকে বাধা দিল না। আসিবার কথা ছিল কি না কে জানে! সাহেবদের সামনে রাজা ও তাঁহার ভাই শাহ্‌ আহ্‌মদুলাহ্‌ সুফীর কর্তিত শির স্থাপন করিলেন। আনন্দের ঢেউ বহিয়া গেল উপস্থিত সকল ইংরেজের চোখে-মুখে। রাজার ভাইকে পুরস্কৃত করিলেন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ, সেই রাত্রেই। পুরস্কারের পরিমাণ ইংরেজের করুণা ও সেই সময়ের পাঁচ হাজার পাউণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে খবর ছড়াইয়া পড়িল। ছড়াইয়া দিলেন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। শাহ্‌ আহ্‌মদুলাহ্‌ সুফী, ফৈজাবাদের মৌলবী সাহেব, আর জীবিত নাই।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন স্যার কলিন ক্যাম্পবেল। রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল।

www.pathagar.com

বেগম হাসরত মহল

ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছ হইতে অর্থাৎ লাখ্‌নৌর রেসিডেন্টের তরফ হইতে অযোধ্যার নওয়াব ওয়াজেদ আলি শা'র কাছে 'এত্তেলানামা' আসিয়াছে। 'এত্তেলানামা'য় লেখা আছে ঃ "আগামী কল্য, ১৮৫৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, প্রত্যুষে জেনারেল আউটরাম লাখ্‌নৌ পৌঁছিতেছেন। অযোধ্যায় নিয়োজিত গোরা সৈন্য এবং অযোধ্যার শাহী ফৌজ জেনারেল বাহাদুরকে 'গার্ড অব অনার' প্রদান করিবে।"

'এত্তেলানামা' পড়িয়া নওয়াব ওয়াজেদ আলি শাহ্ কোন ভাবান্তর দেখাইলেন না। কিন্তু কথাটা শুনিবার পর ম্লানিমায় ছাইয়া গেল অযোধ্যার শাহী মহল। চিন্তায় মুষড়িয়া পড়িলেন নওয়াব-মাতা আলিয়া বেগম। অস্বস্তিতে অধীর হইয়া উঠিলেন নওয়াব-সহধর্মিনী বেগম হাসরত মহল। জেনারেল আউটরামের হঠাৎ আগমনের কারণ অনুসন্ধানে রত নওয়াব-মাতাকে সান্ত্বনা দিলেন নওয়াব-বেগম। কারণ তিনি জানেন- যথাশীঘ্র অযোধ্যাকে গ্রাস করাই ইংরেজের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে নূতন কোন ফন্দী নিয়াই জেনারেল সাহেবের আগমন। এই কথা বুঝিতে বেগম হাসরত মহলের কোন বেগই পাইতে হয় নাই।

তবুও অস্বস্তিতে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন নওয়াবের নিষ্ক্রিয়তার কথা ভাবিয়া। তাঁহার মনে পড়িল ১৮৫৪ সালের কথা। তখন মেজর-জেনারেল আউটরাম লাখ্‌নৌর রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। পূর্ববর্তী রেসিডেন্টের মত তিনিও অযোধ্যার ৫০ লক্ষ অধিবাসীকে 'চরিত্রহীন লম্পট নেটিভ নওয়াবের অত্যাচারের' হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং 'কৃষকগণকে অসাধারণ দুর্দশা হইতে বাঁচাইবার জন্য' লণ্ডনে কোর্ট অব ডাইরেক্টর্‌স্-এর কাছে পত্রের পর পত্র পাঠাইলেন। এবং পরিণামে অযোধ্যাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করাই স্থির হইল। অথচ কোর্ট অব ডাইরেক্টর্‌স্-এর একজন সদস্য মিষ্টার জোন্‌স্ নওয়াব সম্পর্কে এইসব অভিযোগকে সম্পূর্ণ বানোয়াট বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। জোন্‌স্ বলিয়াছিলেন, নওয়াবের চাইতে বেশি চরিত্রবান লোক খুব কমই আছেন। কিন্তু ইহাতে কোন সুফল হয় নাই।

শাহী মহল সবই জানিতে পারিয়াছিল। হাসরত মহলেরই অনুপ্রেরণায় আত্মবিস্মৃতি ও নিষ্ক্রিয়তার ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়াছিলেন অযোধ্যার ওয়াজেদ আলি শাহ্। হাসরত মহল, মু'তামেদ্দৌলাহ্ সুফীর পরামর্শে নূতনভাবে নিজ সৈন্যবাহিনী গঠনে নূতন সৈন্য ভর্তি ও তাহাদের প্রশিক্ষণে আত্মনিয়োগ

www.pathagar.com

করিয়াছিলেন অযোধ্যার নওয়াব। সাবেক ৫০ হাজার সৈন্যসংখ্যায় যোগ হইয়াছিল আরও ২০ হাজার নূতন সৈন্য। নবগঠিত সেনাবাহিনীর সক্রিয় সর্বাধিনায়করূপে দেখা দিয়াছিলেন ওয়াজেদ আলি শাহ্। বেগম হাসরত মহলের নেতৃত্বে গঠিত হইয়াছিল ৫ হাজারের এক মহিলা বাহিনী। রণোন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল সমগ্র অযোধ্যা। কিন্তু ইংরেজ কর্তৃপক্ষ চুপ করিয়া থাকিলেন না। এই সব কিছু বন্ধ করিবার ব্যবস্থা হইল। নওয়াব ওয়াজেদ আলি শাহ্ অবাক হইলেন। দৃষ্টি তাঁহার দার্শনিকতায় হারাইয়া গেল। আবার তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন সুকুমার শিল্পের রাজ্যে। মন ভাঙ্গিয়া গেল বেগম হাসরত মহলের।

এই সব কথা আলিয়া বেগমও জানেন। জানেন বলিয়াই আল্লাহ্‌র দরবারে হাত উঠাইয়া কতদিন ফরিয়াদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্! তুমি হাসরত মহলকে আমার পুত্র আর ওয়াজেদ আলিকে কন্যা করিয়া পাঠাও নাই কেন?

* * * *

৪ঠা ফেব্রুয়ারী জেনারেল আউটরাম নওয়াব ওয়াজেদ আলি শাহ্‌কে একটা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে দিলেন। নওয়াব সন্ধিপত্র পড়িলেন। স্বাক্ষর করিলেন না। জেনারেল আউটরাম তখন বলিলেন, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে জানাইতে হইতেছে যে তিনদিন পর তাঁহাকে অযোধ্যার শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে হইবে।

৮ই ফেব্রুয়ারী এক ঘোষণাপত্রে সকলকে জানানো হইল যে, ঐদিন হইতে অযোধ্যার লোকেরা হইল ইংরেজ সরকারের প্রজা!

নওয়াবকে বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া কলিকাতায় নির্বাসিত করা হইল। ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলে এই বৃত্তির পরিমাণ হইত ১৫ লক্ষ টাকা।— কলিকাতায় নওয়াবের সহগামিনী হইলেন না বেগম হাসরত মহল। বারো বৎসর বয়স্ক পুত্র বিরজিস কদরকে সঙ্গে নিয়া অযোধ্যার বেগম রহিয়া গেলেন অযোধ্যায়।

অযোধ্যা অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ভাগ্য নামিয়া আসিল অযোধ্যার তালুকদার ও কৃষকদের উপর। তালুকদারগণের দুর্গসমূহ ধূলিসাৎ হইল, খর্ব হইল তাঁহাদের সকল অধিকার, ধ্বংস হইল তাঁহাদের সম্পদশক্তি। তাঁহাদের সৈন্যসামন্তকে চাকুরীচ্যুত করা হইল। চাকুরীচ্যুত হইল নবাবী ফৌজ। কৃষকদেরও লাঞ্ছনার শেষ রহিল না। বিক্ষুব্ধ হইল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম কৃষকটি পর্যন্ত। বিক্ষুব্ধ হইল সমগ্র অযোধ্যা।

১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে অযোধ্যার চীফ কমিশনার হইয়া আসিলেন হেনরি

www.pathagar.com

লরেন্স। অযোধ্যায় পা দিয়াই বুঝিলেন, সমগ্র অযোধ্যা হইয়া আছে এক বারুদখানা। সারা এপ্রিল মাস ধরিয়া হেনরি লরেন্স অযোধ্যার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করিলেন। মুসলমানগণকে শিখদের দুর্ব্যবহারের কথা বুঝাইলেন। শিখগণকে বুঝাইলেন মুসলমানদের অত্যাচারের কথা। হিন্দুগণকে বুঝাইলেন স্বৈরাচারী নবাবের কীর্তি কাহিনী, আর আলাদা ভাবে তালুকদারগণকে কৃষকদের অভ্যুত্থানের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু এই ভেদ নীতিতে সুফল ফলিল না। চারদিকে প্রকাশ পাইতে লাগিল সমগ্র অযোধ্যার পুঞ্জীভূত আক্রোশ।

তারপর প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া চলিল অযোধ্যার গণ-অভ্যুত্থান। এই মহা-অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করিল সমগ্র অযোধ্যা। নেতৃত্বে থাকিলেন শাহ্ আহ্‌মদুল্লাহ্ সুফী, মু'তামেদ্দৌলাহ্, রাজা মানসিংহ প্রমুখ। আর সকলের উৎসাহ ও প্রেরণার উৎস হইয়া থাকিলেন অযোধ্যার বেগম হাসরত মহল।

২রা মে অযোধ্যায় অবস্থিত ৭ নম্বর বাহিনীতে এন্‌ফিল্ড রাইফেলের টোটা ব্যবহার করার হুকুম করা হইল। সিপাহীরা হুকুম পালন করিল না। দুই দিন পর সেই বাহিনীকে বরখাস্ত করা হইল। মিরাট ও দিল্লীর অভ্যুত্থানের খবর অযোধ্যায় পৌছিল ১৫ই মে। সমূহ বিপদ দেখিলেন হেনরি লরেন্স। আত্মরক্ষার জন্য রেসিডেন্সিকে কেন্দ্র করিয়া ৬০ একর জায়গার বহির্ভাগে চারদিকে খনন করা হইল গভীর পরিখা। রেসিডেন্সিকে করা হইল আরও মজবুত। দৃঢ় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল।

দিন কাটিতে লাগিল। কোন কিছু হইতেছে না দেখিয়া ইংরেজরা অনেকটা আশ্বস্ত। কিন্তু ৩০শে জুন রাত ৯টায় লাখ্‌নৌতে অবস্থিত সিপাহীরা ঘোষণা করিল বিদ্রোহ।

তারপর অযোধ্যার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংঘাত। পহেলা জুলাই সিপাহীদের দ্বারা লাখ্‌নৌর রেসিডেন্সির অবরোধ। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ইংরেজ বাহিনীর অযোধ্যায় আগমন। অনেক যুদ্ধ, অনেক উত্থান-পতন। আশা-নিরাশার দোলায় দুলিতে লাগিল দুই পক্ষই।

* * * *

সেকান্দারবাগের যুদ্ধের একটি ঘটনা। সময়টা আঠার শ' সাতান্নর নভেম্বর মাস। এই যুদ্ধে সিপাহীরা পরাজিত হইয়াছে। বিজয়ী ইংরেজগণ সেকান্দারবাগের নর-নারীদের হত্যায় উন্মত্ত। সেকান্দারবাগের প্রাঙ্গণ মধ্যে একটা ঝাঁপড়া পিপ্পল

www.pathagar.com

গাছ। পিপ্পল গাছের গোড়ায় কতকগুলি পানির কলস। বিজয়ী ইংরেজ বাহিনীর একজনের ভাষ্য অনুযায়ী, "হত্যাকাণ্ড যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন আমাদের অনেক লোক ছায়ার জন্য এবং পিপাসা নিবারণের জন্য ঐ গাছের নীচে যাইতেছিল। কিন্তু কাছে গিয়া দেখা গেল, অনেক ইংরেজ সৈন্য মৃত অবস্থায় গাছের গোড়ায় পড়িয়া আছে। ইহাতে অনেকের সন্দেহ হইল। ওয়ালেস নামক একজন ইংরেজ সৈন্য পিছনে হটিয়া গাছের উপর দিকটা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। পরক্ষণেই সে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, 'আমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছি।' সে গুলী ছুঁড়িল। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা লাল কোট ও গোলাপী রঙের সিল্কের পাত্‌লুন পরিহিত এক ব্যক্তির দেহ মাটিতে আসিয়া পড়িল। সজোরে পতনের ফলে তাহার কোটের বোতাম ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। কাছে গিয়া দেখা গেল, সে একজন স্ত্রীলোক। তাহার সঙ্গে পুরাতন ধরণের দুইটি পিস্তল, একটি গুলী ভরা অবস্থায় বেল্টেই রক্ষিত, অপরটির দ্বারা সে প্রাণ নিয়াছে ছয়জন ইংরেজের!" (ফরবেস-মিচেল রচিত 'রেমিনিসেন্সেস্ অব দ্য গ্রেট মিউটিনি,' পৃঃ ৩৩)। উল্লেখ্য, স্ত্রীলোকটি বেগম হাসরত মহলের একদা সংগঠিত মহিলা বাহিনীরই একজন। বয়োপ্রাপ্ত সকল হারেমবাসিনীই ছিলেন ঐ মহিলা বাহিনীর লোক। জন্মভূমির পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে তাঁহারা পলায়ন করেন নাই। শত্রু নিপাত করিতে গিয়া প্রাণ দিয়াছিলেন!

* * * *

১৮৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে কমান্ডার-ইন-চীফ ক্যাম্পবেল গভর্নর-জেনারেল ক্যানিংকে লিখিলেনঃ লাখ্‌নৌর রেসিডেন্সিতে অবরুদ্ধ ইংরেজগণকে উদ্ধারকালের যুদ্ধে অযোধ্যার লোকেরা যে দুর্ধর্ষ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে, তার ফলে আমার অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, অযোধ্যা জয় করিতে হইলে অন্ততঃ ৩০ হাজার সৈন্যের প্রয়োজন হইবে। কেবলমাত্র লাখ্‌নৌকে বশ করিবার জন্যই প্রয়োজন ২০ হাজার সৈন্যের। তাই আপাততঃ অযোধ্যা বিজয় স্থগিত রাখিয়া রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করাই শ্রেয়ঃ। গভর্নর-জেনারেল ক্যানিং উত্তরে লিখিলেন ঃ অযোধ্যাই প্রথম জয় করিতে হইবে, কারণ অযোধ্যায় আছে এক রাজবংশ। বিদ্রোহীরা এই রাজবংশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। লাখ্‌নৌ এবং অযোধ্যা এখন গ্রহণ করিয়াছে দিল্লীর স্থান। সারা ভারতবর্ষ এখন তাকাইয়া আছে অযোধ্যার দিকে।

১৮৫৮ সালের ২রা মার্চ ক্যাম্পবেল লাখ্‌নৌ আক্রমণ শুরু করিলেন। সেইদিনই অধিকার করিলেন দিলখুশা প্রাসাদ। ৫ই মার্চ তাঁহার সঙ্গে আসিয়া যোগ

www.pathagar.com

দিলেন জেনারেল ফ্রাঙ্ক। ১০ই মার্চ ১০ হাজারের গুর্খা বাহিনী নিয়া ইংরেজদের সাহায্যে আসিলেন নেপালের জং বাহাদুর। ইতিমধ্যে ইংরেজরা দখল করিয়া নিয়াছে লা মার্টিনিয়ের ও ছক্কর মঞ্জিল। ১১ই মার্চ দখল করা হইল বেগম কুঠি। সমস্ত দিন ধরিয়া ভয়ংকর যুদ্ধের পর। প্রতিটি প্রাঙ্গণে, প্রতিটি কামরায় 'বিদ্রোহীরা' শেষ পর্যন্ত লড়িয়াছিলেন। কর্ণেল ফরবেস-মিচেল তাঁহার স্মৃতি কথায় লিখিয়াছেন, "মধ্যস্থলের প্রাঙ্গণে ৮৬০ জন বিদ্রোহীর শবদেহ পাওয়া গিয়াছিল। কেহই জীবন ভিক্ষা চাহে নাই, দেওয়াও হয় নাই।" (পৃঃ ২১০)। উল্লেখ্য যে, বেগম কুঠির যুদ্ধে মুঘল শাহ্‌যাদাদের হত্যাকারী সেই নিষ্ঠুর দস্যু মেজর হাড্‌সন্ লুটতরাজ করিবার সময় নিহত হয়।

১৯ শে মার্চ ইংরেজরা বিদ্রোহীদের শেষ ঘাঁটি মুসাবাগ দখল করিয়া নেয়। কিন্তু শাহ্ আহ্‌মদুল্লাহ্ সুফী তখনও আশা ছাড়েন নাই। তিনি সিপাহীদের নিয়া ২২ শে মার্চ পর্যন্ত লড়িয়া গেলেন। তারপর ছাড়িয়া গেলেন লাখ্‌নৌ। ২০ দিনের যুদ্ধের শেষে ২২ শে মার্চ ইংরেজরা সম্পূর্ণরূপে লাখ্‌নৌ হস্তগত করিয়া নেয়। "এই কয়দিন বেগমকে (বেগম হাসরত মহলকে) যুদ্ধ ক্ষেত্রের সর্বত্রই দেখা গিয়াছিল। মুসাবাগের যুদ্ধেও তিনি লাখ্‌নৌ ত্যাগ করেন নাই। লাখ্‌নৌর যুদ্ধে আরও অনেক স্ত্রীলোককে অংশ গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছিল। একজন ইংরেজ অফিসার সেকান্দারবাগের কয়েকজন 'এমাজন নিগ্রেস্'-এর কথা এই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেনঃ "তারা হিংস্র বিড়ালের মতো যুদ্ধ করেছিল এবং তারা যে স্ত্রীলোক তা তারা নিহত হবার পূর্বে বোঝা যায় নি।" (গর্ডন আলেকজান্ডারঃ 'রিকালেকসন্‌স অব এ সাবঅল্টার্ন') তিনি আর একজন বৃদ্ধার কথা বলিয়াছেন। লাখ্‌নৌর পতনের পর লৌহ-সেতুর উপর তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া যায়; তাঁহার হাতের পাশে সল্‌তের মত আংশিক পোড়া এক টুকরা কাপড় পড়িয়া ছিল এবং তাঁহার মৃতদেহের পাশে পড়িয়া ছিল একটা বাঁশ, যার ভিতরে ছিল বোমার সলতে। এই বাঁশটা প্রকাণ্ড একটা 'মাইনের' সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।'' (ম্যাজেণ্ডি ঃ 'আপ এমং দ্য প্যানডিজ,' পৃঃ ২৩৬-৩৮)। ''লাখ্‌নৌর পতন হইল। দিল্লীর পতনের পর সেইখানে যাহা ঘটিয়াছিল, লাখ্‌নৌতেও ঘটিল তাহাই- অবাধ লুণ্ঠন, হত্যা, ধ্বংস।'' (প্রমোদ সেনগুপ্ত, মহাবিদ্রোহ, ১৮৫৭ পৃঃ ৩০২)।

লাখ্‌নৌ হারাইয়া অভ্যুত্থানকারীরা ছড়াইয়া পড়িলেন সমগ্র অযোধ্যায়। এই পর্যায়ে শাহ্ আহমদুল্লাহ্ সুফী এক রাজার বিশ্বাসঘাতকায় প্রাণ হারাইলেন। ইতিমধ্যে রোহিলাখণ্ডও ইংরেজের দখলে আসিয়াছে। ১৮৫৮ সালের ২রা নভেম্বর আরম্ভ হইল ইংরেজদের বিদ্রোহী নির্মূল অভিযান। ফতেগড় হইতে একটি

www.pathagar.com

বাহিনী, শাহ্‌জাহানপুর হইতে একটি, গোরখপুর হইতে একটি এবং এলাহাবাদের নিকট সোরাওন হইতে স্বয়ং কমান্ডার ইন-চীফের বাহিনী- এই চারটি বাহিনী বিদ্রোহীদের ধ্বংস করিতে করিতে নেপালের জঙ্গলে ম্যালেরিয়া ও হিংস্র জন্তুর মুখে ঠেলিয়া নিয়া যাওয়া হইবে- এই-ই ছিল ইংরেজ সরকারের পরিকল্পনা। এই অভিযানের বিভিন্ন স্থানে দেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের সঙ্গে ইংরেজ পক্ষের মোকাবিলা হইয়াছে। অভ্যুত্থানের বিভিন্ন নেতা বিভিন্ন স্থানে অন্যদের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। ফিরোজ শাহ্ যমুনা পার হইয়া বুন্দেলখণ্ডে তাঁতিয়াতোপীর সঙ্গে গিয়া মিলিত হইলেন।

তখন বেগম হাসরত মহল, নানাসাহেব, আজিমুল্লাহ্ খানও রাজপুত রাজা বেণীমাধবের সঙ্গে অবস্থান করিয়া সিপাহীবৃন্দকে উৎসাহিত করিয়া চলিয়াছিলেন। ২৩ শে ডিসেম্বর ব্রিগেডিয়ার কোক্রফ্‌ট্ নানাসাহেবের ভাই বালা রাওকে যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া দখল করেন তুলসীপুর। ১৫ই ডিসেম্বর সেক্রোরা হইতে ইংরেজ সৈন্য আসিয়া পৌছিল বারাইচে, যেখানে অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন বেগম হাসরত মহল ও নানাসাহেব। তখন দুই পক্ষের মধ্যে চলিতেছে মোকাবিলার খেলা। ২৩ শে ডিসেম্বর বারোডিয়াতে দুই পক্ষের যুদ্ধ হয়, পরের দিন মসজিদিয়াতে।

৩০ শে ডিসেম্বর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সংবাদ পাইলেন যে, রাপ্তি নদীর ধারে বরবাঁকীতে অবশিষ্ট সিপাহীদের নিয়া সমবেত হইয়াছেন বেগম হাসরত মহল, নানাসাহেব ও রাজা বেণীমাধব। ৩১ শে ডিসেম্বর বরবাঁকীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একটা যুদ্ধের পর অভ্যুত্থানকারীরা জঙ্গলে প্রবেশ করিল। "সেখানে নিজেদের পুনর্গঠন করিয়া তাহারা ইংরেজদের উপর ভালভাবে লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইতে লাগিল। ইংরেজ গোলন্দাজরা ও অশ্বারোহীরা জঙ্গলের ভিতর তাহাদের আক্রমণ করিতে পারিতেছিল না।" (ফরেষ্ট ঃ হিষ্টি অব দ্য ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, পৃঃ ৫৩৬)। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। কয়েক দিন হইতে জঙ্গল ঘিরিয়া ফেলিতে লাগিল ইংরেজরা। অভ্যুত্থানকারীরা তখন জঙ্গলের ধার দিয়া রাপ্তির দিকে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু আক্রমণ করিল ইংরেজরা। নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন যোদ্ধৃবৃন্দ। ইংরেজের গুলী চলিতে লাগিল। নদীতেই মৃত্যু হইল অনেক যোদ্ধার। তাঁহাদের দেহ ভাসিয়া গেল রাপ্তির প্রবল স্রোতে।

১৮৫৮ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর বরবাঁকীর যুদ্ধই অযোধ্যা অভ্যুত্থানের শেষ যুদ্ধ। বরবাঁকী যুদ্ধের পর ফারাক্কাবাদের নওয়াব তোফাজ্জল হোসেন, মেহেদী হোসেন, মুহম্মদ হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।

www.pathagar.com

মাম্মুখান, জওলা প্রসাদ ও আরও অনেককে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে গ্রেপ্তার করিয়া জং বাহাদুরের সরকার ইংরেজের হাতে সমর্পণ করে। কিছু দিনের মধ্যেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া গোণ্ডার রাজা দেবী বক্স বালা রাও, আজিমুল্লাহ্ খান প্রভৃতির মৃত্যু হয় তরাই নামক স্থানে। জং বাহাদুরের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন রাজা বেণীমাধব, তাঁহার ভাই যোগরাজ সিং এবং আরও কিছু অবশিষ্ট সিপাহী। নানাসাহেব সম্বন্ধে আর কোন সঠিক খবর পাওয়া যায় নাই।

আর বেগম হাসরত মহল? নেপালের বনাশ্রয়েই রহিয়া গেলেন অবশিষ্ট জীবন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষের ঘোষণা ছিল ঃ ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে পেন্সন দেওয়া হইবে। স্বামী নওয়াব ওয়াজেদ আলি শাহ্ তখনও কলিকাতায় ১২ লক্ষ টাকার বার্ষিক বৃত্তিতে নির্বাসিত। সেখানেই যাইতে পারিতেন বেগম হাসরত মহল। কিন্তু ইংরেজের পেন্সন বা বৃত্তি অপেক্ষা জঙ্গলের হিংস্রতাকেই অধিক মূল্য দিলেন অযোধ্যার বেগম সাহেবা। বালক পুত্র বিরজিস কদরকে বুকে নিয়া নেপালেই স্বেচ্ছা-নির্বাসিত জীবন কাটাইতে লাগিলেন বীর নারী অযোধ্যার বেগম হাসরত মহল।

[১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর রেঙ্গুনের নির্বাসনে বাহাদুর শাহ্ যাফরের মৃত্যু হয়। সিটাং নদীর ধারে 'টংঘো' নামক স্থানে কবরস্থ করা হয় তাঁকে, 'গ্রেট্ মুঘল'দের শেষ 'সম্রাট'কে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসু যখন আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ ও অস্থায়ী স্বাধীন ভারত-সরকার স্থাপন করেন, তখন তিনি বাহাদুর শাহের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করেছিলেন]

www.pathagar.com

নাম তার জানা নাই

একটি ভারতীয় সিপাহীদল লইয়া ইংরেজ সেনানায়ক টমকিনসন পথ চলিতেছেন। আর মনে মনে ভাবিতেছেন কত কিছু! এই ভারতের বুকে আজ আগুন জ্বলিতেছে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই দেশের লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজের প্রতি ভয়ে ও আনুগত্যে এতদিন যারা ছিল বাকহীন, তারাই আজ অস্ত্র হাতে হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে ইংরেজের বিরুদ্ধে। কিন্তু কি সৌভাগ্য টমকিনসনের! তাঁহার এই ক্ষুদ্র সেনাদল আজও পর্যন্ত তাঁহাকে অমান্য করে নাই, দেখায় নাই অশ্রদ্ধার কোন লক্ষণ!

সিপাহীদের মনেও তোলপাড় করিতেছে কত কথা! কোম্পানী-রাজকে দেশের বুক হইতে উৎখাত করিবার জন্য ফৌজের প্রায় সকল সিপাহীই দৃঢ়সংকল্প। জনসাধারণের সমর্থন রহিয়াছে সিপাহীদের প্রতি। তাই বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে দেশের সর্বত্র। কিন্তু কোম্পানীও এত সহজে এই দেশ ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। সিপাহী ও জনসাধারণকে দমন করিতে ইংরেজরাও কৃতসংকল্প। ইংরেজ কোম্পানী আর এদেশের লোক- একে অন্যের দুশমন; একে অন্যকে ধ্বংস করিতে যে কোন পথ অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু তাহারা, এই ক্ষুদ্র সেনাদলের সিপাহীরা, কিছুতেই তাহাদের সেনানায়কের কথা অমান্য করিতে পারিতেছে না।

দেশের যখন এই অবস্থা, এমনি সময় ওরাই-এর রাজস্ব নিয়া গোয়ালিয়রের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন লেফ্‌টেনান্ট টমকিনসন। ১২ই জুন তিনি গোয়ালিয়রের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিলেন। কিন্তু আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। গোয়ালিয়র হইতে খবরিয়া মারফত হুকুম আসিলঃ "আর অগ্রসর হইও না।" গোয়ালিয়রের সিপাহী দলে তখন উত্তেজনার ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছে। কর্তৃপক্ষ শুনিয়াছেন, যে সিপাহীদের নিয়া টমকিনসন গোয়ালিয়র আসিতেছেন, তাহাদের অনেকেই কানপুরের নৃশংস ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল!

খবরটি শুনিয়া খুবই বিস্মিত হইয়াছেন টমকিনসন। তাঁহার সেনাদলের কেউই কানপুরের ঘটনার সঙ্গে জড়িত হওয়া দূরে থাক, বিদ্রোহের কোন আভাসও কেউ কোনদিন দেখায় নাই। তবুও এই মিথ্যা খবর কি করিয়া পাইলেন কর্তৃপক্ষ? এই দলের সিপাহীরা বিদ্রোহ ভাবাপন্ন হইলে টমকিনসন কি তাহাদের সঙ্গে নিয়া পথ চলিতেন? টমকিনসন কি করিবেন এখন? গোয়ালিয়রের কর্তৃপক্ষ যে টমকিনসনকে গোয়ালিয়র না পৌঁছিতে হুকুম দিয়াছেন! তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছেন

www.pathagar.com

আগ্রার দিকে অগ্রসর হইতে।

উপদেশ মত কাজ করিতে চাহিয়াছিলেন টমকিনসন। কিন্তু তাহাও কার্যে পরিণত করিতে পারিলেন না তিনি। সিপাহীদল নিয়া আগ্রায় পৌঁছিতেও তাঁহাকে নিষেধ করিলেন আগ্রার কর্তৃপক্ষ। দুশমনে ভরা দেশের এক প্রান্তরে সিপাহীদল নিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলেন টমকিনসন। সন্ধ্যা আসিল। ঘনাইয়া আসিল অন্ধকার।

প্রহরের পর প্রহর কাটিয়া গেল অন্ধকার রাত্রির। টমকিনসনের চোখে ঘুম নাই। চিন্তার সাগরে সাঁতার কাটিতেছেন সেনানায়ক। কোন দিকে কোন তীর দেখা যায় না। রাত্রির মতই ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন তাঁহার সামনের পথ।

তাঁহার দলে তিনি ছাড়া ইংরেজ আর কেহ নাই। বর্তমানে এদেশে ইংরেজ আর সিপাহীদের মধ্যেকার নাজুক সম্পর্কের কথা তিনিও যেমন জানেন, তেমনি জানে তাঁহার অধীনস্থ সিপাহীরা। বুঝিতে পারেন তিনিঃ চারিদিকে বিপদ, মধ্যে তিনি একা দাঁড়াইয়া আছেন।

সিপাহীদের একজন আসিয়া ডাকিল ঃ সাহেব!

চমকাইয়া উঠিলেন টমকিনসন। স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন সিপাহীর দিকে। চোখে তাঁহার এক ভীত ও ব্যাকুল প্রশ্ন।

ঃ এবার আমরা আর কি করিতে পারি সাহেব?

ঃ কি করিতে চাও, বল?

টমকিনসনও প্রশ্ন করিলেন সিপাহীকে। সিপাহী বলিল–

ঃ তোমরা আমাদিগকে অবিশ্বাস করিয়াছ। তোমাদের কথায় আমরা ওরাই ছাড়িয়াছি। তোমাদের হুকুমে ঢুকিতে পারিতেছি না গোয়ালিয়রে। ঢুকিতে পারিতেছি না আগ্রায়। কতক্ষণ চুপ থাকিয়া আবার বলিল সেঃ তোমরা আমাদিগকে যে পথে ঠেলিয়া দিতেছ, সেই পথেই আমরা অগ্রসর হইব। বিপ্লবে যোগ দিব আমরা।

শিহরিত হইয়া উঠিল টমকিনসনের সারা দেহ। এই কথা তাঁহার অভাবিত নয়। তবু কথাটি শুনিয়া তিনি শিহরিত হইয়া উঠিলেন।

ঃ তুমি ছিলে আমাদের সেনানায়ক। এতদিন তোমার কথামতই আমরা চলিয়াছি। তোমাকে আমরা সম্মান করিয়াছি। আজ তোমার প্রতি কোন অসম্মান দেখাইব না। তোমার গায়ে কেউ হাতও তুলিবে না। কিন্তু আমরা এখনই চলিয়া যাইতেছি। তোমার সঙ্গে এই আমাদের শেষ দেখা।

কোন কথা বলিতে পারিলেন না টমকিনসন। ছলছল চোখে শুধু চাহিয়া

www.pathagar.com

রহিলেন। তাঁহার বিশ্বাসী সেনাদল তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে!

তাহাদের গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল তাঁহার দুইটি ছলছল চোখ। সেনাদল চলিয়া গেল। রহিয়া গেলেন টমকিনসন। সঙ্গে রহিল তাঁহার চিরসঙ্গী একটি বন্দুক। তাঁহার চোখ হইতে গড়াইয়া পড়িল দুই ফোটা অশ্রু।

মাথার উপরে রাত্রির মেঘলা আকাশ, অন্ধকার। অন্ধকারে হারাইয়া যায় চোখের দৃষ্টি। অদূরে হাত-পা গুটাইয়া হিংস্র কালো জন্তুর মত ঘুমাইয়া আছে রাত্রি! কোথাও এতটুকু আলো নাই।

একদিন, দুইদিন। দুই রাত্রি কাটিয়া গেল গ্রামের জঙ্গলে। টমকিনসন ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। দুই দিন, দুই রাত্রি কিছু খান নাই তিনি। সিপাহীদল চলিয়া যাইবার পর তাঁহার জীবন রক্ষার চিন্তাই তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। কিন্তু কেমন করিয়া জীবন রক্ষা করিবেন তিনি?

তিনি যে দুশমনের পুরীতে দাঁড়াইয়া আছেন! মানুষের সংস্রব ছাড়িয়া তাই টমকিনসন জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন! কিন্তু সেখানে তো খাদ্য নাই! ক্ষুধা মানুষের জৈবিক প্রয়োজনের কথা জানাইয়া দেয়। তাহা তো কোন বাধা মানে না! টমকিনসন কি করিবেন, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। পা' আর চলিতে চায় না, অবশ হইয়া আসিতেছে সারা দেহ। এখানেই কি তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িবেন?

❊ ❊ ❊ ❊

পাশেই আমাই গ্রাম। জ্ঞানহারা টমকিনসনকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন আমাই গ্রামের এক গরীব মুসলমান। জঙ্গলের ধারে জ্ঞানহীন সাহেবের খেদমত করিয়াছেন তিনি, জ্ঞান পাইয়া টমকিনসন কৃতজ্ঞ চোখে চাহিয়া দেখিয়াছেন তাহাকে! অসহায় সাহেবকে মেহ্‌মান করিয়া বাড়িতে নিয়া গিয়াছেন তিনি।

কিন্তু বড় গরীব সেই মুসলমান। নিজেরাই খাইতে পান না, পরিতে পারেন না। কোন রকমে দিন চলে। তবু তাহাদের সামান্য রোজগারের অংশ তুলিয়া ধরিলেন সাহেবের কাছে।

একদিন, দুইদিন। দিনের পর দিন গেল। তিন মাসের অধিক সময় কাটিয়া গেল। সাহেব এই গরীব মুসলমানের বাড়িতে নিরাপদেই আছেন। আছেন অবশ্য গোপনে। দেশের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ সবাই ইংরেজকে দুশমন মনে করে। কাজেই গোপনেই থাকিতে হইয়াছে টমকিনসনকে। গাঁয়ের আরও একজন জানে এই খবর। তিনি একজন সঙ্গতিপূর্ণ মুসলমান। গরীব মুসলমানটি তাঁহাকে সব কথা বলিয়া সাহেবের জন্য কাপড়-চোপড় চাহিয়া আনিয়াছেন। অন্ন দিয়া, বস্ত্র

www.pathagar.com

দিয়া, ধনী মুসলমানটি সাহায্য করিয়াছেন টমকিনসনকে।

সাহেবের কাছে নিজের চিন্তা-ভাবনার কথা গোপন করেন নাই গরীব মুসলমানটি। বলিয়াছেন, ইংরেজরা এই দেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করিয়াছেন। মান-ইজ্জত নষ্ট করিয়াছেন। ধ্বংস করিতে বসিয়াছেন তাহাদের ধর্ম-তাহ্যীব-তমদ্দুন। তবুও মানুষ হিসাবে মানুষের সেবা করিতেছেন তিনি। সর্বোপরি, অবাক বিস্ময়ে টমকিনসন শুনিলেন, যে গরীব মুসলমানটি তাঁহাকে জীবন ধারণে সাহায্য করিতেছেন, তাহার একমাত্র পুত্র সিপাহী বিপ্লবে যোগ দিয়া প্রাণ দিয়াছে ইংরেজদের হাতে। ভাবিতে খুবই অবাক লাগিতেছিল টমকিনসনের! পুত্রহারা এই গরীব মুসলমানটিই তাঁহাকে জীবনে বাঁচাইয়া রাখিতেছেন?... এমনিভাবে কোন রকমে দিন কাটিতেছিল।

কিন্তু মানুষের জীবন তো শুধু এই দিন কাটানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়! প্রতিদিনের কর্তব্য করার মধ্যেই সেই দিনটির সার্থকতা ফুটিয়া ওঠে। এমনি কত না সার্থক দিন নিয়াই রচিত হয় জীবন! গোপনে জীবন রক্ষার মধ্যে সেই সার্থকতা কোথায়? কোথায় সেই কর্তব্য পালন? অস্থির হইয়া ওঠেন টমকিনসন। তাঁহার জাতির এই দুর্দিনে তিনি কিছুই করিতে পারিতেছেন না!

* * *

সুযোগ আসিল। টমকিনসন সেই সুযোগ গ্রহণ করিলেন। একদিন শুনিতে পাইলেন, একটি সিপাহীদল আমাই গাঁয়ের পাশ দিয়াই অতিক্রম করিতেছে। রাত্রে তাহারা আমাই-এর পাশেই অবস্থান করিবে। সঙ্গে তাহাদের প্রচুর গোলা-বারুদ। টমকিনসন যদি কোন রকমে সেই গোলাবারুদের স্তূপে একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ফেলিয়া দিতে পারেন, তবে তাঁহার জাতির অন্ততঃ কিছুটা উপকার করা হইবে।

গভীর রাত্রি। ঘন অন্ধকার। অন্ধকারের সঙ্গে যেন মিশিয়া গিয়াছেন টমকিনসন। অতি গোপনে, ধীরে ধীরে, হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইতেছেন টমকিনসন। অগ্রসর হইতেছেন সিপাহীদের শিবিরের দিকে। যেখানে গোলাবারুদ রাখা হইয়াছে, সেখানে।

গরীব মুসলমানটি সিপাহীদের অবস্থিতিতে বড়ই চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সব চিন্তা টমকিনসনের জন্য। বলা তো যায় না, কোন রকমে যদি সিপাহীরা টমকিনসনের কথা জানিতে পারে?... গভীর রাত্রিতে তিনি টমকিনসনের বিছানার পার্শ্বে আসিলেন। কিন্তু বিছানা যে শূন্য!

কোথায় গেলেন টমকিনসন! হঠাৎ বন্দুকের শব্দে তিনি উৎকর্ণ হইয়া

www.pathagar.com

উঠিলেন। সিপাহীদের শিবির হইতেই আওয়াজ আসিয়াছে! সেই দিকে পা' বাড়াইলেন উদ্বিগ্ন গরীব মুসলমানটি। সিপাহীদের কাছে যাইতে বাধা নাই এদেশের লোকদের।

শিবিরের কাছে গিয়া দেখিলেন, ধরা পড়িয়া প্রাণ দিয়াছেন টমকিনসন। টমকিনসনের মৃতদেহের পাশে বসিয়া সেই গরীব পুত্রহারা মুসলমানটির চোখ পানিতে ভরিয়া গেল!

* * * *

এক ইংরেজ ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। নিজের জাতির জন্য একজন ইংরেজ সেনানায়কের কর্তব্যপ্রাণতা আর সিপাহী যুদ্ধে নিহত সৈনিক–পুত্রের পিতা এই গরীব মুসলমানটির দয়া ও মানবতার কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু এই গরীবের নাম কেউ জানে না। সেই ঐতিহাসিকও জানেন না।

www.pathagar.com

উজনালার অন্ধকূপ

কল্পনা ও বাস্তব। আগে ধারণা, তারপর কাজ। ধারণার জন্ম কল্পনায়, কাজের প্রকাশ বাস্তবে। সাধারণভাবে এই কথা সত্য বলিয়া স্বীকৃত।

দিল্লী তখন সিপাহীদের করায়ত্ত। বিপন্ন ইংরেজ-সৈন্য দিল্লীর পুরোভাগে কোন রকমে অবস্থান করিতেছিল। আর আশা করিতেছিল, পাঞ্জাব ও পেশোয়ার হইতে সৈন্য-সাহায্য আসিবে। দিল্লী তাহারা আবার দখল করিবে। কিন্তু পাঞ্জাব হইতে মেজর এড্‌ওয়ার্ডিস্ স্যার জন লরেন্সের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন, পেশোয়ার হইতে ইংরেজ সেনাদলের শক্তি হ্রাস করা সমীচীন হইবে না।

একদিকে দিল্লী, অন্যদিকে পেশোয়ার। মেজর এড্‌ওয়ার্ডিসের ধারণা, পেশোয়ার তাহাদের হাতে থাকিলেই এদেশের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইংরেজের পক্ষে সহজ হইবে। কিন্তু স্যার জন লরেন্সের ধারণা, এই দেশকে আয়ত্তাধীন রাখিতে হইলে যথাসত্বর দিল্লীর পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন।

অবশেষে স্থির হইল, পেশোয়ারকে হাতে রাখিতেই হইবে। এবং পেশোয়ারের শক্তি হ্রাস করিয়া দিল্লীতে সৈন্য পাঠানো হইবে না।

কাজেই পাঞ্জাব ও পেশোয়ারের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাজ হইল, সেসব এলাকার সম্ভাব্য বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে দমন করা। আর তারই জন্য আরম্ভ হইল অবিশ্বস্ত সিপাহীদলের নিরস্ত্রীকরণ অভিযান। ফলে অনেক শঙ্কিতমন সিপাহীদলের বিশ্বস্ততায় আসিয়া পড়িল ইংরেজের অবিশ্বাস-বহ্নির স্ফুলিঙ্গ। দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল বিপ্লবের আগুন। সে আগুন ছড়াইয়া পড়িল ঝিলাম, শিয়ালকোট, অমৃতসর ও মিয়াঁমীরে। সুসংবদ্ধ ইংরেজ সৈন্যের সামনে দাঁড়াইতে পারিল না নায়কহীন সিপাহীদল। সেনানায়ক নিকলসন একের পর এক সিপাহীদলকে বিধ্বস্ত করিয়া চলিলেন। শিখ সৈন্য তাঁহার পাশে দাঁড়াইল।

এমনি সময়ের একটি ঘটনা। ইতিহাস সেই ঘটনাকে বুকে নিয়া সত্য-সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই। ইতিহাসে সে-ঘটনা স্থান পায় নাই। স্থান পাইয়াছে সে-ঘটনার প্রধান ও একক নায়কের ডায়রীতে।

অবশেষে সেনানায়ক নিকলসনের ডাক পড়িল দিল্লীস্থ সেনাদলের নায়কত্ব গ্রহণ করিবার জন্য। সে-ডাকে সাড়া দিলেন তরুণ সেনানায়ক। রওয়ানা হইয়া গেলেন তিনি দিল্লী অভিমুখে।

জুলাইয়ের শেষের দিক। চঞ্চল হইয়া উঠিল মিয়াঁমীরের সিপাহীদল। আগেই

www.pathagar.com

তাহারা নিরস্ত্র হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু দিল্লীতে তাহাদের স্বাধীনতা-স্বপ্ন বাস্তবায়িত হইয়া উঠিয়াছে! দেশের স্বাধীনতার প্রতীক বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্ যাফর দিল্লীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন! আশা-আশাঙ্খায় চঞ্চল হইয়া উঠিল মিয়াঁমীরের সিপাহীরা। এই চাঞ্চল্যের দিনে একদিন মিয়াঁমীরে হইয়া গেল প্রচণ্ড এক ধূলি-ঝড়। ধূলিরাশিতে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল। আতঙ্কিত নিরস্ত্র সিপাহীদলে সেদিন বহিয়া গেল উত্তেজনার ঢেউ। সেই উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া নিরস্ত্র সিপাহীদের উপর গুলী চালাইল ইউরোপীয় ও শিখ সৈন্যদল। আর গোলযোগের মধ্যে এক গুলীতে প্রাণ হারাইলেন ইউরোপীয় সেনাদলের অধিনায়ক। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও সন্ত্রস্ত সিপাহীরা মিয়াঁমীর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অধিনায়কের মৃত্যুতে তাঁহার শূন্য স্থান পূরণ করিল এক সিভিল কর্মচারী। নাম ফ্রেডারিক কুপার। অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার। বীরের তেজস্বিতা প্রদর্শন করিবার ষোল আনা ইচ্ছা ছিল ফ্রেডারিক কুপারের। কুপার ভাবিলেন, সেই তেজস্বিতা প্রদর্শনের সুবর্ণ সুযোগ এখন উপস্থিত। তিনি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে অগ্রসর হইলেন।

সিপাহীরা ইরাবতীর দিকে ধাবিত হইতেছে। কুপার তাহার অশ্বারোহী সেনাদল নিয়া অমৃতসর হইতে তাহাদের অনুসরণ করিতেছেন। ইরাবতীর তীরে আসিয়া সিপাহীরা দাঁড়াইয়াছে। নদী পার হইতে হইবে। যত শীঘ্র সম্ভব তাহাদের ওই পারে পৌঁছিতে হইবে। তাহারা জানে, পিছনে আসিতেছে ইংরেজ ও শিখ সৈন্যরা। তাহাদের মোকাবিলা সম্ভব নয়, কারণ সিপাহীরা অস্ত্রহীন। আর অস্ত্রহীনের গায়ে অস্ত্রাঘাত করিতে কুপারের সৈন্যদের অনিচ্ছা হইবে না। অধিনায়কের হত্যার প্রতিশোধ অস্ত্রহীনকে হত্যা করিয়া তাহারা গ্রহণ করিবে। কাজেই পলায়ন ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর নাই।

পল্লীবাসীদের নিকট সিপাহীরা নৌকা প্রার্থনা করিল। কিন্তু আশা তাহাদের ইরাবতীর ধারায় ভাসিয়া গেল। নৌকারোহণের পূর্বেই উজনালার তহশীলদার পুলিশ সৈন্য নিয়া তাহাদের আক্রমণ করিল। ইরাবতীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল সিপাহীরা। কিন্তু পুলিশের গুলীতে ইরাবতীর পানি লাল হইয়া গেল। প্রাণ দিল দেড়শত সিপাহী। বাকী সিপাহীরা কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন করিয়া ইরাবতীর ধারায় জীবন ভাসাইয়া দিল। সামনেই একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ! আশ্রয়ের ক্ষীণ আশা তাহাদের ডাকিতেছে সেই দ্বীপে! আশার ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছে সেখানে। কিন্তু সে-প্রদীপও নিভিয়া গেল। নৌকাতে করিয়া কুপারের সৈন্যদল তাহাদের অনুসরণ করিল। হাতে সঙ্গীন, চোখে মুখে উল্লাস! করায়ত্ত শিকারের অসহায়তার জন্য পৈশাচিক

www.pathagar.com

আনন্দ। কিন্তু গুলী করিতে নিষেধ করিলেন কুপার। বন্দী হইল অসহায় সিপাহীরা। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্বেই ২৮২ জন বন্দীকে আনা হইল উজনালার পুলিশ ষ্টেশনে।

সিপাহীরা জানে, তাহাদের পরিণাম কি। তবু আশা জাগে!

সেদিন ছিল পহেলা আগষ্ট। বকরীদের দিন। বরাবর এই দিনটি তাহারা স্ত্রীপুত্র ও পরিজনদের মাঝে থাকিয়া কাটাইত। আনন্দ-মুখর হইয়া উঠিত তাহাদের ছোট্ট কুটির, ছোট্ট গ্রাম। আজও তাহাদের ছেলে-মেয়েরা হয়তো অবুঝের মত তাহাদের আশা-পথ চাহিয়া আছে! ওরা তো জানে না! বয়স্করা হয়তো জানে, হয়তো কেন- নিশ্চয়ই জানে, এই বকরীদ সিপাহীদের জীবনদানে করুণ হইয়া উঠিতেও পারে। তাই তাহারা দুরু দুরু বুকে তাহাদের খবরের প্রতীক্ষায় আছে। কিন্তু খবর তাহারা কিভাবে পাইবে? আপনজনদের ভাবনা সিপাহীদেরও।

কিন্তু তাহাদের আর ভাবিতে হইল না। ফ্রেডারিক কুপার তাহাদের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন। সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিয়াছেন। আর তদনুযায়ী হুকুমও দিয়াছেন।

ঈদের দিনেই সিপাহীদের বিচার করা হইবে। কিন্তু এত সিপাহীর বিচার এক দিনে? হ্যাঁ, এক দিনেই বিচার চলিল কুপারের। সঙ্গে সঙ্গেই আদেশ পালন। সেস্থানে গাছের সংখ্যা বেশি না থাকায় সকল সিপাহীকে ফাঁসি দেওয়ার সুবিধা হইল না। তাই প্রতিবারে দশজনকে দড়িতে বাঁধিয়া গুলী করিবার সিদ্ধান্ত হইল। শিখ সৈন্যরাই গুলী করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। এমনিভাবে দেড়শত সিপাহী যখন উজনালার খুন-রাঙা মাটিতে ঢলিয়া পড়িল, তখন একজন শিখ সৈন্য মূর্চ্ছিত হইয়া গেল। তাহার ভিতরের মানুষটি হয়তো তখন জাগিয়া উঠিয়াছিল!

দন্ডদানের কাজ স্থগিত রহিল কিছুক্ষণ। কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ বিচারকই আবার কাজ আরম্ভ করাইলেন। ২৩৫ জন সিপাহী নিহত হইলে একজন কর্মচারী আসিয়া জানাইল, অবশিষ্ট সিপাহীরা হাজতের বাহিরে আসিতেছে না।

হাজতখানা। প্রাচীরের মধ্যে একটি ছোট্ট কোঠা। আলো বাতাসও যেখানে সঙ্কোচের সঙ্গে প্রবেশ করে, কয়েকজন আসামীর জন্য যে স্থানটি ছোট করিয়া নির্মিত হইয়াছিল, সেই হাজতখানা হইতে অবশিষ্ট সিপাহীরা বাহিরে আসিতেছে না। মৃত্যুর ভয়েই হয়তো তাহারা বাহিরে আসার হুকুম অমান্য করিতেছে। খবর পাইয়া তেজস্বী বীর কুপার নিজেই সে স্থানে গমন করিলেন। হাজতের দ্বার খোলা হইল। কিন্তু একি!—

কতক্ষণ নির্বাক চাহিয়া রহিলেন কুপার। আলো বাতাস তখন নিসঙ্কোচে প্রবেশ করিয়াছিল সেখানে। কুপারের হুকুমেই হয়তো! বাতাসে হাহাকার ছিল কি না,

www.pathagar.com

জানা যায় না। তবে সেই আলোতে দেখা গেল, কুপারের চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে এক ক্রুর হাসি। শ্বাসরুদ্ধ হইয়া বাকী ৪৭ জন সিপাহীর মৃত্যু হইয়াছে।-- এদেশেরই এত আলো, এত বাতাস- তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়া হতভাগ্যেরা প্রাণ দিয়াছে!

তেজস্বী বীর কুপার পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। উর্ধতন শাসনকর্তাদের নিকট হইতে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দেশের প্রধান বিচারক স্যার রবার্ট মন্টোগোমারি এই কাজের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। এদেশেরই কর্পূরতলার রাজা রনধীর সিংহ তাহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

* * * *

সেদিন হাজতের সামনে দাঁড়াইয়া কুপার ক্রুর হাসি হাসিয়াছিলেন কেন?

শতবর্ষ আগে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা নাকি এমনি একটি ছোট্ট কুঠরীতে রাখিয়া এমনি শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন ১২৩ জন ইংরেজকে! হলওয়েলের সেই অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ পড়িয়াছিলেন ইংরেজ বীর ফ্রেডারিক কুপার। আজ শতবর্ষ পরে সেই হত্যারই প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন কুপার নিজে। সেইসব ইংরেজ হতভাগ্যের অমানুষিক কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন হলওয়েল। অনুভব করিয়াছিলেন ফ্রেডারিক কুপার। সবারই যে এক মন, এক প্রাণ! তাই প্রতিশোধের ক্রুর হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল কুপারের চোখ-মুখ।

কিন্তু পরবর্তীতে ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে, হলওয়েলের বিবরণ সর্বৈব মিথ্যা। আর ফ্রেডারিক কুপারের নিজের লেখা ডায়রী প্রমাণ করিয়াছে ঃ উজনালার অন্ধকূপ খাঁটি সত্য।

যে অন্ধকূপ ছিল হলওয়েল তথা কুপারের কল্পনায়, তাই-ই কুপারের কাজে সেদিন বাস্তবে রূপ নিল আঠার শ' সাতান্ন সালে, পহেলা আগষ্ট বকরীদের দিনে। তেজস্বী ইংরেজ বীর ফ্রেডারিক কুপার রচনা করিলেন উজনালার অন্ধকূপ!

www.pathagar.com

একজন বিদেশী

অজানা যেন এক কালো মেঘ।

কত সত্য সেই মেঘে ঢাকা পড়িয়া থাকে! কোনদিন যদি বাতাসে মেঘ সরিয়া যায়, অজানা যদি জানার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, তখন তাহার সঙ্গে সেই সত্যও হাসিয়া ওঠে।

মানুষের মনের বেলাতেও এই কথা খাটে। মনটাকে না জানিলে মানুষটাকে জানা যায় না। না জানিয়া কত ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। ভুল ধারণা দিয়াই সৃষ্টি হয় একটা নূতন মানুষ। আসল মানুষটি চাপাই পড়িয়া যায়।

সাতান্ন সালের কথা। আঠার শ' সাতান্ন সাল। সিপাহী বিপ্লব-প্রয়াসের প্রথম পর্যায় শেষ হইয়া গিয়াছে। আধিপত্য তখন সিপাহীদের হাতে। দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হইয়াছে। সে আধিপত্য চলিয়া যাইতেছে ইংরেজদের হাতে। সেই সময়কার কথা।

দিল্লীর উপকণ্ঠের কোন এক শিবিরে আলাপ হইতেছিল।

ঃ আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সিপাহীরা গুলীগোলা নিক্ষেপ করিতেছে!

ঃ মনে হইতেছে, কামান-বন্দুক চালনায় তাহারা আমাদের চাইতেও পারদর্শী!

ঃ কিন্তু কি করিয়া তাহা হইতে পারে?

ঃ পারে। উহাদের সঙ্গে রহিয়াছে কয়েকজন বিদেশী। হয় ইউরোপীয়ান, নয় রাশিয়ান।

কিন্তু কেউ ভাবিয়া উঠিতে পারে না, কি করিয়া একজন ইউরোপীয়ান দেশীয় সিপাহীদের পক্ষ নিয়া ইউরোপীয়দেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে! রাশিয়ান হইলে তাহা অসম্ভব নয়। কিন্তু যাহারা সেই বিদেশীর চেহারা দেখিয়াছে এবং ইংরেজী কথাবার্তা শুনিয়াছে, তাহারা নিশ্চিত যে কোন ইউরোপীয়ানই সিপাহীদের নেতৃত্ব দিতেছেন। কিন্তু কথাটি বিশ্বাস করিতে কাহারও মন সায় দিল না।

রুয়া দুর্গ দখল করিতে গিয়া বিতাড়িত হইয়া আসিয়াছে ইংরেজ ও শিখ সৈন্যরা। প্রাণ দিয়াছে অনেক উচ্চপদস্থ সৈনিক, প্রাণ দিয়াছেন ব্রিগেডিয়ার আড্রিয়ান হোপ। রুয়া দুর্গের ভিতরে অবস্থিত একটি সুউচ্চ গাছের ডালে বসিয়া কে একজন ব্রিগেডিয়ার হোপকে গুলী করিয়াছিল।

সেই 'একজন'টি নাকি এক বিদেশী বীর।

www.pathagar.com

দিল্লী যখন ইংরেজরা পুনরুদ্ধার করে, তখনও একজন বিদেশী অসীম দক্ষতার সঙ্গে সিপাহীদিগকে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন!

কিন্তু কে বা কাহারা যে সেই বিদেশী, কেনই বা তাহারা এই দেশীয় সিপাহীদিগের পক্ষ নিয়া যুদ্ধ করিলেন, ইতিহাস সেই কথা স্পষ্ট করিয়া বলে নাই। হয়তো তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, বিদেশীর নাগপাশ হইতে এদেশীয়দের মুক্ত হওয়া উচিত। আর মানুষ হিসাবে মানুষের মুক্তি সংগ্রামে শরীক হওয়া তাঁহাদের কর্তব্য। হয়তো ছিল অন্য কোন কারণ।

সব কিছুই ধারণা। ধারণায় সন্দেহের অবকাশ থাকে। কিন্তু সেই সন্দেহ নাই দুর্গা সিং-এর। বহুদিন পর বৃদ্ধ দুর্গা সিং একজন ইউরোপীয় বীরের কথা বলিতে গিয়া আবেগময় হইয়া উঠিত। ছলছল করিয়া উঠিত তাহার দুই চোখ। দুর্গাসিং সেই বীরের নেতৃত্বে যুদ্ধ করিয়াছিল দিল্লীতেই।

ঃ দুর্গা সিং! সেই সাহেবের কি নাম, কোন্ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি, বলিতে পার?— না। নাম আজ আর বলিতে পারে না দুর্গা সিং।

ঃ নাম আজ মনে নাই। কিন্তু সেই চেহারা আজও স্পষ্ট মনে আছে। বয়স ছিল প্রায় পঁচিশ। গৌরবর্ণ সুদর্শন যুবক। তখন তাঁহার নাম জানিতাম। সকল সিপাহীই জানিত। খুব সম্ভব বিপ্লবের আগে তিনি ছিলেন সার্জেন্ট-মেজর। বেরিলি বাহিনীর সঙ্গে তিনি দিল্লীতে পৌছেন।

গুণের জন্যই বাদশাহ্ এই বিদেশীকে গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়কত্ব প্রদান করিলেন। বখ্‌ত্ খান তখন দিল্লীর প্রধান সেনাপতি।

গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান বলিয়াই নয়, ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়াই সেই বিদেশীকে সকলেই মনে রাখিবে। মনে রাখিবে সব চেয়ে সাহসী, সব চেয়ে উৎসাহী সেই সেনানায়ককে।

নায়কত্ব গ্রহণ করিবার পর এমন একটি দিনও যায় নাই, যেদিন তিনি সমস্ত বাহিনীর প্রতিটি ছোট ছোট দলকে পরিদর্শন না করিয়াছেন। অল্পদিনেই সকলের আপন হইয়া উঠিলেন তিনি। তাঁহাকে নেতা হিসাবে পাইয়া সমস্ত গোলন্দাজ বাহিনী নবোদ্যমে মাতিয়া উঠিল। বাহিনীকে নব শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে লাগিয়া গেলেন তিনি সস্নেহে। সযত্নে প্রতিটি সিপাহীকে বন্দুক ধরা শিখাইতেন। শিখাইতেন কি ভাবে বন্দুক ধরিয়া দুশমনের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, কি ভাবে ক্ষিপ্ত হাতে গুলী করিতে হইবে। তিনি জানিতেন, তাঁহাকে সুশৃঙ্খল ইংরেজ সেনার মোকাবিলা করিতে হইবে এইসব সিপাহীকে দিয়াই। তিনি সেই ভাবেই প্রস্তুত হইলেন। কোম্পানীর ফৌজ যখন দিল্লী পুনরধিকার করিতে

www.pathagar.com

আসিবে, তখন তিনিই তাহাদের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিবেন। কোম্পানীকে বুঝাইয়া দিবেন, হারানো দিল্লী ফিরিয়া পাওয়ার আশা তাহাদের আকাশ-কুসুম। সুবিধামত স্থানে তিনি কামান স্থাপন করিলেন, সেনাবাহিনী নিয়োগ করিলেন।

কিন্তু আশা তাঁহার সফল হইল না। সফল হইতে দিল না দিল্লীর নিমকহারামেরা। মুন্সী জীওনলাল, মীর্যা এলাহি বক্‌স্ প্রমুখ প্রতিপত্তিশালী দিল্লীবাসী এদেশবাসীর স্বার্থ নিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিল। সমস্ত অন্ধি-সন্ধি ইংরেজকে জানাইয়া দিল তাহারা। দিল্লী আক্রান্ত হইল। এই বিদেশী বীর সারা দিন গোলন্দাজ বাহিনীকে সুশৃঙ্খল নেতৃত্ব দান করিলেন। অপূর্ব রণকৌশল দেখাইলেন তিনি। কিন্তু নিমকহারামীতে যে আশাবৃক্ষের মূল কাটিয়া গিয়াছে, শত চেষ্টায়ও তাহাকে বাঁচানো যাইবে কেন? ইংরেজরা দিল্লী পুনরুদ্ধার করিল।

পরাজিত সিপাহীরা দিল্লী ছাড়িয়া যাইতেছিল। মূত্রার কাছে প্রায় তিরিশ হাজার সিপাহী যমুনা পার হইবার জন্য সমবেত হইল। সঙ্গে সেনাপতি বখ্‌ত্ খান, ফিরোজ শাহ্ ও সেই বিদেশী সেনানায়ক। দিল্লী হারাইয়াছে সিপাহীরা, কিন্তু সারা দেশ পড়িয়া রহিয়াছে। সারা দেশে তাহারা গড়িয়া তুলিবে ইংরেজের বিপক্ষে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ। যমুনা পার হইয়া সিপাহীরা অযোধ্যায় পৌঁছিল।

এর পরের খবর দুর্গা সিং জানে না। দিল্লীর যুদ্ধে আহত দুর্গা সিং অযোধ্যায় তাহার নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহাতে কি দুর্গা সিং নির্ভয় হইতে পারিল? ইংরেজ সৈন্য গ্রামে গ্রামে আসিতেছে। আসিতেছে এক নির্মম মুসিবত। লুণ্ঠন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ। কেউ রেহাই পায়না এই মুসিবত হইতে। দুর্গা সিং গ্রামে থাকিতে সাহস করিল না। লাখ্‌নৌ আসিয়া পুরাতন সাথীদের সঙ্গে মিলিত হইল।

ঃ তখনো কি সেই বিদেশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই?

ঃ হইয়াছিল। লাখ্‌নৌ পতনের পর রুয়া দুর্গে, যেখানে আড্রিয়ান হোপ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষেরা পরাজয় বরণ করিয়া প্রাণ দিয়াছিল। দুর্গের ভিতরে অবস্থিত গাছের ডালে বসিয়া এই বিদেশী সেনানায়কই ব্রিগেডিয়ার হোপকে গুলী করিয়াছিলেন। সে-সময় সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আর তাঁহার ও বখ্‌ত্ খানের নেতৃত্বে সিপাহীরা রুয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় জঙ্গলে আত্মগোপন করিল। সুযোগ বুঝিয়া সিপাহীরা আক্রমণ করিল শাহ্‌জাহানপুর। কিন্তু উহা অধিকার করিতে সমর্থ হইল না।

আঠার শ' আটান্ন সালের অগ্নিক্ষরা গ্রীষ্ম। সিপাহীরা সক্ষম প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে ব্যাকুল। সঙ্গে আছেন বখ্‌ত্ খান আর সেই বিদেশী সেনানায়ক। তারপর

www.pathagar.com

অযোধ্যার নওয়াবগঞ্জের যুদ্ধ। বখ্‌ত্‌ খান প্রাণ দিলেন সেই যুদ্ধে। পরাজিত হইল সিপাহীরা। রাপ্তি নদী পার হইয়া তাহারা অন্য রাজ্যে পৌছিল। এইবার নেতৃত্ব দিলেন শুধু সেই বিদেশী সেনানায়ক।

কিন্তু এত কষ্ট আর সিপাহীদের সহ্য হইল না। সক্ষম প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার সকল আশা তাহারা হারাইয়া বসিল। তখন দেশের অন্য স্থানের বিপ্লবের আগুন নিভিয়া গিয়াছে।

অবশ্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব শেষ হইয়াছে তখন। অবসান হইয়াছে কোম্পানী-রাজের। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্র বাহির হইয়াছে। সিপাহীরা স্থির করিল, আর যুদ্ধ করিয়া কোন লাভ নাই। তাহারা আত্মসমর্পণ করিবে।

আত্মসমর্পণ?

হ্যাঁ, আত্মসমর্পণ করিলে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার শর্তানুযায়ী তাহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে।

আত্মসমর্পণের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিতে পারিয়া বিস্মিত হইলেন সেনানায়ক। মুক্তি-যোদ্ধা সিপাহীরা আত্মসমর্পণ করিতে চায়?

কোথায় সেই দেশপ্রেম! কোথায় সেই ধর্মের নামে শপথ? অনেক বুঝাইলেন সেনানায়ক। বলিলেন, এখনও সময় আছে। যুদ্ধ করিলে আমরা জয়ী হইব। সারা দেশের লোক আমাদের পক্ষে। কিন্তু কোন ফল হইল না। সিপাহীদের হারানো মনোবল আর ফিরিয়া আসিল না। প্রায় সকল সিপাহীই সেনানায়কের অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মতি জানাইল।

সিপাহীদের মনোবল ফিরাইয়া আনিবার জন্য সেনানায়কের সেই ব্যাকুল প্রচেষ্টার কথা দুর্গা সিং জীবনে ভুলিবে না। অন্যান্য সিপাহীদের সঙ্গে আসিবার সময় দুর্গা সিং দেখিয়াছিল, সেই বিদেশী সেনানায়কের চোখ অশ্রুপূর্ণ। গমনোদ্যত সিপাহীদিগকে তিনি শেষবারের মত বলিয়াছিলেন, তোমরা তোমাদের ঘরে ফিরিয়া যাইতেছ। কিন্তু আমি? আমার যে ফিরিয়া যাইবার ঘর নাই! দেশ নাই!!

প্রায় সকলেই তাঁহার নিকট হইতে বিদায় নিয়া চলিয়া গেল। গেল না মাত্র কয়েকজন। কিছু দূর আসিয়া গমনশীল সিপাহীরা ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল, অশ্রুপূর্ণ চোখে তাহাদের সেনানায়ক তাহাদের গমন পথের দিকে তাকাইয়া আছেন!... ধীরে মুখ ফিরাইয়া তাহারা চলিয়া গেল।

আজ কারুর মনে পড়ে না, সেই সেনানায়কের কি নাম ছিল!

www.pathagar.com

একটি জীবন—চরিত

"বিদ্রোহে বাঙ্গালী বা আমার জীবন–চরিত" একটি পুস্তক। ১৯৫৭ সালে পুস্তকটির নব সংস্করণ প্রকাশিত। প্রকাশক ঃ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা–৭। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১৮।

এই পুস্তক হইতে কিছু কিছু অংশ লেখকের জবানীতে ভাষা–বানানসহ হুবহু এখানে তুলিয়া ধরিতেছি। লেখক বলিতেছেন ঃ "আমার নাম শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতার নাম শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার পৈতৃক বাস হুগলী জেলার অন্তর্গত তড়া–আটপুর গ্রামে। কিন্তু এক্ষণে আমাদের দেশের নাম একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। বাস্তু–ভিটা আছে কি না তাহাও জানি না। আমি এখন এলাহাবাদে বাস করিতেছি।"

"ইংরেজের জন্য সিপাহী যুদ্ধের কালে রণক্ষেত্রে আমি শাণিত তরবারি হস্তে অশ্বে আরোহণ করিয়া সিপাহী সৈন্যের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" (পৃঃ ৩)

দিল্লী তখন অভ্যুত্থানকারী সিপাহীদের করায়ত্ত। ওই সময়ের কথা শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন–

"ইরেজ রাজত্ব লুপ্ত হইল বলিয়া হিন্দু প্রজার তো উৎসবের কোন কারণ ছিলই না, বরং কষ্টেরই বিশেষ কারণ হইয়াছিল। " তখন আমি অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুর মুখে এই কথা শুনিয়াছি, বাবুজি! আর সহ্য হয় না; শ্রীঘ্র ইংরেজ আগমন করুন,– পুনরায় শাসন দন্ড লউন,– ইহাই আমরা চাহি। পূর্বে আমরা রাম রাজ্যে বাস করিতেছিলাম।"

"সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানীগণ প্রত্যহ ভগবানকে ডাকিতেন, বলিতেন, হে ঈশ্বর! এদেশে ইংরেজের রাজত্ব পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত কর; জ্বালা আর সহিতে পারি না– সদাই শরীরে যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতেছে, মিশ্র বৈজনাথ, লালা লছমীনারায়ণ, রাজা নহবৎ রায়, চেৎরাম প্রভৃতি অনেক ধনবান ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তি গোপনে নাইনিতালস্থ পলায়িত ইংরেজগণের সহিত চিঠিপত্র লেখালেখি করিতেন এবং মুসলমান নবাবের গতিবিধি সমস্তই তাঁহারা এইরূপে ইংরেজের কর্ণগোচর করিতেন।" (পৃঃ ১৭৪–১৭৬)।

"রামপুরের নবাবকে এবং কাশীপুরের রাজাকে অশ্বারোহী সৈন্যের জন্য আবার পত্র লেখা হইল। তাঁহারা আবার প্রায় একশত সওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে

www.pathagar.com

পাঠাইলেন। এক সপ্তাহ পরে, রামপুর হইতে আরও পঞ্চাশ জন মুসলমান সওয়ার আসিল। কিন্তু মুসলমানকে সৈন্য শ্রেণী মধ্যে তখন ভর্তি করা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। কতকগুলি রাজপুত্র ঠাকুর দূর দেশ হইতে আপনা আপনি আসিল; বিশেষ সন্ধান লইয়া তাহাদিগকেও ভর্তি করিয়া লইলাম।" (পৃঃ ৩৪৭)।

"কিছুদিন পর খাঁ বাহাদুর শুনিলেন, বেরিলির কোন কোন অধিবাসী নাইনিতালস্থ ইংরেজগণের সহিত চিঠিপত্র লেখালেখি করিয়া থাকে। এ কথা শুনিয়াই অমনি তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি হইল। তিনি সহসা হুকুম দিলেন,- 'বেরিলি শহরে যে ব্যক্তি ইংরেজি জানে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ কর।' -- কাশীপ্রসাদ (দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই) মুখটি একেবারে শুকাইয়াছে। কাশী কহিল, 'দাদা! আর বুঝি রক্ষা নাই। কল্য নিশ্চয়ই আমাদিগকে আগে ধরিয়া লইয়া যাইবে। বেরিলি শহর মধ্যে আমরা দুই ভাই এক্ষণে যত ইংরেজি জানি এত ইংরেজি আর কেহই জানে না। কাজেই আমাদিগকে আগে ধরিবে।" (পৃঃ ১৮১)।

ইহার পর দুই ভাই ছদ্মবেশে পলায়ন করিলেন। জীবন-চরিতের বাকী অংশের অনেকটুকুই এই পলায়ন-পর্ব এবং তার অভিজ্ঞতা লইয়া রচিত। লেখক শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ মোটেই করেন নাই বলা যায়। জীবন-চরিত অনুযায়ী মাত্র একবার- তখন দিল্লী বিদ্রোহীদের হাতছাড়া হইয়াছে এবং সিপাহীরা বিচ্ছিন্ন-বিশৃঙ্খল ভাবে এখানে-ওখানে খণ্ড যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের মোকাবিলা করিতেছে।

সেই সময় লেখক যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়কার একটি কাহিনী।

"রবিবার। অপরাহ্ন। শিকার-সন্ধানে বহির্গত হই নাই। বেরাকে বসিয়া আছি এবং ডাক্তার নন্দকুমারকে জ্বালাতন করিতেছি। একজন আরদালি আসিয়া কহিল,- অল্প বয়স্কা এক সুন্দরী কাহারও সহিত কথা কহেন না। তাঁহার সহিত একটি বৃদ্ধ পুরুষ আছে; সে গান গায়, ডুগি বাজায় এবং লোকের সহিত কথাবার্তা কহে। হুজুরের যদি অনুমতি হয়, তবে সেতারওয়ালিকে এইখানে লইয়া আসি।

আমি। আচ্ছা লইয়া আইস।

দূত প্রস্থান করিলে আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ আবার কি এক রকম নূতন ঘটনা ঘটিল! আমাদের আসিয়া অবধি এ পর্যন্ত কোন নারীই ত হলদোয়ানিতে

www.pathagar.com

আইসে নাই। রমণীর শুভাগমন শুভ ফলসূচক সন্দেহ নাই। অথবা ইহা কোন মায়াবিনীর মায়া! জানি না, কোন্ ছলে কোন্ কামিনী কাহাকে ভুলাইতে আসিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে সেতারবাদিনী আসিল। রমণী সুন্দরী, আয়তলোচনা। বয়ঃক্রম বুঝি যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। করুক।--কামিনীর প্রকৃতি গম্ভীর, ধীর, স্থির। পুরুষের পানে দৃষ্টি নাই। তাহার নয়ন যুগল কেবল সেতারের দিকে নিহিত।

আমি কম্বল আসন পাতিয়া দিয়া শশিমুখীকে বসিতে বলিলাম। শশিমুখী সেতার-হস্তে সম্মুখে উপবিষ্ট; তৎপশ্চাতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে ঘেষিয়া সেই বৃদ্ধ ডুগি লইয়া বসিল। আমি সেতারবাদিনীকে কহিলাম,- 'আপনার নিবাস কোথায়? এবং শিক্ষাই বা কোথায়? তিনি কথা কহিলেন না? কেবল নিম্নে সেতার পানে চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ কিন্তু আমার কথার উত্তর দিল, কহিল,-'ইনি কথা কহেন না। গুরুর আজ্ঞা সেরূপ নহে। ইহাকে সেতার বাজাইতে অনুমতি করুন, বোধ হয় সেতারে আপনাকে পরিতুষ্ট করিতে সক্ষম হইবেন। যে রাগে, যে সুর, যে গান আপনি আলাপ করিতে বলিবেন, ইনি তাহাই হৃষ্টচিত্তে করিবেন।'

আমি। আমার কোন ফরমাইস নাই। যাহা উহার ইচ্ছা, তাহাই আলাপ করুন। রমণী অমনি বাম করে সেতার ধরিয়া দক্ষিণ পাণির তর্জ্জনীর সাহায্যে সেতারে ঝঙ্কার দিলেন। কি অপূর্ব মধুর রব!--অর্দ্ধ ঘন্টা ধরিয়া মেঘ রাগের আলাপ করিলেন। যাঁহারা সঙ্গীত কি, সেতার কি বুঝেন- তাঁহাদের মন মোহিত হইল। প্রায় এক হাজার শ্রোতা বা দর্শক রমণীকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সকলে সাবাস্ সাবাস্ ধ্বনি করিতে লাগিল।

মেঘ রাগ আলাপের পর রমণী কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইলেন। তারপর আবার সেতার ধরিলেন। কিন্তু সেতার বাজাইবার পূর্বে রমণী দক্ষিণ হস্ত সঞ্চালনপূর্বক ইঙ্গিতে কহিলেন, এইবার সমস্ত দর্শককে এ স্থান হইতে সরাইয়া দাও। আমার আদেশ অনুসারে, লোকসমূহ অনিচ্ছা সত্ত্বেও একে একে, দলে দলে, ধীরে ধীরে, নিতান্ত ভগ্ন মনে তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়িল। রহিলাম আমি, ডাক্তার নন্দকুমার এবং দশ বার জন উচ্চপদস্থ হিন্দুস্থানী সৈনিক কর্মচারী।

এবার খাম্বাজ রাগিনীতে সেতারে আলাপ হইতে লাগিল। গৎ বাজাইয়া শশিমুখী শেষে সেতারে খাম্বাজের গান ধরিলেন। কি মধুর, কি মধুর! চলুক, চলুক! যেন আজ আর শেষ হয় না!--দিন ফুরাইয়া যাউক, রাত্রি ফুরাইয়া যাউক- কিন্তু গান যেন ফুরায় না!--

www.pathagar.com

সেতারে গান চলিতেছে, মনুষ্য কণ্ঠে গান যেন গীত হইতেছে, সেতার যেন কথা কহিতেছে, কিন্তু গানটি কি আমরা বুঝিতেছি না। গানটি কি? জানিবার জন্য আমাদের লালসা বলবতী হইল। যখন আর পারিলাম না, তখন জোড় হাতে কহিলাম,-'হে সুন্দরি! হে গায়কে! হে মৌনবতি! তুমি সেতারের সঙ্গে সঙ্গে আপন কলকণ্ঠে ঐ গানটি গাহিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।'

চক্ষু চাহিয়া দেখি সম্মুখে হন্টার ও বারওয়েল সাহেবদ্বয় উপস্থিত। তাঁহারা গোলযোগ দেখিয়া প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমি সসম্ভ্রমে তাঁহাদের বসিবার জন্য উপযুক্ত আসন আনাইয়া দিলাম এবং সংক্ষেপে রমণীর বৃত্তান্ত ইংরাজী ভাষায় কহিলাম।

সাহেবদ্বয় উপবিষ্ট হইলে রমণী মধুর স্বরে আবার সেই গান সেতারে বাজাইতে লাগিলেন। আমি পুনরায় অনুনয়-বিনয় করিয়া রমণীকে ঐ গান সেতারের সহিত তদীয় কণ্ঠে গাহিতে অনুরোধ করিলাম।

রমণী আকাশপানে চাহিয়া দেবগণকে প্রণাম করিলেন। শেষে তিনি সেই বৃদ্ধ ব্যক্তির মুখপানে চাহিলেন। বৃদ্ধ কহিল,-'আচ্ছা গাও, সময় ঠিকই হইয়াছে।'

রমণী তখন সেতারের সহিত স্বীয় কণ্ঠে গান আরম্ভ করিলেন। সেতারের সুমধুর স্বরের সহিত কামিনীর সেই কোকিল-বিনিন্দিত কলকণ্ঠ স্বর মিশাইয়া গেল।-

সে গান হিন্দী ভাষায় বিরচিত। প্রথম ছত্র ব্যতীত সে গানের অন্য কোন অংশ আমার মনে নাই। তবে গানের ভাব আমার মনে আছে। ভাব লইয়া বাঙ্গালা ভাষায় সে গানের কতক অনুবাদ করিয়া দিলাম।

খাম্বাজ - একতালা।
শুন হে রাজন্, অমিয় বচন,
হয়েছে হে আজ দিল্লীর পতন।
বাদশা-বেগম ইংরেজ-চরণে
লুটিয়া পড়েছে, লয়েছে শরণ।।
ইত্যাদি।

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলে, হিমালয় উড়িয়া চলিলে, সম্মুখে হঠাৎ শত শত বিষম বজ্রাঘাত এককালে হইতে থাকিলে, মানুষ যত না চমকিত হয়, ত্রস্ত কম্পিত-কলেবর হয়, প্রথম দুই ছত্র গান শুনিয়া আমরা তাহারও অধিক হইলাম। অদ্য দিল্লীর পতন কি?-তবে কি ইংরেজের জয় হইয়াছে? পুনরায় কি

www.pathagar.com

ইংরেজ দ্বারা দিল্লী নগরী অধিকৃত হইয়াছে? এ শুভ সংবাদ এতদিন আমরা জানিতাম না। কিন্তু গায়িকা কেমন করিয়া জানিল? দিল্লীর পতন! তাও কি কখন সম্ভব হয়? আমরা স্বপ্ন দেখিতেছি! দেহও গুরুগুরু কাঁপিতে লাগিল। শুভ সংবাদকে সত্য বিবেচনা করিয়া এক একবার উচ্ছ্বাসে আনন্দে চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল। কিন্তু যখন শুনিলাম,–'বাদশা–বেগম ইংরেজ চরণে লুটিয়া পড়েছে, লয়েছে শরণ' তখন বাস্তবিকই আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলাম না। বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিয়া সেই গায়িকাকে কহিলাম,–'হে সুন্দরি! বল, তুমি কে? তোমার কথা সত্য কি না? তোমাকে এ গান কে শিখাইল? বল–বল, – দিল্লীর পতন!–এ সংবাদ সত্য কি না?'

হন্টার সাহেব ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন,–'বাপু! ব্যাপার কি? সত্য সত্যই কি দিল্লীর পতন হইয়াছে? অথবা এ রমণী আমাদিগকে ভুলাইবার জন্য শত্রুদল কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে?'

আমি। (ইংরাজীতে) কিছুই ত বুঝিতেছি না। ভিতরে অবশ্যই গভীর রহস্য আছে। কিন্তু রমণীর মোহিনী মূর্তি দেখিয়া এবং সরল স্বর শুনিয়া, আমার ত এমন মনে হয় না যে, এ রমণী মায়াবিনী, নিশাচরী!

হন্টার। সুন্দর মূর্তিটুকু এবং রসাল কথাটুকু, এই দুইটি একত্র হইয়াই ত মানুষকে মাটি করে।–

আমরা নীরব, নিস্পন্দ। রমণী পুনরায় সেতারের সহিত গান আরম্ভ করিলেন–

(ওহে) ভয় নাই আর, ভয় নাই আর,
নয়নে মেলিয়া দেখ একবার।
প্রভাত হইল, আঁধার ঘুচিল,
কমল ফুটিল, ঐ রবি–কিরণ।।
(হয়েছে হে আজ দিল্লীর পতন!)

আমার অঙ্গ দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। মাথা ঘুরিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। অন্যান্য শ্রোতারাও মন্ত্রমুগ্ধবৎ ধীর, স্থির। কথা কহেন, এমন শক্তি বুঝি কাহারও নাই। গান শেষ হইলে হন্টার সাহেব হিন্দী ভাষায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,– 'আপনার গানে আমরা বড়ই পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনি সত্য করিয়া বলুন, দিল্লীর পতন যথার্থ ঘটিয়াছে কি না? ইংরেজের জয় হইয়াছে কি না? বাদশা–বেগম বন্দী হইয়াছে কি না? আপনি এ সংবাদ কোথা হইতে পাইলেন? এ গান কাহার তৈয়ারি? এ গান কাহার নিকট আপনি গাহিতে শিখিলেন?'

www.pathagar.com

রমণী সেতার রাখিয়া আমার দিকে চাহিয়া জোড় হাতে উত্তর করিলেন,–'বাবু সাহেব! আপনি চিনিতে পারিতেছেন না?'

আমি চমকিয়া উঠলাম। বিস্ময় শত গুণে বৃদ্ধি হইল। ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিলাম,–'তুমি কি মিশ্র বৈজনাথের লোক?'

তখন সেই রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল। তৎক্ষণাৎ স্ত্রী–বেশ ফেলিয়া দিল। ভিতরে পুরুষ–বেশ আঁটা ছিল। মুহূর্ত মধ্যে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেই পুরুষ দাঁড়াইয়া মুক্ত কণ্ঠে গোষণা করিল, 'হুজুর! সত্য সত্যই ইংরেজের জয় হইয়াছে। দিল্লীর পতন হইয়াছে।' আমরাও সেই সঙ্গে ধ্বনি করিয়া উঠিলাম, 'জয়, ইংরেজের জয়! জয়, ইংরেজের জয়! জয় জয়– দিল্লীর পতন।' নিয়ম রহিল না, প্রকরণ রহিল না, পদ্ধতি রহিল না, লঘু–গুরু ভেদ রহিল না,–সকলে আনন্দে উন্মুক্ত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে কহিতে লাগিল,–

'জয়, ইংরেজের জয়,
জয়, ইংরেজের জয়!'

www.pathagar.com

এক ছিল শাহ্‌যাদী

দিল্লীর শাহী মহলের এক শাহ্‌যাদী। নাম তার কুলসুম যমানী। ইংরেজদের পুনর্দখলে যাওয়ার পর দিল্লীতে আরম্ভ হইয়াছে যে ধ্বংসলীলা, তাতে শাহী মহলে আটকা পড়া কুলসুম যমানীর মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে রাত্রির আকাশ! পরিবারের কে কোথায় আছে জানা নাই। সসম্মানে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কোন আশার ক্ষীণ আলোও চোখে পড়িতেছে না!

বিপ্লবী শাহ্‌যাদা ফিরোজ শাহ্‌র দুই অবিবাহিতা বোন– মরিয়ম যমানী, কুলসুম যমানী। ফিরোজ শাহ্ নাকি এখন অযোধ্যায় কোথাও যুদ্ধরত! বড়বোন মরিয়ম যমানীরও কোন পাত্তা নাই। হয়তো এই ধ্বংসলীলায় – কি করিবে এখন অষ্টাদশী তরুণী এই শাহ্‌যাদী কুলসুম যমানী?!

তরুণের ছদ্মবেশে রাত্রির গাঢ় অন্ধকারেই শাহী মহলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল শাহ্‌যাদী। অভ্যাস না থাকিলেও বাধ্য হইয়া পায়ে হাঁটিয়া অগ্রসর হইল বিপদসঙ্কুল দুর্গম পথে। অযোধ্যার পথে?

বিপদে পড়িলে মানুষ নাকি অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া তোলে। সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করিয়া তুলিল কুলসুম যমানী। বাকি রাতটুকুতে প্রায় চৌদ্দ মাইল পথ হাঁটিয়া কুলসুম যমানী যখন এক ক্ষুদ্র বস্তির সামনে আসিয়া পড়িল, তখন ভোরের আলো চারদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

চরম ক্লান্তি আর অবসাদে বিপর্যস্ত শাহ্‌যাদী এক কুঁড়েঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। আগাইয়া আসিল এক প্রৌঢ় গৃহস্থ। এমন সুদর্শন তরুণকে দেখিয়া বিস্মিত প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করিল– কে তুমি বাবা, কি চাও?

উত্তর আসিল– বড় বিপদে পড়েছি আমি! ক্লান্তিতে–অবসাদে বেহাল-- খানিক বিশ্রামের অনুমতি চাই।

প্রৌঢ় ভাবিল, দিল্লীর যা অবস্থা– এ তরুণ হয়তো কোন আমীরযাদা হবে। প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক। করুক, আমার কুঁড়েঘরেই খানিক বিশ্রাম করে নিক!

প্রৌঢ় বলিল, ভেতরে এস। বাড়িতে স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নাই। তোমার চাইতে কিছু বেশি বয়সের এক ছেলে ছিল -- দিন কয় আগে সে পরপারে চলে গেছে!

ঘরে ঢুকিয়া শাহ্‌যাদী দেখিল, সেখানে জিনিসপত্র বিশেষ কিছুই নাই, ঘরের

www.pathagar.com

মাঝখানে একটা খাটিয়া। খাটিয়ার উপর বসিয়া কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল শাহ্‌যাদী। ক্ষণপরে গৃহিনী কিছু নাশ্‌তা আনিয়া মেহ্‌মানের সামনে রাখিল। শাহ্‌যাদী তাতেই ক্ষুধা নিবৃত্ত করিয়া বলিল, আমি ঘরের হুড়কোটা লাগিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমুব- মেহেরবানি করে দুপুরের দিকে জাগিয়ে দিয়ো মা। ---

হুড়কোটা নিজেই লাগাইয়া দিয়া গৃহিনী চলিয়া গেল। দড়ির তৈরি খসখসে খাটিয়ার উপর শুইয়া অদৃষ্টের পরিহাসের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া গেল শাহ্‌যাদী। ---

ভিণ্ডি আর রুটি দিয়া দুপুরের খাওয়া শেষ করিয়া শাহ্‌যাদী অনুনয়ের সুরে গৃহস্থকে বলিল, যত দামই লাগুক- আমাকে একটা ভাল ঘোড়া সংগ্রহ করে দিতে হবে বাবা, আজই।-- এই বলিয়া শাহ্‌যাদী কয়েকটা মোহর প্রৌঢ়ের হাতে তুলিয়া দিল।

সন্ধ্যার আগেই ঘোড়া নিয়া প্রৌঢ় ফিরিয়া আসিল। বেশ ভাল তাজীই আনিয়াছে প্রৌঢ়। গৃহস্থ ও গৃহিনীর কাছে বিদায় নিয়া শাহ্‌যাদী ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারেই অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঘোড়া চলিতে লাগিল। কোথায় অযোধ্যা, কত দূরে লাখ্‌নৌ- কিছুই জানে না শাহ্‌যাদী। মধ্যরাত্রি অতীত হইয়াছে, গোরাদের ভয় শাহ্‌যাদীর মন হইতে প্রায় দূর হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মনে চাপিয়া বসিয়াছে নির্জনতার ভয়! ঘোড়া হইতে নামিয়া একটা উঁচু ভূমিতে দাঁড়াইল শাহ্‌যাদী। সেখানে ছোটবড় সারিবদ্ধ কয়েকটা গাছ, সামনে এক সারি ঝোপ। আকাশে অনেক তারা। শাহ্‌যাদী ঘোড়াটার পালান একটা গাছের সাথে বাঁধিয়া তাহাতেই হেলান দিয়া বসিল। কাটিয়া যাইতে লাগিল তন্দ্রাচ্ছন্ন রাত্রির প্রহর। --হঠাৎ শেয়ালের চীৎকারে শাহ্‌যাদীর নিদ্রাভাব কাটিয়া গেল।

ভয়ে ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল শাহ্‌যাদী, পোশাক-পরিচ্ছদ ঠিকঠাক করিয়া আবার সওয়ার হইল ঘোড়ার পিঠে। অসমতল ভূমির লতাগুল্ম ভেদ করিয়া ঘোড়া চলিতে লাগিল। ---

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শাহ্‌যাদী আসিয়া পড়িল এক ক্ষুদ্র নদীর তীরে। জেলে-জেলেনীরা নদীতে মাছ ধরিতেছিল। তাহাদের দেখিয়া শাহ্‌যাদীর মনে সাহস দেখা দিল। ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিয়া শাহ্‌যাদী নদীতে হাত মুখ ধুইয়া নিল। তারপর আবার শুরু হইল তার পথ চলা। ---

www.pathagar.com

বেলা দ্বিপ্রহরে শাহ্‌যাদীর ঘোড়া আসিয়া থামিল এক জাঠ পশুপালকের বাথানের সামনে। দস্যুর মত দেখিতে এক তাগড়া জাঠ ছুটিয়া আসিল, ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল-- কে তুমি? নেমে পড়। ঘোড়াসহ সঙ্গে যা কিছু আছে, আমাকে দিয়ে দাও।

হতভম্ব শাহ্‌যাদী ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিতে না নামিতেই হিংস্র জাঠ কি মনে করিয়া এক টানে শাহ্‌যাদীর মাথার পাগড়ী খুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে বিকট হাস্যে জাঠ মন্তব্য করিল, আরে! তু-ভি তো মেরা উমদা খোরাক--

জাঠ এক হাতে শাহ্‌যাদীর এক হাত এবং অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া টানিয়া নিয়া চলিল নিজের বাড়ির দিকে। বাড়ি গিয়ে ঘোড়াটা বাইরে বাঁধিয়া রাখিয়া শাহ্‌যাদীকে একটা ঘরের অভ্যন্তরে ঠেলিয়া দিল।

জাঠের বাড়িতে এক যুবতী স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ নাই। স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া তাহারা একপাল গো-মহিষ পালন করে, আর সুযোগ মত অসহায় মুসাফিরের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে। আজ জাঠের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে অপরূপ সুন্দরী এক তরুণী, সঙ্গে হীরা-জওহেরাত ও একটি উত্তম ঘোড়া!

জাঠকে তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, কাকে এনে ঘরে বন্দী করলে? একটা মাইয়্যা--- জবাব দিয়াই গো-মহিষ সামলানোর জন্য ছুটিয়া গেল সেই জাঠ দস্যু। অসম্পূর্ণ জবাব শুনিয়া জাঠের স্ত্রীর মনে বিচিত্র রকমের তোলপাড়!

কিচ্ছুক্ষণ পর জাঠের স্ত্রী গিয়া ঢুকিল বন্দিনী শাহ্‌যাদীর ঘরে। সে শাহ্‌যাদীর রূপ ও যৌবনের জেল্লা দেখিয়া থতমত খাইয়া গেল। তার মনে একদিকে সহানুভূতি, অন্যদিকে ক্রোধ। শাহ্‌যাদীকে নিজের দেহাতী ভাষায় যা বলিল, তার অর্থ হইতেছে- সে এখানে কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছে?

কান্নাভারাক্রান্ত কণ্ঠে শাহ্‌যাদী প্রায় সব কথাই খুলিয়া বলিল এবং নির্মম জাঠের হাত হইতে তাকে রক্ষা করবার আবেদন জানাইল। কি যেন চিন্তা করিতে করিতে জাঠের স্ত্রী ঘরের বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। জাঠের স্ত্রী মাটির শানকিতে ভাত-তরকারী আনিয়া শাহ্‌যাদীর সামনে রাখিল। একটা মাটির পাত্রে পানি আগাইয়া দিল। ক্ষুধাতৃষ্ণায় বেহাল শাহ্‌যাদী তাহাতেই তৃপ্তি খুঁজিয়া পাইল। তারপর নিজের দুরদৃষ্টের কথা মনে পড়িতেই কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। জাঠের স্ত্রী কাছে গিয়া বলিল, রোনো ম্যৎ। আমি তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করব।

কিছুক্ষণ পর। জাঠ খাইতে বসিয়াছে। স্ত্রী সামনে বসিয়া খাওয়াইতেছে।

www.pathagar.com

উভয়ের মধ্যে নানা রকম কথাবার্তা। খাওয়া শেষ করিয়া জাঠ উঠিবার উপক্রম করিতেছে। এমন সময় স্ত্রীর প্রশ্ন, মেয়েটাকে ধরে এনেছ কেন?

আমোদের সুরে হাসিতে হাসিতে বলিল জাঠ, মৌজ করেগা।

ঃ তুম্ মৌজ করগে ঔর হম্- রুখিয়া উঠিল জাঠের স্ত্রী।

ঃ আরে হট্ জা- তুই হলি আওরত--- ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঃ তবে রে মিন্‌সে- বলেই স্ত্রী স্বামীর মাথার লম্বা চুল দুই হাতে শক্ত করিয়া টানিয়া ধরিল। উভয়ের মধ্যে আরম্ভ হইল ধস্তাধস্তি। আর এই সুযোগে শাহ্‌যাদী বাইরে আসিয়া ঘোড়ার পিঠে চাপিয়া বসিল। ঘোড়ার পাঁজরে পা লাগাইতেই ঘোড়া তীরবেগে ছুটিয়া চলিল। অন্ধকারের বুক চিরিয়া দূরের পথে ছুটিয়া চলিল ঘোড়া। ঘন্টা তিনেকের মধ্যেই শাহ্‌যাদী প্রায় তিরিশ মাইল দূরে আসিয়া পড়িল। তবুও মনে তার কত ভয়। ওই শয়তান জাঠ হয়তো পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিতেছে! এই ভয় শাহ্‌যাদীকে দিশাহারা করিয়া তুলিল। অভুক্ত ঘোড়াও দিশাহারা অবস্থায় সওয়ারীকে পিঠে নিয়া সামনের পথে ছুটিতে লাগিল।

চলার পথে নানা স্থানে ছিল গাছপালা। অন্ধকারে সেইগুলির অবস্থান সঠিকভাবে চোখে পড়িতেছিল না। এমনি একটা গাছের নীচ দিয়া যাইবার সময় একটা ডালের আঘাত লাগিল শাহ্‌যাদীর মাথায়। ডালের আঘাতে শাহ্‌যাদী বেঁহুশ হইয়া ঘোড়ার পিঠ হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। দিশাহারা ছুটন্ত ঘোড়া কিছুই টের না পাইয়া ছুটিয়া চলিল সামনের দিকে। ---

ভোরের আলো ছড়াইয়া পড়িল চারিদিকে। কিন্তু শাহ্‌যাদী তখনো অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে। ---

মাইল তিনেক দূরে এক সমৃদ্ধ জনপদ। সেই জনপদের এক তালুকদার বাড়ির সন্তান তসনীম বেগ ভোরে ঘোড়ায় চড়িয়া মামার বাড়ি বেড়াইতে চলিয়াছে। যে পথে শাহ্‌যাদীর ঘোড়া ছুটিয়া গেল, সেই পথেই চলিতেছে তসনীম বেগের ঘোড়া। তরুণ যুবক তসনীম বেগ অযোধ্যার বুনিয়াদী তালুকদার বংশের ছেলে। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। দুল্‌কি চালে চলিতেছে তার ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে বসিয়া গযলের কলি আওড়াইতেছে তসনীম বেগ। মন তার কোন্ সুদূরে পাড়ি জমাইয়াছে, কে জানে! অন্যমনস্ক সওয়ারী তসনীম বেগ হঠাৎই বিস্মিত হইয়া ঘোড়ার লাগাম টানিয়া ধরিল। তার সামনেই একটি সুন্দরী তরুণী মাটিতে পড়িয়া আছে!!

www.pathagar.com

ঘোড়া হইতে নামিয়া তসনীম বেগ অসাড় তরুণীটির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তরুণীটি কি জীবিত নাই? নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। হয়তো মরে নাই, কোন কারণে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া আছে। চেহারার দীপ্তি অবলোকন করিয়া তসনীম বেগের মনে দ্বিধা জাগিল। তবুও ঔৎসুক্য দমন করিতে না পারিয়া তরুণীটির পাশে গিয়া বসিল। ইতস্তত করিতে করিতে একবার শাহ্‌যাদীর সুন্দর সুডৌল হাতখানি ধরিয়া নাড়াচাড়া করিযা দেখিল- এ যে জ্যান্ত মেয়ের হাত! নাড়ীর উপর আঙ্গুল রাখিল- ধীরে ধীরে নাড়ী চলিতেছে! দ্বিধান্বিত সতর্কতার সঙ্গে মেয়েটির বাম বুকের উপর নিজের কান রাখিয়া বুঝিল — হৃৎপিন্ডের স্পন্দন স্পষ্ট। মুহূর্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তসনীম বেগ পানির সন্ধানে ছুটিয়া গেল। ফিরিয়া আসিল নিজের কাপড় পানিতে ভিজাইয়া।

অচেতন শাহ্‌যাদীর চোখে মুখে সেই ভিজা কাপড়ের পোঁছ দিতে দিতে এবং হাতের তালু ও পায়ের তলা রগড়াইতে রগড়াইতে তসনীম বেগ দেখিল- মেয়েটির ঠোঁট ও চোখের পাতা নড়িতেছে। কিছুক্ষণ পর আপনিই শাহ্‌যাদীর চোখের পাতা খুলিয়া গেল। চোখে পড়িল তার চোখের দিকে পরম আগ্রহে তাকাইয়া থাকা আরও দু'টি চোখ। ক্ষণিকের তরে ঘটিল চার চোখের মিলন!

শাহ্‌যাদী উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিয়াও পারিল না। তার মাথার ব্যথাও ক্রমে বাড়িতেছে। তসনীম বেগ তখন হাত ধরিয়া শাহ্‌যাদীকে বসাইল। শাহ্‌যাদীও কোন আপত্তি না করিয়া তসনীম বেগের মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল।

ঃ আপনি কে?— শাহ্‌যাদীর প্রশ্ন।

ঃ আমি রুস্তমপুরের তালুকদার বাড়ির ছেলে, নাম তসনীম বেগ। আব্বা ইন্তেকাল করেছেন। আম্মা আছেন, আছে আরও ছোট দুই ভাই। ব্যস, এই আমাদের পরিবার। যাচ্ছিলাম মামার বাড়ি। হঠাৎ আপনাকে এখানে পড়ে থাকতে দেখে --- আপনার পরিচয়?

ঃ আমার পরিচয় তো এখন অতীতের এক স্মৃতি মাত্র! মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলাম শুধু --- মেহেরবানি করে আমাকে যদি লাখ্‌নৌ পর্যন্ত পৌছে দেন, তাহলে --- তসনীম বেগ তাকাইয়া আছে শাহ্‌যাদীর দিকে। তাতে বিব্রত বোধ করিল শাহ্‌যাদী। বলিল, অমন করে কি দেখছেন?

ঃ দেখছি হয়তো কোন মুঘল শাহ্‌যাদীর বিপর্যস্ত এক জীবন্ত তসবীর, ভাগ্যবিড়ম্বনার এক করুণ ছবি! — তসনীম বেগের উত্তর।

শাহ্‌যাদী নীরব, দৃষ্টি তার অবনত। তসনীম বেগ বলিতে লাগিল- আপনি

www.pathagar.com

দিল্লী থেকে পালিয়ে এসেছেন, আর যেতে চান লাখ্‌নৌ–এ। কিন্তু লাখ্‌নৌ এখান থেকেও অনেক দূরে। এখন এ–অবস্থায় আপনার পক্ষে লাখ্‌নৌ রওনা হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। সেখানে চলছে ঘোরতর যুদ্ধ। যুদ্ধে যদি বেগম হাসরত মহল জয়ী হন, তবে সব দিক দিয়েই মঙ্গল। তা না হলে সেখানেও শুরু হবে মহাপ্রলয়। দিল্লীর মতই ধ্বংস হয়ে যাবে লাখ্‌নৌ।

ঃ শাহ্‌যাদা ফিরোজ শাহ্‌র খবর কিছু জানেন?

ঃ বিপ্লবী সেই ফিরোজ শাহ্? আপনি কি তাহলে ---

ঃ তিনি আমার ভাই। আমার নাম কুলসুম যমানী।

ঃ ও! আপনি সেই বিপ্লবী শাহ্‌যাদার বোন!

ঘোড়ার কাছে আসিয়া তসনীম বেগ আমন্ত্রণ জানাইল কুলসুম যমানীকে। বলিল– আসুন, আপনাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাই। আগে সুস্থ হয়ে উঠুন। তারপর ফিরোজ শাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হলে আর তাঁর সঙ্গে আপনার মিলিত হওয়ার পরিস্থিতি থাকলে সসম্মানেই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব তাঁর কাছে।

ঃ তেমন পরিস্থিতি কি ---

ঃ যদি না–ই আসে, আমাদের বাড়িতে আপনার কোন অসম্মান হবে না!

আর কোন কথা না বলিয়া শাহ্‌যাদী খুব কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হইতে পারিল না। অগত্যা তসনীম বেগ শাহ্‌যাদীকে পাঁজাকোলা করিয়া ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া নিজেও উঠিয়া বসিল। ভারসাম্যহীন শাহ্‌যাদীকে নিজের সামনে বসাইয়া নিরাপত্তার জন্য এক হাতে তার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া রাখিল তসনীম বেগ। ধীরে ধীরে ঘোড়া চলিতে লাগিল। চলিতে লাগিল তসনীম বেগের বাড়ির পথে।

(কাহিনী–উৎস ঃ জগলুল হায়দর আফ্‌রিক রচিত 'বিপ্লবী নায়িকা')

www.pathagar.com

দীপক সন্ধ্যার রূপ–কাহিনী

যেন এক রূপকথা।

ভোর হয় নাই তখনো। নিদ্রামগ্ন তখনো দিল্লীবাসীরা। শাহী মহল ঘুমে অচেতন। হঠাৎ সিপাহীদের জয়ধ্বনিতে দিল্লী জাগিয়া উঠিল। আঠার শ' সাতান্ন সালের এগারোই মে'র প্রত্যুষ। মিরাটের আড়াই হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সিপাহী সেখানকার কয়েদখানা ভাঙ্গিয়া তাহাদের সাথী–সিপাহীদের মুক্ত করিয়া সারা রাত্রি চল্লিশ মাইল রাস্তা মার্চ করিয়া এই সুবৃহে সাদেকের সময় যমুনার সেতু পার হইয়া দিল্লী প্রাচীরের নীচে আসিয়া হাজির হইয়াছে। তাহাদের অগ্রভাগে ২৫০ জন অশ্বারোহীর এক অগ্রবর্তী বাহিনী। ইংরেজ ঐতিহাসিক বল–এর কথায়, "অগ্রভাগে প্রায় ২৫০ জন অশ্বারোহী ইউনিফর্মে সম্পূর্ণ সজ্জিত হয়ে বুকের উপর মেডেল ঝুলিয়ে – যে সব মেডেল তারা পেয়েছিল বৃটিশ সরকারের সপক্ষে লড়াই করে– আত্মবিশ্বাসে ও দৃঢ়তায় অনুপ্রাণিত হয়ে, ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছিল। তাদের পিছনে, খুব বেশি পিছনে নয়, ধূলিধূসরিত লাল ইউনিফর্মে অসংখ্য পদাতিক সূর্যের আলোকে তাদের বেয়নেট ঝকমকিয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটছিল। এই অগ্রগামী জনতার মধ্যে এতটুকু দ্বিধাসঙ্কোচ ছিল না। তারা যে সফল হবে এই বিশ্বাস নিয়েই তারা এগিয়ে আসছিল।" (হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭২)।

দিল্লীবাসীরা তখন জাগিয়া উঠিয়াছে। জাগিয়া উঠিয়াছে সমগ্র নগরী। প্রাণের সাড়া পড়িয়া গেল সমগ্র নগরীতে। দেখিতে দেখিতে হাজার হাজার দিল্লীবাসী সিপাহীদের পাশে দাঁড়াইল। এক হইয়া মিশিয়া গেল জোয়ান–জনতা। অভ্যুত্থান আর সিপাহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না, ছড়াইয়া পড়িল জনসাধারণের মধ্যেও। সিপাহী অভ্যুত্থান পরিণত হইয়া গেল গণ–অভ্যুত্থানে।

শাহী মহলের ঝরোকা খুলিয়া গেল। ঝরোকায় আসিয়া দাঁড়াইলেন অশীতিপর বৃদ্ধ বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্ যাফর। জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল প্রাচীরের নীচে সমবেত সিপাহীবৃন্দ। তাহারা জানাইল–

ঃ ধর্মের জন্য, দেশকে ফিরিঙ্গিদের হাত হইতে মুক্ত করিবার জন্য, কোম্পানী–রাজের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি। আপনি আমাদের বাদশাহ্। সম্মতি দিন, সমগ্র হিন্দুস্থানকে আমরা মুক্ত করিব।

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্ উত্তর দিলেন–

ঃ কোম্পানী–রাজের বৃত্তির উপর আমাকে নির্ভর করিতে হয়। আজ আমার

www.pathagar.com

নিজস্ব কোন খাজাঞ্চীখানা নাই। কোথা হইতে আমি তোমাদের মাহিনা দিব?

ঃ আমরা আশ্বাস দিতেছি, কোম্পানী-রাজের ধনাগার দখল করিয়া আমরা আপনার কাছে টাকা আনিয়া দিব।

ঃ এই রকম কাজের ফলাফল তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ? শেষ পর্যন্ত তোমরা বিশ্বস্ত থাকিবে?

সমস্বরে সকলে সম্মতি জানাইল। বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্ যাফর সিপাহীদের প্রবেশ করিবার জন্য প্রাসাদের দরওয়াজা খুলিয়া দিতে অনুমতি দিলেন।

১১ই মে'র এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ দিল্লীর ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত দেখা দিল। দিল্লীর রেসিডেন্ট স্যার থিওফিলাস মেটকাফ ও কমিশনার ফ্রেজার এই খবর শোনামাত্র ব্রিগেডিয়ার গ্রেভ্স্‌কে কাশ্মীর দরওয়াজা ও সেলিমগড় রক্ষার জন্য হুকুম দিয়া কিছু লস্করসহ নিজেরা ছুটিলেন লালকেল্লা বাঁচাইবার জন্য। গিয়া দেখিলেন, জোয়ান-জনতা লালকেল্লার সিঁড়ি অতিক্রম করিতেছে। ফ্রেজার ও ক্যাপ্টেন ডগলাস প্রাসাদ রক্ষীদের হুকুম দিলেনঃ বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ কর। এদেশীয় প্রাসাদ-রক্ষীরা নীরব রহিল। ফ্রেজার একজন সিপাহীকে গুলী করিয়া হত্যা করিলেন। উত্তেজিত সিপাহীরা ফ্রেজারকে প্রাসাদের সিঁড়িতে পায়ে দলিয়া পিষিয়া ফেলিল। লালকেল্লায় আবার উত্তোলিত হইল তখনকার ভারতের স্বাধীন পতাকা।

অন্যদিকে, বিগ্রেডিয়ার গ্রেভ্স্ কিছু সিপাহী ও দুইটি কামানসহ মেজর এবট্‌কে কাশ্মীর দরওয়াজায় পাঠাইয়া দিলেন। আর দুইটি কামান ও একদল সিপাহী দিয়া কর্ণেল রিপ্‌লেকে পাঠাইলেন সেলিমগড়ে। কিন্তু মোকাবিলা করিতে গিয়া দুই পক্ষের সিপাহীরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল। প্রাণ হারাইল ইংরেজ অফিসারগণ।

লালকেল্লার অনতিদূরে ভারতের অন্যতম সর্ববৃহৎ অস্ত্রাগার। ১০ হাজার বন্দুক, ৯ লক্ষ গুলী, ১০ হাজার ব্যারেল বারুদ, ছোট-বড় প্রচুর কামান ও কামানের গোলায় পরিপূর্ণ। মাত্র ৮ জন ইংরেজ ও একদল সিপাহী নিয়া একজন লেফটেনান্ট অস্ত্রাগার প্রহরায় নিয়োজিত। বিদ্রোহীরা সেই অস্ত্রাগার আক্রমণ করিয়াছে। এই অস্ত্রাগার দখল করিতে পারিলে বিদ্রোহীরা হইবে প্রচুর অস্ত্র ও গোলা-বারুদের অধিকারী। তাহাদের কোম্পানী-রাজকে উৎখাত করিবার উদ্দেশ্য সফলতার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইবে। অথচ বিপুল সংখ্যক বিদ্রোহীর আক্রমণ হইতে জনাকতক প্রহরীর সাহায্যে এই অস্ত্রাগারকে ইংরেজের নিয়ন্ত্রণে রাখাও সম্ভব নয়। তাহা হইলে? মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করিয়া নিলেন লেফটেনান্ট

www.pathagar.com

উইলোবি। একটা দিয়াশলাই জ্বালাইয়া বারুদে ফেলিলেন উইলোবি। এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দে কাঁপিয়া উঠিল সমগ্র দিল্লী নগরী। উইলোবিসহ অস্ত্রাগারে উপস্থিত সকলেই ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। প্রাণ হারাইল অস্ত্রাগারের চতুষ্পার্শ্বে বসবাসরত স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাসহ দিল্লীর বহু নিরীহ অধিবাসী। অনেক সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইল দেশের মুক্তি-সংগ্রামীরা।

তারপর দিল্লী জুড়িয়া আরম্ভ হইল ধ্বংস ও মৃত্যুর নির্মম তাণ্ডব। কোম্পানী-রাজ হারাইল দিল্লীর অধিকার। সন্ধ্যার পর সিপাহীরা সমবেত হইল লালকেল্লায়, এবং সর্বসম্মতিক্রমে মুঘল সম্রাটদের শেষ বংশধর অশীতিপর বৃদ্ধ কবি বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্ যাফরকে ভারতের স্বাধীন সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল।

বাহাদুর শাহ্ যাফর। বয়োভারে বৃদ্ধ, ইংরেজ কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাহীন, নামে মাত্র এক মুঘল সম্রাট। তবুও, ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলিয়াম কে'র মতে, "বাদশাহ্ শুধু একটা নাম মাত্রে পর্যবসিত হলেও কেবলমাত্র এই নামটাই ভারতীয় রাজাদের ও জনসাধারণের নিকট একটা জীবন্ত ক্ষমতাশীল শক্তি হিসাবে বেঁচে ছিল। দিল্লীর বাদশাহী কেবল মাত্র কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল বটে, তবু সকলের নিকট এই কিংবদন্তী একটা গৌরবের বিষয় ছিল, ভারতবাসীর হৃদয়ে এটি গভীরভাবে অঙ্কিত হয়েছিল।" (কে' ঃ হিষ্ট্রি অব সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২)। রজনী-কান্ত গুপ্ত বলেন, "কবি যেমন উহা (দিল্লী) আপনার কবিত্ব শক্তির উদ্দীপক ভাবিতেন, শিল্পী যেমন উহা আপনার শিল্প চাতুরীর বিকাশ ক্ষেত্র বলিয়া মনে করিতেন, ঐতিহাসিক যেমন উহা আত্মগুণগরিমার পরিচয় স্থল ভাবিতেন, ভারতের হিন্দু মুসলমানগণও তেমনি উহা আত্মসম্মান ও আত্মগৌরবের নিদর্শন ভূমি বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন।" (সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৪৩)। জাষ্টিন ম্যাকার্থীর মতে, বাহাদুর শাহ্‌কে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করার ফলে "বিদ্রোহীরা এক মুহূর্তের মধ্যে একজন নেতা, একটি পতাকা, এবং একটি আদর্শ পেয়ে গেল, এবং তার ফলে যা ছিল কেমলমাত্র সিপাহীদের একটা সামরিক বিদ্রোহ- এক নিমেষে সেটা পরিণত হয়ে গেল একটা বৈপ্লবিক যুদ্ধে। বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ভুক্ত সব বিদ্রোহীদের নিকট একমাত্র বাহাদুর শাহ্‌ই একটা গ্রহণযোগ্য ও দৃশ্যমান নায়কত্ব দিতে সক্ষম ছিলেন।- বিদ্রোহীরা অজ্ঞাতসারে ইতিহাসের একটি অতি সংকটপূর্ণ মুহূর্তকে এইভাবে তাদের আয়ত্তাধীনে আনতে সক্ষম হয়েছিল এবং এইভাবে একটা সামরিক বিদ্রোহকে ধর্মীয় ও জাতীয় যুদ্ধে রূপান্তরিত করতে

www.pathagar.com

পেরেছিল।" (জাষ্টিন ম্যাকার্থী ঃ এ শর্ট হিষ্ট্রি অব আওয়ার ওন টাইম্‌স্‌, ১৯২৩, পৃঃ ১৭২)।

"বাহাদুর শাহ্‌ বিদ্রোহে যোগ দেবার দু'এক মাসের মধ্যেই সারা উত্তর ভারতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। বাংলাদেশ থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত সিপাহী বাহিনীগুলি একটার পর একটা বিদ্রোহ করে বাহাদুর শাহ্‌র পতাকাতলে সমবেত হতে লাগল, বহুস্থানে জনসাধারণই অগ্রণী হয়ে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাল। নিমেষের মধ্যে ভারতের একটা বিশাল অংশ থেকে বিদেশী শাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে, হিন্দু মুসলমান সকলেই বাহাদুর শাহ্‌কে তাদের সর্বাধিনায়ক বলে স্বীকার করে নিল। এমন কি নানাসাহেব পর্যন্ত যেদিন বিদ্রোহ করে পেশোয়াশাহী পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য ফতোয়া জারি করলেন, সেদিন তাঁকেও বাহাদুর শাহ্‌র সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। লর্ড ক্যানিং ও জন লরেন্স স্পষ্টই দেখতে পেলেন যে, দিল্লীর মোঘল প্রাসাদ বিদ্রোহীদের দখলে চলে যাবার জন্য ও বাহাদুর শাহ্‌র বিদ্রোহের নায়কত্ব গ্রহণ করার ফলে বিদ্রোহীদের ইজ্জত ও প্রতিপত্তি সারা ভারতের মানুষের কাছে অনেক বেড়ে গেল। বাহাদুর শাহ্‌র নামটাই বিদ্রোহীদের সর্ববৃহৎ প্রাথমিক বিজয় ও ইংরেজের সব থেকে বড় পরাজয়। এইরূপ বৈপ্লবিক সম্ভাবনাপূর্ণ অবস্থায় এখন থেকে বিদ্রোহী পক্ষের সব থেকে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়- ভারত ব্যাপী এই গণবিদ্রোহকে পরিচালনা করবার জন্য একটি শক্তিশালী নেতৃত্ব গঠন করা, যার উপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে তাদের চূড়ান্ত বিজয় অথবা চূড়ান্ত পরাজয়।" (প্রমোদ সেনগুপ্ত ঃ মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭, পৃঃ ৯০-৯১)।

যে পরোয়ানার দ্বারা সিপাহীরা বাহাদুর শাহ্‌কে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, সেই একই পরোয়ানার দ্বারা আরও ঘোষিত হইল যে, সিপাহীরা একটা সামরিক কোর্ট স্থাপন করিবে, এবং তাহাই হইবে নূতন শাসনযন্ত্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী অঙ্গ। ইংরেজদের গুপ্তচর মুন্সী জীওনলালের ডায়রী অনুযায়ী, "১২ই মে থেকে সিপাহীরা প্রাসাদের অফিসগুলি দখল করেছে এবং দেওয়ান-ই-খাসে তাদের পাহারা বসিয়েছে। তারা দাবী করেছে যে, প্রতিদিন দরবার বসাতে হবে ও সেখানে তাদের প্রতিনিধি থাকবে। বাহাদুর শাহ্‌র শাসন-কর্ম পরিচালনা করার জন্য যেসব লোক থাকত, তাদের জায়গায় তারা নিজেদের লোক নিয়োগ করেছে।" (মেটকাফ সম্পাদিত 'টু নেটিভ ন্যারেটিভ্‌স্‌', পৃঃ ৬০-৬১)। সম্রাটের পুরনো দরবারীদের হটাইয়া দিয়া সিপাহীদের লোক দ্বারা গঠিত সিপাহী কোর্ট বা দরবারের প্রতিষ্ঠা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সিপাহী ও

www.pathagar.com

জনসাধারণের মনে একটা আইনসঙ্গত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছিল। এমনি গণতান্ত্রিক চেতনা, যতই অপরিপক্ক হোক না কেন, নিশ্চয় প্রশংসার দাবীদার।

প্রথম দিকে এই কোর্টের সদস্য-সংখ্যা ছিল ১০। ৬ জন সিপাহীদের প্রতিনিধি, ৪ জন বেসামরিক দপ্তরগুলির প্রতিনিধি। এবং তাঁহারা সকলেই নির্বাচিত। এই দশ জন প্রতিনিধির মধ্য হইতে নির্বাচনের মাধ্যমে একজন হইতেন সভাপতি, সদর-ই-জলসা; আরেকজন সহ-সভাপতি, নায়েব-ই-জলসা। বাকী আটজন প্রতিনিধির উপর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত হইত। আবার, প্রত্যেক প্রতিনিধিকে নিজ নিজ বিভাগের দায়িত্ব পালনে সহায়তা দানের জন্য থাকিত চার জনের একটি করিয়া কমিটি। কমিটির সদস্যরাও নির্বাচিত হইতেন। প্রত্যেকটি কমিটি কাজের প্রয়োজন অনুসারে সম্পাদক নিয়োগ করিতে পারিত। কমিটিতে সংখ্যাধিক্য ভোটে কোন প্রস্তাব পাশ হইলে তাহা অনুমোদনের জন্য পাঠানো হইত সিপাহী কোর্টে। কোর্টের যে কোন অধিবেশনে বাদশা'র উপস্থিত থাকিবার অধিকার ছিল। বাদশা'র স্বাক্ষর বিনা কোর্টের কোন প্রস্তাবই কার্যকর হইত না। বাদশাহ্ কোন প্রস্তাবে আপত্তি জানাইলে তাঁহার মতামতসহ সেই প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার জন্য আবার পাঠানো হইত সিপাহী-কোর্টে। বিদ্রোহী সরকারের সর্বোচ্চ আদালত ও বিচারক নিয়োগ করা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা- সকল ব্যাপারে কোর্টই ছিল সর্বশক্তিমান। এই কোর্টের সদস্যদের চিন্তা-ভাবনার প্রকৃতি একটি সিদ্ধান্ত হইতে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। ১০ই আগষ্ট একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কোর্ট স্থির করে যে চাষের জমির মালিকানার অধিকার পাইবে তারাই, যারা সেই জমি চাষ করে। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, ১৮৫৭ সালের সেই জাতীয় বিদ্রোহ মূলতঃ ইংরেজ-বিরোধী বিদ্রোহ হইলেও ইহা ছিল একটা সামন্ততন্ত্র-বিরোধী প্রগতিপন্থী বিদ্রোহও। অভ্যুত্থানকারীদের মধ্যে সামন্তরাও যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন জনসাধারণের পরিবার হইতে আগত সিপাহীরা। এবং সংখ্যায় সিপাহীরাই ছিলেন অনেক বেশি। সামন্তদের অনেকের মনেই হয়তো সামন্ততন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু বিপুল সংখ্যক অভ্যুত্থানকারীই ছিলেন গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ, এমন ধারণা নিশ্চয়ই করা যায়।

কিন্তু ইতিহাস-নির্ধারিত এই মহান ও বিরাট কাজটির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল যে-যোগ্যতা, সে-যোগ্যতা তখনও অর্জন করিতে পারেন নাই অভ্যুত্থানকারীরা। শ্রেণীগত বিচারে সিপাহীরা ছিল এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের

www.pathagar.com

জন্য তখনও অপরিণত। আর এমনি অবস্থায় এইরূপ বৈপ্লবিক কার্য সম্পাদনের সাফল্য-সম্ভাবনাও খুব বেশি থাকিবার কথা নয়।

সিপাহীদের কথা মোটামুটি জানা গেল। বিদেশীর নাগপাশ হইতে সদ্যমুক্ত দিল্লী নগরীতে প্রভাবশালী অন্যান্য শ্রেণীর লোকজনের কথাও কিছু জানা দরকার। এই কথা স্পষ্ট যে, নূতন শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে 'পুরাতন' ব্যবস্থা হইতে সংযুক্ত ছিলেন শুধুমাত্র সম্রাট বাহাদুর শাহ্। অন্যান্য যেসব 'সম্ভ্রান্ত প্রতিভা' এই ব্যবস্থা হইতে বাদ পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন দিল্লীর শাহ্যাদাগণ- মীর্যা মোঘল, (তিনি অবশ্য সিপাহী বাহিনীর নামেমাত্র সর্বাধিনায়ক ছিলেন), মীর্যা খিজির সুলতান, মীর্যা আবু বকর প্রভৃতি, বাদশা'র উযীর মাহবুব আলি খান, মীর্যা এলাহী বক্স (বাদশা'র কনিষ্ঠা বেগম যীনাত মহলের পিতা), হাকিম আহ্সানুল্লাহ্, মুন্সী জীওনলাল, নবাবযাদা মঈনুদ্দিন হাসান খান, রজব আলি খান প্রমুখ নগরীর ধনী ও বণিক সম্প্রদায়। আত্মম্ভরিতায় ভরপুর শাহ্যাদাগণ ছিলেন অপদার্থ, চরিত্রহীন ও কান্ডজ্ঞান বর্জিত। উযীর মাহবুব আলি খান হইতে আরম্ভ করিয়া উপরোক্ত সব ক'জন দরবারীই ছিলেন গোপনে ইংরেজের গুপ্তচর ও উচ্ছিষ্টভোজী। দিল্লী নগরীর ধনী-বণিক সম্প্রদায় ছিলেন সুবিধাবাদী ও সময়ের সুযোগ গ্রহণকারী। শুধু দিল্লী নগরীর জনসাধারণই স্বেচ্ছায় আগাইয়া আসিলেন সিপাহী প্রশাসনকে সর্বরকমে সাহায্য করিতে। তাঁহাদের মধ্য হইতে গঠিত হইল ভলান্টিয়ার বাহিনী। উপরোক্ত 'সম্ভ্রান্ত প্রতিভা'গণই এতদিন অশীতিপর বৃদ্ধ বাদশা'র চারপাশে ঘুরিয়া-ফিরিয়া সময় কাটাইতেন। বাদশা'র কাছে ইঁহাদের যাতায়াত ছিল অবাধ। বহু-পরিচিত জন বলিয়া বাদশা'র উপর ইঁহাদের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। এই অবস্থায় অভ্যুত্থান সংঘটিত হইয়া গেল। বাহাদুর শাহ্ও সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলেন। অথচ তাঁহারা ক্ষমতার ধারে-কাছে থাকিবেন না, তা কেমন করিয়া হয়? সুতরাং যথারীতি আরম্ভ হইল 'প্রতিভাবান'দের কর্মকান্ড।

আগেই বলা হইয়াছে, অভ্যুত্থানকারী সিপাহীদের নেতৃবৃন্দ এমন অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ছিলেন না যাহাতে নূতন শাসন ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের পথে সুচারুরূপে আগাইয়া নিতে পারেন। ফলে, নানা অসুবিধা বাধা-বিশৃঙ্খলার বেড়াজালে আটকাইয়া যাইতে লাগিল সিপাহী-কোর্টের কার্যাবলী। সিপাহী-নেতৃবৃন্দের অনভিজ্ঞতা ও অক্ষমতার দরুন এই কোর্ট 'প্রতিভাবান'দের দ্বারা সৃষ্ট ও ধুমায়িত যেসব জটিল বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল, তার কোনটারই তেমন সমাধান করিতে পারে নাই। পুরো মে ও জুন মাস ব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিল- শাসন কার্যে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল না, অরাজকতার উৎস শাহ্যাদাগণ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্তগণের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হইল না কোন কঠোর

www.pathagar.com

ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে ৩০ মে ইংরেজগণ মিরাট হইতে আসিয়া দিল্লী অবরোধ করিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে বিভিন্ন খন্ড যুদ্ধেও সিপাহীরা জয়ী হইতে পারিল না। সিপাহীদের মধ্যে হতাশার বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল।

এমনি পরিস্থিতিতে শক্তিশালী বেরিলি বাহিনীর নেতৃত্বে ২রা জুলাই দিল্লী পৌছিলেন জেনারেল বখ্‌ত্‌ খান। আর সেই দিনই সিপাহী কোর্টের সম্মতিক্রমে বাহাদুর শাহ্‌ বখ্‌ত্‌ খানকে সিপাহী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হাতে অর্পণ করিলেন চূড়ান্ত ক্ষমতা। স্বাভাবিক কারণেই বাহাদুর শা'র এই কাজটি মোটেই পছন্দ করিলেন না শাহ্‌যাদাগণ ও সম্ভ্রান্তগণ। পছন্দ না করিবারই কথা। বখ্‌ত্‌ খান সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন শাহ্‌যাদা মীর্যা মোঘলের হাত হইতেই!

এই সমস্ত গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেও একটা জিনিস খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। নূতন ধরণের শাসন-ব্যবস্থায় বাহাদুর শাহ্‌ পারতপক্ষে 'প্রতিভাবান'দের পক্ষ লইয়া কোন হুকুম-আহকাম জারী করেন নাই। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অসম্ভব বুঝি কিছুতেই সম্ভব হইবার নয়! বাহাদুর শাহ্‌ বুঝিতেন, ১৮৫৭ সালের এই অভ্যুত্থান মূলতঃ জনসাধারণেরই অভ্যুত্থান। হয়তো বা এইজন্যই শাহ্‌যাদা-সম্ভ্রান্ত-ধনী-বণিক যেখানে জঘন্য চরিত্রের পরিচয় দিতেছিলেন, সেখানে দিল্লীর জনসাধারণ স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন করিয়া আগাইয়া আসিলেন এই মহান কাজে শরীক হওয়ার জন্য। উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা, শক্তিমান নেতৃত্ব ও যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র পাইলে নাগরিকদের এই বাহিনী পরিণত হইতে পারিত একটা অজেয় শক্তিতে। জোয়ান-জনতার অপ্রতিরোধ্য স্রোতের টানে ভাসিয়া যাইতে পারিত স্বার্থপর চরিত্রহীন বিশ্বাসঘাতকদের সকল দুষ্ক্রিয়ার বাধা। কিন্তু জনতাকে কাজে লাগাইবার শক্তিও ছিল না জোয়ানদের। তাহাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও নিজেদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ক্রমে সংক্রামক ব্যাধির মত বিস্তার লাভ করে, যার ফলে দিল্লী নগরীর বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও হতাশ ও দুর্বল হইয়া পড়ে। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীরও ছিল না যেমন কোন বিশেষ রাজনৈতিক চেতনার চিন্তাধারা, সিপাহীদেরও তেমনি ছিল না জনসাধারণের মিলিত শক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া তাহাকে আন্দোলনের সাফল্যের কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার মত রাজনৈতিক চেতনার অগ্রসরতা।

তবুও, ২রা জুলাই বখ্‌ত্‌ খানের সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণের পর অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। কিন্তু বখ্‌ত্‌ খানের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র চালাইতে থাকেন পূর্বোক্ত 'প্রতিভাবানেরা'। অভিযোগ প্রতি-অভিযোগ চলিতেই থাকে। অর্থনৈতিক সংকট

www.pathagar.com

মোচনের কোন ব্যবস্থাই কার্যকরী হইল না। আগষ্ট মাসের শেষে সিপাহী অফিসারদের একটি প্রতিনিধিদল বাদশা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সিপাহীদের বেতন দাবী করিলেন। "বাদশাহ্ তাঁর নিজের ঘরে গেলেন ও সমস্ত অলঙ্কার এনে তাদের দিলেন। কিন্তু অফিসাররা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বললেন ঃ রাজ-অলঙ্কার আমরা গ্রহণ করতে পারি না, কিন্তু আমরা এই দেখে আশ্বস্ত হলাম যে, আপনি আপনার জীবন ও সম্পত্তি দিয়ে আমাদের বাঁচাতে প্রস্তুত আছেন।" (মেটকাফ সম্পাদিত ঃ টু নেটিভ ন্যারেটিভ্স্', পৃঃ ২০৭)। অবশেষে বাদশা'র আদেশ বলে শাহ্যাদাগণ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্তগণের শক্তি ও অধিকার অনেক খর্ব করা হইল। এইভাবে, একদিকে সিপাহীরা ও জনসাধারণ, অন্যদিকে শাহ্যাদা-অভিজাত-ধনীবণিকের মধ্যে চার মাসব্যাপী চলিয়া-আসা অন্তর্দ্বন্দ্বে সিপাহী-জনসাধারণই বিজয়ী হইলেন। "এই প্রকার বিপ্লবিক বিজয়ের পর তারা যদি নিজেদের ঘর গুছিয়ে নেবার জন্য অন্ততঃ কিছু দিনও সময় পেত, তাহলে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস হয়তো অন্য রকম হতে পারত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সিপাহী কোর্ট বিজয়ী হল অত্যধিক দেরী করে। এবং তারা এই বিজয়কে দৃঢ়ভাবে সংগঠন করবার পূর্বেই দিল্লী প্রাচীরের উপর ইংরেজের কামান থেকে গোলা এসে পড়ল।" (প্রমোদ সেনগুপ্ত রচিত 'মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭,' পৃঃ ১৬০)।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম হইতে দিল্লীর উপর আরম্ভ হইল ইংরেজদের প্রচন্ড আক্রমণ। তাহাদের সহায়তাদানকারী ছিল শিখ ও গুর্খা বাহিনীগুলি। দিনগুলি তখন অনিশ্চিত ভয়ে ভরপূর। উত্থান-পতন, আশা-নিরাশা, আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ, সফলতা-বিফলতা- এমনিভাবেই চলিতে লাগিল দিনগুলি। তারপর একদিন সিপাহী জনসাধারণের বহু আশার গর্বিত দিল্লী পুনরায় ইংরেজদের অধিকারে ফিরিয়া গেল। সেদিন ছিল ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭ সাল। একটা ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হইল দিল্লী। যে বিরাট নগরী লক্ষ লক্ষ মানুষের কোলাহলে ছিল মুখরিত, সেই নগরী হইল জন-মানব বর্জিত। রাস্তায়-ঘাটে, চারিধারে শুধু শবদেহ- উট, ঘোড়া, গরু ও মানুষের প্রাণহীন অগণিত দেহ। বড় বড় গাছগুলি কোথাও বা শাখাপত্রশূন্য হইয়া দন্ডায়মান, কোথাও বা ধরাশায়ী। কাশ্মীর দরওয়াজা হইতে শাহী মহলের প্রত্যেকটি বাড়ি বিধ্বস্ত ও অগ্নিকান্ডের ফলে কৃষ্ণাভ।

দিল্লীতে যে অভাবনীয় পাশবিক হত্যাকান্ড ও অবাধ লুণ্ঠন আরম্ভ হয়, বলা চলে- তা ছিল ইংরেজদের পূর্ব-পরিকল্পিত। "যারা কোনদিন আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই করে নাই, যারা শান্তভাবে তাদের দৈনন্দিন কাজ করে গিয়েছে এবং এমন কি বিদ্রোহীরা যাদের লুণ্ঠন করেছে ও যাদের উপর অত্যাচার করেছে- এমন

www.pathagar.com

অসংখ্য লোককেও আমরা বেয়নেটের দ্বারা বিদ্ধ করেছি, অথবা তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করেছি, অথবা বন্দুকের গুলীতে তাদের মস্তিষ্ক বিদ্ধ করেছি। -- কালো আদমি দেখা মাত্রই আমাদের জাতীয় উৎসাহ উদ্দীপিত হয়ে উন্মত্ততার সীমানায় পৌছে গিয়েছে।" (স্যার উইলিয়াম কে'ঃ এ হিষ্ট্রি অব সিপয় ওয়ার ইন ইন্ডিয়া, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৬৩৬)। ইংরেজদের হত্যা-লিপ্সা হইতে নিরীহ গ্রামবাসীরাও মুক্তি পায় নাই। "একদল গরীব গ্রামবাসীদের নিকট কয়েকটি নূতন পয়সা পাবার অপরাধে তাদের সকলকে ফাঁসি দেওয়া হয়। একটা নিকটবর্তী ঘাঁটি নাকি কিছু পূর্বে লুণ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, এই পয়সাগুলি দিয়ে আমাদের লোকেরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে দুধ, শাক-সবজি আটা ইত্যাদি কিনেছিল।" (পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৩৮)। "দিল্লীর যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরও আমাদের সৈন্যদের নৃশংস কাজগুলি সত্যিই খুব হৃদয় বিদারক। শত্রু-মিত্র বাছবিচার না করেই পাইকারী ভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে। আর লুণ্ঠনের ব্যাপারে আমরা নাদির শাহ্‌কেও ছাড়িয়ে গিয়েছি।" (স্মিথ ঃ 'লাইফ অব লর্ড লরেন্স', ২য় খন্ড, পৃঃ ২৬২)। "১৭৩৯ সালের তুলনায় (নাদির শাহের আক্রমণ) ১৮৫৭ সালে পুরাতন রাজধানীর ধ্বংস পূর্ণতর ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। মোগল বাদশাহীর বিরুদ্ধে নাদিরের অত্যাচারের আতিশয্যকে কোনো ব্যক্তির একটা উগ্র কিন্তু ক্ষণস্থায়ী রোগের আক্রমণের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সে-রোগ মানুষের শরীরকে কিছু সময়ের জন্য দুর্বল করে দিলেও সে আরোগ্য লাভ করে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু ইংরেজের আঘাতের ফলে দুর্বল রোগী একেবারেই মরে গেল।"

(মন্টোগোমারি মার্টিন ঃ ইন্ডিয়ান এম্পায়ার, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৪৮)।

১৯শে সেপ্টেম্বর বাহাদুর শাহ্ যাফর শাহী মহল ত্যাগ করিয়া দিল্লীর ৯ মাইল দক্ষিণে কুতুবে আশ্রয় নিলেন। তিনি পরাজিত হইয়াছেন, কিন্তু শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন না। বাদশাহ্ কোথায় গিয়াছেন- এই খবর ইংরেজরা জানিত না। বিজয়ী ইংরেজদের মনে তখন দুইটি ভয়ের কারণ- এক, বিদ্রোহীরা আবার সংগঠিত হইয়া দিল্লী আক্রমণ করিতে পারে; দুই, তাহারা বাহাদুর শাহ্‌কে অন্যত্র নিয়া গিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে পারে। জেনারেল বখ্‌ত্ খান এবং আরও কয়েকজন অফিসার ও যথেষ্ট সংখ্যক সিপাহী বাহাদুর শাহ্‌র সঙ্গেই ছিলেন। তাঁহারা বাদশা'কে অযোধ্যায় নিয়া যাইবার চেষ্টায় ছিলেন। বাদশা'ও বুঝিয়াছিলেনঃ দিল্লী গিয়াছে বটে, কিন্তু পড়িয়া রহিয়াছে সমগ্র দেশ। দেশের বনে জঙ্গলে, পথে-প্রান্তরে থাকিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করাই একমাত্র সম্মানজনক পথ। জীবনের আর কয়টা দিনই বা বাকি আছে!

www.pathagar.com

আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনের এই বাকি কয়টা দিনের জন্য তিনি কি বিদেশী দুশমনের হাতে লাঞ্ছিত-অপমানিত হইতে পারেন? সম্রাট বাবর-হুমায়ুন-আকবর-জাহাঙ্গীর-আলমগীরের আওলাদ তিনি! তাঁহাকে তো মরিতে হইবে সম্রাটের মত, মানুষের মত! নিজ সৈন্যদলের সাথে থাকিয়া যুদ্ধরত অবস্থায় মরিবেন তিনি। বখ্‌ত্ খান বাদশা'কে ওজস্বীনী ভাষায় অযোধ্যায় গিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বাহাদুর শাহ্ যাফর অমত করিলেন না। পরদিন হুমায়ুনের কবর গাহে আবার দেখা করিবেন বলিয়া বখ্‌ত্ খান বাদশা'র নিকট হইতে বিদায় নিলেন। অদূরে আড়ালে দাঁড়াইয়া মীর্যা এলাহী বক্স সব কথা শুনিলেন। বখ্‌ত্ খানের বিদায়ের পর তিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন বাদশা'র কাছে। এবং অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া বাদশা'কে নিয়া গেলেন নিজের বাসস্থানে। সেখানে পিতৃগৃহে অপেক্ষা করিতেছিলেন বেগম যীনাত মহল।

সেখানে বাপে-বেটিতে মিলিয়া বাদশাহ্‌কে বুঝাইতে লাগিলেন বিপরীত কথা। শ্বশুর বুঝাইলেন, বিদ্রোহীদের সঙ্গে যাওয়া এই বয়সে বাদশা'র পক্ষে কতই না কষ্টকর! তা-ও জয়ের আশা তো এখন আর মোটেই নাই! অন্যদিকে, মন্দ কি-বিদ্রোহীদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া ফেলা! শ্বশুর সাহেব ইংরেজগণকে বুঝাইবেন, এই পর্যন্ত বাদশাহ্ যাহা কিছু করিয়াছেন, বিদ্রোহীদের চাপে পড়িয়াই করিয়াছেন!-বাহাদুর শাহ্ যাফর নীরব।

প্রিয়তমা কনিষ্ঠা বেগম যীনাত মহল বুঝাইলেন, সমস্ত আশ্রিত জনের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, তরুণ পুত্র (যীনাত মহলের গর্ভজাত) মীর্যা জওয়ান বখ্‌তের নিরাপত্তার কথা ভাবিয়া, হারেমের অসহায়া নারীদের মুখ চাহিয়া কয়েকটি শর্তে ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে দোষ কি! নীরব বাহাদুর শাহ্ যাফর বেগম সাহেবার দিকে তাকাইলেন। হয়তো ভাবিলেন, মীর্যা এলাহী বক্সের কন্যার মতই কথা বলিতেছেন বেগম যীনাত মহল! মহা-মুঘলদের আওলাদ তিনি, মাঝে-মধ্যে এই কথাটি ভুলিয়া যাওয়া এলাহী বক্স বা তাঁহার কন্যার পক্ষে সম্ভব।- কোন উত্তরই দিলেন না বাহাদুর শাহ্ যাফর।

ইংরেজের প্রধান গুপ্তচর মীর্যা এলাহী বক্স আরেক গুপ্তচর-বন্ধু রজব আলি মারফত হুমায়ুনের কবরে বাহাদুর শা'র অবস্থানের কথা জানাইয়া দিলেন। রজব আলি মারফত এই মহা-মূল্যবান খবরটি পাইয়া গেল ইংরেজের ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগের প্রধান ক্যাপ্টেন হাড্‌সন। ইংরেজ ঐতিহাসিক ম্যালিসনের কথায়, "হাড্‌সন ছিল মধ্যযুগীয় এক দস্যু। - মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তার মধ্যে কোনো মর্মপীড়া হত না।" (ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৫)। হাড্‌সন

www.pathagar.com

বাহাদুর শাহ্ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাভ করিল। একমাত্র শর্ত– বাদশা'কে প্রাণে মারা হইবে না।

পঞ্চাশ জন বাছাই–করা অশ্বারোহী নিয়া হাড্‌সন হুমায়ুনের কবর গাহের কাছে একটা ভাঙ্গা বাড়িতে অপেক্ষা করিতে লাগিল। এলাহী বক্স ও রজব আলি গিয়াছেন বাদশা'কে সম্মত করাইতে।—দুই ঘন্টা কাটিয়া গেল। কোন খবর নাই। আত্মসমর্পণে বাদশা'কে রাজী করাইতে পারিতেছেন না কেউ?— কিন্তু আর পালাইবার পথ কোথায়?

* * * *

হুমায়ুনের কবর গাহের দরওয়াজায় অনেক লোকের ভীড়। তাহাদের অধিকাংশই বাদশা'র লোক। সুখে–দুঃখে তাহারা বাদশা'র সাথী। সবাই নির্বাক দর্শক। হাড্‌সনের নির্দেশে আত্মসমর্পণকারীর শকটে উঠিয়া বসিলেন মহা–মুঘলদের শেষ বংশধর ৯০ বৎসর বয়স্ক সম্রাট বাহাদুর শাহ্ যাফর, বেগম যীনাত মহল ও তরুণ পুত্র মীর্যা জওয়ান বখ্‌ত্। জনতা তেমনি নির্বাক।

পরদিন ২২ শে সেপ্টেম্বর। হাড্‌সন আবার গেল হুমায়ুনের কবর গাহে। আজ আত্মসমর্পণ করিবেন বড় তিন শাহ্‌যাদা– মীর্যা মোঘল, মীর্যা খিজির সুলতান, মীর্যা আবু বকর। শাহ্‌যাদাগণ যথারীতি আত্মসমর্পণ করিলেন। লাহোর দরওয়াজার কাছাকাছি পৌঁছিয়া হাড্‌সন "বন্দীদের গরুর গাড়ি থেকে নামতে বলল ও তাদের পোশাক–পরিচ্ছদ সব খুলে ফেলতে বলল।—আদেশ পালন করলেন তাঁরা। তারপর আবার তাদের গরুর গাড়িতে ফিরে যেতে বলা হল। তখন একজন সৈন্যের কাছ থেকে একটা বন্দুক কেড়ে নিয়ে হাড্‌সন ধীরে ধীরে নিজের হাতে তিনজন নিরস্ত্র ও অসহায় বন্দীকে একে একে গুলী করে হত্যা করল। তারপর তার শিকার নিয়ে সে দিল্লীতে প্রবেশ করল ও কোতোয়ালীর সামনে প্রকাশ্যে মৃতদেহগুলিকে ঝুলিয়ে রেখে দিল।" (স্যার উইলিয়াম কে'ঃ এ হিষ্ট্রি অব দ্য সিপ্যয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫০–৫১)। ২৫ শে সেপ্টেম্বর হাড্‌সন গর্ভভরে লিখিয়াছিল ঃ "আমি নিজের কাজের জন্য সন্তুষ্ট না হয়ে পারছি না। আমাদের জাতির শত্রুদের ধ্বংস করার জন্য চতুর্দিক থেকে সকলেই আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। সমস্ত ইংরেজ জাতি উৎফুল্ল হবে।" (পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৫৩)। দিল্লীতে ২৪ জন শাহ্‌যাদাকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল। দুইজন ছিলেন বাদশা'র ভগ্নিপতি, দুইজন জামাতা, আর সকলেই ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাগিনেয়। পরে মীর্যা জওয়ান বখ্‌তেরও ফাঁসি হইয়াছিল। এক ৯০ বৎসরের বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্ ব্যতীত এমনিভাবে মহা–মুঘলদের বংশ লুপ্ত করিয়া দিল 'সুসভ্য' ইংরেজরা।

www.pathagar.com

বংশ লোপ। এইবার বাঁচিয়া থাকা সেই ৯০ বৎসরের বৃদ্ধ বাদশা'র বিচার। ১৮৫৮ সালের ২৭ শে জানুয়ারী মুঘলদেরই দেওয়ান-ই-খাসে শুরু হইল এই মহা-অপরাধীর বিচার। ইংরেজ সরকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তিনি ১১ই মে নিজেকে ভারত-শাসনকারী সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বেআইনীভাবে দিল্লী শহর দখল করিয়াছিলেন; ১১ই মে হইতে ১৮৫৭ সালের ১লা অক্টোবরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁহার পুত্র মীর্যা মোঘল, মুহম্মদ বখ্‌ত্‌ খান ও আরও অনেক বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন; এবং এই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ও ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য দিল্লীতে তিনি সৈন্য বাহিনী জমায়েত করিয়াছিলেন ও বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বিচার-কক্ষে অভিযোগগুলি যখন পড়া হইতেছিল, বৃদ্ধ বাদশাহ্‌ তখন সেই দিকে মোটেই খেয়াল করিতেন না। নিজের মধ্যেই ডুবিয়া থাকিতেন তিনি, আর হুকা টানিতেন। ৪৪ দিন ধরিয়া চলিল বিচারের এই প্রহসন। অনেকবারই বাদশা'র মতামত জিজ্ঞাসা করা হইত। কোন উত্তরই দিতেন না তিনি। ৯ই মার্চ বাহাদুর শা'র উকিল গোলাম আব্বাস বাদাশা'র তরফ হইতে জানাইলেন, "যে আদালতে বাহাদুর শা'র বিচার হচ্ছে, তাঁকে বিচার করবার অধিকার সেই আদালতের আছে বলে তিনি স্বীকার করেন না; সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে, তার কোন উত্তর তিনি দেবেন না।" (মন্টোগোমারি মার্টিন ঃ ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার, পৃঃ ১৮৪)।

বিচার হইয়া গেল। সবগুলি অভিযোগেই দোষী সাব্যস্ত হইলেন বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌ যাফর। মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হইত, কিন্তু 'সদাশয়' ইংরেজ সরকার গোলাম-গুপ্তচর এবং বাদশা'র শ্বশুর এলাহী বক্স এবং তদীয় বন্ধু অন্য গোলাম-গুপ্তচর রজব আলির কাছে বাদশাহ্‌কে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল বলিয়া অপরাধীকে প্রাণদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডের হুকুম দিল।

বিচার তো হইল। এখন এই জীবিত 'অপরাধীটি'কে রাখা যায় কোথায়? এই দেশের কোথাও রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। কে জানে, লোকটিকে নিজেদের মধ্যে না পাইলেও তাঁহার 'নামটি'কে নিয়াই যদি আবার সিপাহী-জনতা উদ্দীপিত হইয়া ওঠে? ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মহাচিন্তায় পড়িলেন। খাওয়া-পরায় কষ্ট যথেষ্ট দেওয়া হইতেছে। কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যুও যে খুব তাড়াতাড়ি হইবে, তাহাও তো

www.pathagar.com

মনে হয় না! লেয়ার্ড নামে বৃটিশ পার্লামেন্টের একজন ভূতপূর্ব সদস্য ১৮৫৮ সালের ১১ই মে লণ্ডনের এক প্রকাশ্য জনসভায় বলিয়াছিলেন ঃ "আমি দিল্লীতে বন্দী বাদশা'কে দেখে এসেছি। –ঐ বৃদ্ধ লোকটির ভগ্নাবশেষ আমি দেখেছিলাম– একটা ঘরের মধ্যে নয়, প্রাসাদের একটি অতি ঘৃণ্য 'গর্তের' মধ্যে। তিনি একটা 'চারপাই'র উপর শুয়ে ছিলেন, একটা নোঙরা চাদর ছাড়া তাঁর গায়ে দেবার আর কিছু ছিল না!–খুব দুঃখের সঙ্গে তিনি বললেন যে, তাঁকে উপযুক্ত পরিমাণ খেতে পর্যন্ত দেওয়া হয় না।–একজন রাজার প্রতি কি আমাদের মত খৃষ্টানদের ব্যবহার এই হওয়া উচিত? আমি তাঁর পরিবারের স্ত্রীলোকদেরও দেখেছিলাম। তারা জড়োসড় হয়ে এক কোণে বসেছিলেন। আমি জানতে পেরেছিলাম যে, তাঁদের ভরণ–পোষণের জন্য দেওয়া হয় প্রতিদিন মাত্র ১৬ শিলিং (৮ টাকা) করে"। (মন্টোগোমারি মার্টিন ঃ ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার, পৃঃ ১৮৭)।

এই 'অপরাধীকে' কোথায় নির্বাসন পাঠানো যায়? আন্দামানে? সেখানে তো অনেক বিদ্রোহীকে পাঠানো হইয়াছে! সেখানে এই বন্দীকে পাঠাইলে–বলা তো যায় না, আবার যদি–। দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাইলে কেমন হয়? অথবা সদ্য–অধিকৃত চীন দেশের হংকং–এ? গভর্নর–জেনারেলের কাউন্সিল চিন্তা করিয়া চলিল।

৭ই অক্টোবর, ১৮৫৮ সাল। বন্দী বাদশাহ্ ও তাঁহার পরিবারের দুইজনকে গোপনে কড়া মিলিটারী পাহারায় একটা অজানিত গন্তব্য স্থানের পথে দিল্লী হইতে নিয়া যাওয়া হইল। মহা–মুঘলদের দিল্লী! শেষ বারের মত ছাড়িয়া গেলেন মহা–মুঘলদের শেষ বংশধর! হয়তো তখন দিল্লীর শাহী প্রাসাদের আড়ালে পড়িয়া দিনের সূর্য অস্ত যাইতেছিল! ধীরে ধীরে নামিতেছিল অনেক সন্ধ্যার মত একটি সন্ধ্যা! কোথা হইতে দীপক রাগিনী ভাসিয়া আসিতেছিল কি না, কে জানে!

মহা–মূল্যবান এই 'অপরাধী'কে লইয়া মিলিটারী প্রহরা কানপুর হইয়া ৪ঠা নভেম্বর এলাহাবাদে পৌছিল। সেখান হইতে জাহাজে করিয়া কলিকাতার ডায়মণ্ডহারবারে পৌছিল ৪ঠা ডিসেম্বর। "বাহাদুর শাহ্‌র সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুই পত্নী, বেগম তাজ মহল ও বেগম জিন্নাৎ (যীনাত) মহল এবং জওয়ান বখ্‌তের বালিকা স্ত্রী। পতিত ও লাঞ্ছিত বাদশাহের শেষ জীবনে তাঁর দুঃখ–কষ্টের অংশগ্রহণ করে তার একটু লাঘব করবার জন্য ভারতীয় নারীর মহান ঐতিহ্য অনুসরণ করে বিনা দ্বিধায় এই তিনটি মহীয়সী মহিলা স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করেছিলেন। প্রকৃত মুসলমানের ন্যায় প্রফুল্ল মনে তাঁরা অদৃষ্টের আনুগত্য স্বীকার

www.pathagar.com

করে নিয়েছিলেন। যে অফিসার রক্ষী হয়ে তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তার কথায় 'তাঁরা এতই প্রফুল্ল চিত্তে ছিলেন যে, তাঁদের দেখে মনে হত যেন তাঁরা দেশ ভ্রমণে চলেছেন।'' (প্রমোদ সেনগুপ্ত রচিত 'মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭', পৃঃ ১৯৮)।

বন্দীরা কলিকাতায় পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের একটা যুদ্ধ জাহাজ, 'মেঘেরা'তে তুলিয়া নেওয়া হইল এবং ঐদিনই সকাল ১০টার সময় জাহাজে সমুদ্রে পথে যাত্রা শুরু করিল, যার গন্তব্যস্থল একমাত্র জাহাজের ক্যাপ্টেনই জানিতেন। এর ৪০দিন পর, ১১ই জানুয়ারী ১৮৫৯ সালে, বন্দী বাহাদুর শাহ্‌র অদৃষ্ট সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ অবগত হইল এই ছোট্ট সংবাদটি হইতেঃ "দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার বাহাদুর শাহ্‌কে স্থান দিতে অসম্মত হওয়ায়, দিল্লীর ভূতপূর্ব বাদশাহ্‌কে 'কেপ অব গুড হোপে'র পরিবর্তে বৃটিশ-বর্মার রেঙ্গুনে পাঠানো হয়েছে। বাদশাহ্ ৯ই ডিসেম্বর রেঙ্গুনে পৌঁছেছেন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে রেঙ্গুন থেকে ৩০০ মাইল ও পেগু থেকে ১২০ মাইল দূরে, সিটাং নদীর ধারে, কারেন প্রদেশের নিকটবর্তী টংঘু নামক দূষিত ও জনশূন্য একটা স্থানে।" (পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৮)

আবুল মুজফ্‌ফর সুরাজউদ্দিন মুহাম্মদ বাহাদুর শাহ্ যাফর বাদশাহ গাজী। সংক্ষেপে বাহাদুর শাহ্। মুঘল-ই-আযম বা মহা-মুঘলদের শেষ বাদশাহ্-বংশধর। শান-শওকতহীন সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্বে 'আবু যাফর' নামেই পরিচিত ছিলেন। এই নামেই তিনি কবিতা রচনা করিতেন। 'সিংহাসনে' আরোহণ করেন ১৮৩৭ সালে, ৬৪ বৎসর বয়সে। মুঘল-রাজত্ব তখন প্রকৃতপক্ষে এক জনশ্রুতি মাত্র। 'সম্রাট' কবি 'বাহাদুর শাহ্ যাফর' এই সংক্ষেপিত নূতন নামে পরিচিত হইলেন।

সম্রাট বাবর, তাঁহার পুত্র সম্রাট হুমায়ুন, তাঁহার পুত্র সম্রাট আকবর, তাঁহার পুত্র সম্রাট জাহাঁগীর, তাঁহার পুত্র সম্রাট শাহ্‌জাহান, তাঁহার পুত্র সম্রাট আওরঙজেব। অতঃপর আরম্ভ হইল মুঘল-শক্তির পতন-কাল। সেই পতনকালের প্রারম্ভে নিরাপত্তাহীন স্বল্পকালীন বেশ কিছু 'সম্রাট'। তারপর আওরঙজেবের পৌত্র শাহ্ আলম দিল্লীর 'বাদশাহ্', ইংরেজদের অভিভাবকত্বে বার্ষিক ভাতা সাড়ে তের লক্ষ টাকা। শাহ্ আলমের পর তাঁহার পুত্র 'সম্রাট' আকবর শাহ্। আকবর শাহ্‌র পর তাঁহার পুত্র বাহাদুর শাহ্ যাফর- ইংরেজদের 'বিচারের' পর যাঁহার ভাতা নিরূপিত হইয়াছিল দৈনিক ৮ টাকা অর্থাৎ এই হারে বার্ষিক ২, ৯২০ টাকা।

www.pathagar.com

সিটাং নদীর ধারে, 'দূষিত ও জনশূন্য' টংঘুতে অবস্থানের দিনগুলিতে হয়তো বাহাদুর শাহ্ যাফর আপন মনে আবৃত্তি করিতেন অতীতে নিজেরই রচিত কবিতা–

"না কিসি কি আঁখ্‌কা নূর হুঁ,
না কিসি কি দিল্‌কা করার হুঁ,
যো কিসি কি কাম না আঁ সাকে!
ওয়ে ম্যয় এক মুশ্‌ত্ গুবার হুঁ!...
কারও নয়নের আলো নই আমি
নই কারও আশ্বস্তি মনের,
আসে না যে কোন কাজে কারও–
আমি সেই এক মুঠো মৃত্তিকা শুধু!"

১৯৬২ সাল। ৭ই নভেম্বর। দূষিত ও জনশূন্য টংঘুর অবস্থান ছাড়িয়া পরপারে চলিয়া গেলেন মহা–মুঘলদের শেষ বংশধর।

[নেপাল–সীমান্তের তরাই–ভূমিতেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন আযীমুল্লাহ্ খান। বেগম হাসরত মহল সেখানে আরও প্রায় বিশ বছর বেঁচেছিলেন। এর আগেই, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের দিকে বেগম সাহেবার মৃত্যুর প্রায় বার বছর আগে কলকাতার মুচিখোলায় ইন্তেকাল করেন 'মেটিয়াবুরুজের নবাব' অর্থাৎ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্। তাঁর ইন্তেকালের পর নবাবের কলকাতার সম্পত্তি ভোগের ব্যাপারে তাঁর সহগামিনী বেগমদের পুত্রের মধ্যে মনোমালিন্য আরম্ভ হয়। এর সুরাহা করতে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সেই সম্পত্তির জন্য একটি ট্রাস্ট্ গঠন করে দেন। নবাবের পুত্রেরা ট্রাস্টের মাধ্যমে সেই সম্পত্তি ভোগ করতে থাকেন। এর মধ্যে নেপাল সীমান্ত থেকে বেগম হাসরত মহলের পুত্র প্রায় ৫০ বছর বয়স্ক প্রিন্স বিরজিস কাদের কলকাতায় এসে পিতার সম্পত্তির মালিকানা দাবী করেন। বীরাঙ্গনা মায়ের পুত্র বলে কি না জানা যায় নি, কলকাতাতেই বিরজিস কাদেরকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। অনেকেরই ধারণা, এই হীনতম কাজেও ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হাত ছিল]

www.pathagar.com

রক্তের ডাক

সংবাদটি শুনিয়া সকলেই অবাক হইয়া গিয়াছে।

'সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া হর্স'-এর দ্বিতীয় রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর এ. এইচ. এস. নীল। তাঁহাকে প্যারেড গ্রাউন্ডে কুচকাওয়াজের সময় গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে তাঁহারই প্রিয় সৈনিক-সওয়ার মাযহার আলি খান!

অবাক হইয়া গিয়াছে সকলেই। যাঁহারা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ভারতবর্ষের এই 'শান্তিপূর্ণ' সময়ে নূতন যুগের শিক্ষা-দীক্ষায় নূতন আলোকের পথে অগ্রসরমান তাঁহারা তো বটেই, এমনকি সিপাহী যুদ্ধের প্রায় তিরিশ বছর পরেও যে-জনসাধারণ তাহাদের পুরনো আশাহত আচ্ছন্নতার ঘোর কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই, তাহারাও অবাক! এই কার্যটি কি করিয়া সম্ভব হইল? প্রশ্নটি সকলের মগজেই ঘুরপাক খাইতে লাগিল।

সময়টা ১৮৮৭ সালের ১৪ই মার্চ। ঘটনার স্থান মধ্য ভারতের আগর শহরের সেনা-নিবাস।

কেন যে এমনটি হইল, ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার কূল-কিনারা কেহই করিতে পারিতেছে না। সওয়ার মাযহার আলি বহু বছর ধরিয়া মেজর নীলের অধীনে বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত সৈনিক। মেজর সাহেবের নেক নজর লাভ করিয়া সাধারণ পদাতিক সৈনিক হইতে সওয়ারের পদ-মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছে মাযহার আলি। রীতি অনুসারে এমনটি হওয়ার কথা নয়। সৈন্যদলের সওয়ারগণ সাধারণতঃ সওয়ার হিসাবেই যোগদান করে। মেজর নীলের সৈন্যদলে এই রীতির অন্যথা হইয়াছে শুধু মাযহার আলির ব্যাপারেই। অবশ্য, অযোগ্য ব্যক্তির উপর মেজর নীল তাঁহার করুণা বর্ষণ করেন নাই। মাযহার আলি সওয়ারের পদলাভের জন্য সম্পূর্ণরূপে যোগ্য ব্যক্তি। সুদর্শন, সুগঠিত দেহ, প্রাণ-চঞ্চল তরুণ সিপাহী মাযহার আলি খান। সিপাহী জীবনের প্রথম হইতেই তাহার সুনাম আগর শহরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তারপর সওয়ারের মর্যাদায় পদোন্নতি। যোগ্যতার মানদন্ডে সওয়ার হিসাবেও মাযহার আলি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তবুও সকলেরই জানা- যোগ্যতা থাকিলেই তো আর সব সময় পদোন্নতি ঘটে না! সেইজন্য অধিনায়কের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন। প্রয়োজন কর্তাব্যক্তির নেক নজর লাভ। মেজর নীলের সেই নেক নজর লাভ করিয়াছিল মাযহার আলি খান। কিন্তু হঠাৎ এ কি হইল? ইহা যে বিনা মেঘে বজ্রপাতের সামিল!

ইউরোপীয় অধিকর্তা এবং এই দেশীয় সিপাহী ও জনগণের মধ্যে প্রাণঘাতী

www.pathagar.com

সংঘর্ষের ব্যাপারটি তো সংঘটিত হইয়া গিয়াছে কবে, সেই প্রায় তিরিশ বছর আগে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধ নামে যাহা সকলেরই জানা। তখন বিশৃঙ্খলার দিনে অনেক নির্মম হত্যাকান্ড সংঘটিত হইয়াছে। দুই পক্ষই সেই সব নির্মমতার সংঘটনকারী। সারা দেশ তখন বিভিন্ন ভাবধারায় উদ্বেলিত। সারা দেশ বিক্ষুব্ধ! সেই বিক্ষুব্ধ দেশের বুকে চলিয়াছে ধ্বংস ও মৃত্যুর লীলা-খেলা। তখনকার নৃশংসতম হত্যাকান্ডের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া ইংরেজগণ আজও উল্লেখ করেন কানপুরের সেই 'সতীচূড়া ঘাট' ও 'বিবিঘর'-এর লোমহর্ষক কাহিনীর কথা। গঙ্গার সতীচূড়া ঘাটে সংঘটিত হইয়াছিল কাপুরুষোচিত এক নির্মম ঘটনা। গঙ্গা পার হওয়ার অনুমতি দিয়াও নৌকায় আটকাইয়া হত্যা করা হয় কানপুরের বৃদ্ধ দয়াবান সেনাপতি স্যার হিউ হুইলার এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সৈনিকদের। তারপর বিবিঘর। বিবিঘরের কক্ষে দানবীয় উল্লাসে হত্যা করা হয় ১১৮ জন ইউরোপীয় নারী এবং ৯২ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েকে। অসহায় নারী ও শিশুর চাপ-চাপ দেহ-রক্ত শুকাইয়া থাকে বিবিঘরের মেঝেতে। এইসব নির্মম হত্যাযজ্ঞের জন্য দায়ী করা হয় মারাঠা নায়ক নানাসাহেব ও আজিমুল্লাহ্ খান প্রমুখ তাঁহার সঙ্গীদিগকে। এইসব নৃশংস হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় ১৮৫৭ সালের জুন মাসের শেষ দিকে। অবশ্য, কিছুদিন পরেই, ১৮৫৭ সালেরই জুলাই-আগষ্টে পরিস্থিতির মোড় পরিবর্তিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে কানপুর পুনরুদ্ধারের জন্য ধাইয়া আসে কয়েকটি জাহাঁবাজ সৈন্যদল। কানপুরে আবার প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজের শক্ত অধিকার। 'ফার্ষ্ট মাদ্রাজ ফুসিলিয়ার্স'-এর ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল জে. জি. এস. নীল। খুবই জাঁদরেল সেনাপতি। ইউরোপীয় শিশু-নারী পুরুষের উপর এই অসহনীয় নির্মম অত্যাচার তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া তোলে। আরম্ভ হয় নির্মমতার প্রতিশোধ গ্রহণ। কানপুর ও আশেপাশের বহু লোককে এইসব নির্মম হত্যাকান্ডে শরীক ছিল মনে করিয়া গ্রেফতার করা হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই 'সংক্ষিপ্ত বিচারের' মাধ্যমে তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তাহাদের শাস্তি- গলায় ফাঁসি দিয়া মৃত্যু। ফাঁসির আগে আরও একটা কাজ অপরাধিগণকে দিয়া করানো হইত। আর তাহা কখনো হইত ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল নীলের আদেশ অনুসারে। আদেশটি ছিলঃ 'বিচারের পর দোষী সাব্যস্ত হইলে ইউরোপীয় নারী ও শিশুদের হত্যাকান্ডে অংশগ্রহণকারী বন্দীদিগকে ফাঁসিতে ঝুলাইবার আগে মেজর বুসের মেথর-পুলিশ 'বিবিঘরে'র গণহত্যার কক্ষে লইয়া যাইবে, এবং সেই মেঝেতে তাহাদিগকে পশুর মত উপুড় করাইয়া শুকাইয়া-থাকা রক্তাক্ত সেই মেঝের এক বর্গফুট স্থান অপরাধীকে জিহ্বা দ্বারা চাটাইয়া পরিষ্কার করানো হইবে।' কর্ণেল হোয়াইট লিখিত 'স্মৃতিচারণে'

www.pathagar.com

জেনারেল নীলের নিজের লেখা চিঠি ১৩৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে জেনারেল নীল লিখিয়াছেন, ... ''প্রথম যাহাকে ধরা হয়, সে ছিল উচ্চ বর্ণের এক ব্রাহ্মণ সুবাদার। সে ১৮৫৭ সালের ২৫ শে জুলাই প্রচারিত আদেশ কার্যকরী করানোয় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু আমি প্রভোষ্ট-মার্শালকে তাহার কর্তব্য পালন করিতে বলিলাম, এবং চাবুকের কতিপয় আঘাত সেই ব্রাহ্মণ সুবাদার দুষ্কৃতিকারীকে তাহার কাজ সমাধা করিতে (জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া রক্ত পরিষ্কার করিতে) বাধ্য করিল। -- ইত্যাদি ... ...।''

এমনিতে কত পৈশাচিক কান্ড ঘটিয়াছে এই দেশে। কিন্তু ইহার পর তো অনেক বছর কাটিয়া গিয়াছে। আবার কি করিয়া আসিবে ওই অমানবিক দিনগুলি? তাহাই বা কি করিয়া হয়? দেশীয় নেতৃবর্গ ও সিপাহীদের নির্মমতা বহুগুণ বর্ধিত করিয়া ইংরেজগণ প্রতিশোধ নিয়াছে এই দেশীয়দের উপর দিয়াই। কিন্তু দেশের মানুষ দুর্যোগ বেলার সেইসব নির্মম ঘটনার কথা ভুলিয়াই যাইতে চায়। ভুলিয়া গিয়াছেও অনেকে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দুঃশাসনের অবসানে দেশে এখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সুনিয়ম ভিত্তিক বৃটিশ সরকারের শাসন। নানা চিন্তায় আগের লোকজন নিজেদের মগজকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। কেহ কেহ ভাবিল- কোন নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে হয় তো মাযহার আলি ও মেজর নীলের মধ্যে দুশমনির সূচনা হইয়া থাকিবে, এবং তাহাই মাযহার আলিকে এমন একটি কাজ করিয়া ফেলিতে প্ররোচিত করিয়াছে। মাযহার আলির স্ত্রীর মনে সম্ভাব্য নারী সংক্রান্ত এই ধারণাটি গভীরভাবে দাগ কাটিয়াছে।

হত্যাকাণ্ডের পর আলিকে সুরক্ষিত হাজতে রাখা হইয়াছে। তাহার বিচারের ভার পড়িয়াছে গভর্ণর-জেনারেলের এজেন্ট স্যার লেপেল গ্রিফিনের উপর। হাজতে মাযহার আলি কাহারও সাথে কোন কথাই বলে না। এই অকল্পনীয় হত্যাকান্ডের কারণ জানিবার অনেক চেষ্টাই করিয়াছেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু মাযহার আলি পূর্বাপর সেই একই রকম নীরব। সারা আগর শহরে চলিয়াছে কত জল্পনা-কল্পনা। মাযহার আলির স্ত্রীর মনেও জল্পনা-কল্পনার শেষ নাই। কিন্তু মাযহার আলি নির্বিকার।

* * * *

স্যার লেপেল গ্রিফিন বিচার-কার্য শেষ করিয়াছেন। কৃতকর্মের জন্য মাযহার আলিকে তিনি মৃত্যুদণ্ড দিয়াছেন। -- সরকারের অনুমতিক্রমে দুইটি ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়া মাযহার আলির স্ত্রী আসিয়াছে হাজতের বাহিরে। পরিবারের চারিটি

www.pathagar.com

লোকের শেষ সাক্ষাৎ। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের মৃত্যুপথযাত্রী স্বামী, তার তরুণী স্ত্রী এবং অল্প বয়সের দুইটি ছেলেমেয়ে। মাযহার আলির স্ত্রীর প্রশ্ন একটিই। কেন মাযহার আলি এমন সর্বনাশের কাজটি করিল? ইহার পিছনের কারণটি কি? ...

মাযহার আলি অবশেষে কথা বলিল। সেই কাহিনী, সেই কথা, যা তাহাকে এমনি অকল্পনীয় কাজটি করিতে বাধ্য করিয়াছে। মাযহার আলি স্ত্রীকে বলিতে লাগিল —

"আমি জানি, এই কাজের পিছনে কার্যকর কারণ হিসাবে অনেকের মত তুমিও কত কিছু ভাবিতেছ। হয়তো এমন সন্দেহও তোমার মনে আসিয়াছে যাহা আমার প্রিয়সঙ্গিনী হিসাবে তোমার যত আনন্দ যত অহঙ্কার, তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু এই দুনিয়ায় এমন কত কিছু ঘটে যাহার কারণ মানুষের ধারণার পাশ কাটাইয়া যায় চিরদিন। ...

"শৈশবে পিতৃহীন হইয়া এই সংসার-সাগরে আমি খড়কুটার মত ভাসিয়া বেড়াইয়াছি। আত্মীয়-স্বজন আপন জন এমন কেউ ছিল না যাহার আশ্রয়ে এই দুনিয়ার মাটিতে দৃঢ় পা রাখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতাম। তবুও এই অসহায়েরও দিনের পর দিন গেল। আমি যুবক হইয়া উঠিলাম। অসম্ভবও সম্ভব হইয়া গেল আমার জীবনে। এই সংসার সাগরে আমিও একদিন খুঁজিয়া পাইলাম নিরাপত্তার একটি ছোট্ট সবুজ দ্বীপ। বৃটিশ সৈন্যদলে চাকুরি পাইলাম আমি। তার পরের মাযহার আলিকে তুমি চেন, জান। আমার জীবনে আসিলে তুমি। আমি সুখী হইলাম। প্রেমময়ী স্ত্রী, দুইটি ছেলেমেয়ে, চাকুরিতে পদোন্নতি- জীবনে আমার অধিক কামনা করিবার আর কিই বা ছিল! সবাই জানিত- মাযহার আলির সৌভাগ্যের চাঁদ মেঘের পর মেঘের আড়াল কাটাইয়া আসমানের নীলে ভাসিয়া উঠিয়াছে। আমার সুখী জীবন, সুন্দর সংসার ছিল যে-কাহারও ঈর্ষার বস্তু। এইতো সেইদিন অসুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার পরম হিতাকাঙ্খী মেজর নীল হাসপাতালে আমার চমৎকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

"এই পর্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহা তোমার জানা কথারই পুনরাবৃত্তি। ... হাসপাতালের দিনগুলি আমার নিশ্চিন্তেই কাটিতেছিল। আসিল ১৩ই মার্চের রাত। ঔষধ-পথ্য খাইয়া আমি শুইয়া পড়িলাম। তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি- এমন সময় একজনের মৃদু করস্পর্শে আমি চোখ মেলিলাম। আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ ফকির সাহেব। বিছানায় উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কে? হাতপাতালের এই কক্ষে তিনি কেমন করিয়া আসিলেন?

গম্ভীর কন্ঠে তিনি উত্তর দিলেন- 'কেমন করিয়া এই কক্ষে আসিলাম, তাহা

www.pathagar.com

নাই বা জানিলে। আমি তোমার পিতার সমবয়সী, তাঁহার এক পরিচিত জন।'

'আমার পিতা?'- আমার বিস্ময়মাখা প্রশ্নজাতীয় কথায় তিনি বলিলেন- 'জানি, তোমার পিতা 'লাইট ক্যাভাল্‌রি'র দ্বিতীয় রেজিমেন্টের দফাদার সেই সফর আলি খানের চেহারা মুবারক তোমার স্মৃতিতে জাগে না। তিনি যখন এই দুনিয়া ছাড়িয়া যান, তখন তোমার বয়স চার কি পাঁচ বছর মাত্র। আচ্ছা মাযহার আলি, তুমি কি জান- কিভাবে তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল?' আমার সমস্ত হারানো অতীত নিয়া যেন ফকির সাহেব আমার কক্ষে আসিয়াছেন! মনে আমার এক অজানা বিস্ময়ের ঘোর। বলিলাম,- 'জানি না।'

'আমি জানি।' ফকির সাহেব আমার মনকে আরও বেশি করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

'কানপুরের সতীচূড়া ঘাট ও বিবিঘরের হত্যা-কাহিনী সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবহিত আছ?'

'আছি।'

'এক মাস কাটিতে না কাটিতেই ইংরেজরা আবার অধিকার করিল তাহাদের হারানো কানপুর। এবং এইবার আরম্ভ হইল প্রতিশোধের নামে বিপুলভাবে নরহত্যা আর অত্যাচার। যাহাকে হাতের কাছে পায়, ইংরেজরা তাহাকেই ধরিয়া আনে সতীচূড়া ঘাটের বা বিবিঘরের হত্যাকারী বা হত্যাকারীদের সাহায্যকারী সন্দেহে। ১৮৫৭ সালের ২৫ শে জুলাই এমনি এক সন্দেহে ধৃত হন তোমার জান্নাতবাসী পিতা দফাদার সফর আলি খান।'

'আমার পিতা কি তবে-' কথা শেষ করিতে পারিলাম না। ফকির সাহেব চাপা গর্জন করিয়া উঠিলেন- 'ঝুটা সন্দেহ। আমার মত অনেকেই জানিত- তোমার পিতা ছিলেন সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

'তারপর?'- আমার কণ্ঠে গভীর আগ্রহ!

'সফর আলি খানের বিরুদ্ধে ঝুটা অভিযোগ- সতীচূড়া ঘাটে তিনি বৃদ্ধ জেনারেল হুইলারের গলা কাটিয়াছিলেন। সফর আলি দৃঢ়তার সঙ্গে তাহা অস্বীকার করিলেন। কিন্তু ওরা চায়- এদেশীয়দের হত্যা করিতে, অপরাধ বা বিচার তো শুধু প্রহসন। সফর আলিরও বিচার হইয়া গেল। তিনি হুইলারের হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলেন। শাস্তি- ফাঁসিতে ঝুলাইয়া মৃত্যু।'

'মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ দিয়াছিলেন আমার পিতা?'

'শুধু তোমার পিতা নয়, আরো অনেকেই!'...

"আমার দেহ মনে তখন এক প্রবল চাঞ্চল্য। আমি যেন ক্রমেই নিজেকে

www.pathagar.com

হারাইয়া যাইতে লাগিলাম। ফকির সাহেব বলিয়া চলিলেন 'এতেই তুমি অধীর হইয়া উঠিতেছ? এমনি ফাঁসির আসামিগণকে দিয়া সেইদিন আরও একটি কাজ করানো হইত। হ্যাঁ, এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে কানপুর শহরে অনেক লোকজনকে ডাকাইয়া আনা হইত এইসব ফাঁসির কর্মকান্ড দেখানোর জন্য। ২৫ শে জুলাই তোমার পিতা ধরা পড়িয়াছেন শুনিয়া আমিও ছুটিয়া আসিলাম। ভিড়িয়া গেলাম ফাঁসির দর্শকদের দলে। ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল নীল সাহেবের তদারকীতে হয় এইসব ফাঁসি। অন্য যে কাজটির উল্লেখ করিলাম, তাহাও ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল নীল সাহেবেরই আদেশে করানো হয়।'

'সেই কাজটি কি?'- আমার কন্ঠে জ্বালামাখা প্রশ্ন।

'ধৈর্য ধরিয়া শোন। ফাঁসির আসামীকে ফাঁসির আগে বিবিঘরের জমাট-রক্তাক্ত মেঝের এক বর্গফুট স্থান জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।'

সারা দেহ আমার শিহরিত হইয়া উঠিল। কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল 'অসহ্য, অমানবিক!!'

'বিবিঘরে ঢুকিতে চাহেন না তোমার পিতা, কিন্তু মেজর বুসের মেথর-পুলিশের চাবকানোর ফলে না ঢুকিয়াও তো উপায় নাই। বিবিঘরে ঢুকানো হইল তোমার পিতাকে। চাবুকের সাহায্যেই পশুর মত উপুড় করানো হইল সফর আলিকে। রীতি অনুসারে মেঝেতে পানি ঢালিয়া জমাট রক্তকে ভিজাইয়া রাখা হইয়াছে আগেই। এইবার সফর আলি নিজের জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া চাটিয়া পরিষ্কার করিবেন এক বর্গফুট স্থান।'

আহ্, আহ্! -- অসহ্য যন্ত্রণায় আমি ছটফট করিয়া উঠিলাম।

''চাটিবার আগে উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন দফাদার সফর আলি খান-

'বন্ধুগণ, নিজ চোখে তোমরা দেখিতেছ আমার অবস্থা। ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল নীলের আদেশে, বিনা দোষে মেজর বুসের মেথর-পুলিশ আমাকে চাবকাইতেছে। বিনা দোষে আমাকে জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে এই ঘরের রক্তমাখা মেঝের এক বর্গফুট স্থান। জনতার মধ্যে দরদী কেউ যদি থাক, উপস্থিত থাক যদি কোন মু'মিন মুসলমান... আল্লাহ্-রসুলের দোহাই- রোটাকে আমার বাসগৃহে রহিয়াছে আমার শিশু সন্তান মাযহার আলি। তাহাকে আর তাহার আম্মাকে জানাইও এই খবর। হে রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্! আমার শিশুপুত্র মাযহার আলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়ো। তৌফিক দিয়ো, সামর্থ্য দিয়ো তাহাকে-

www.pathagar.com

আমার উপর এই অন্যায় অপমান, এই মৃত্যুর প্রতিশোধ যেন গ্রহণ করিতে পারে আমার পুত্র মাযহার আলি। জেনারেল নীল, অথবা তাহার আওলাদ ...

চীৎকার করিয়া উঠিলাম– 'কোথায় আজ সেই জেনারেল?'

গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, উত্তর ঠিক নয়, যেন নির্দেশ দিলেন আমাকে, – '১৮৫৭ সালের ২৫ শে জুলাই ব্রিগেডিয়ার–জেনারেল নীলের আদেশে এমনিভাবে প্রাণ দিলেন তোমার পিতা সফর আলি খান। আজ ১৮৮৭ সালের ১৩ই মার্চের রাত। তোমার পিতার বন্ধু হিসাবে, মু'মিন কিনা জানি না– তবে এক মুসলমান হিসাবে, অনেকের মত আমিও এক ভ্রাম্যমান ফকির... তোমার বয়োবৃদ্ধির জন্য আমাকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। তারপর, আজ রাত্রিতে তোমার অবস্থিতি জানিতে পারিয়া আসিয়াছি এখানে। তোমাকে যাহা জানাইবার ছিল, জানাইয়াছি। জানি, ব্রিগেডিয়ার–জেনারেল নীলেরই পুত্র মেজর নীল তোমার অধিনায়ক, তোমার প্রতি যাহার অনুগ্রহ অসীম। তবুও, আমার দায়িত্ব আমি সম্পন্ন করিলাম। তোমার জন্য আমার দোয়া রহিল।'

বাহির হইয়া গেলেন ফকির সাহেব। আমি নির্বাক দাঁড়াইয়া রহিলাম কাঠের পুতুলেরমত।

"বুঝিতেই পার, সারা রাত্রি কাটিল আমার নিদ্রাহীন। ভোর হইল। বাহির হইয়া গেলাম হাসপাতাল হইতে। আমাদের ঘর হইতে বন্দুক হাতে নিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া, আমি— সওয়ার মাযহার আলি খান আসিয়া হাজির হইলাম প্যারেড গ্রাউন্ডে।"

তারপর.....

চারজনই নীরব। হাজতের প্রহরী জানাইয়া দিল, সাক্ষাতের সময় শেষ হইয়াছে।

www.pathagar.com

"সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" প্রণেতা রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় 'পঞ্চম খণ্ডে'র উপসংহারে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেনঃ

"এই মহাবিপ্লবের সংঘাতে ভারতবর্ষে কোম্পানীর রাজত্ব বিলুপ্ত হয়। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। যে আইন অনুসারে এই পরিবর্তন ঘটে, তাহা ১৮৫৮ অব্দের ২রা আগষ্ট মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। মহারাণী পরবর্তী ১লা নভেম্বর ভারতবাসীদিগের মধ্যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া ভারত সাম্রাজ্য শাসনে উদ্যত হলেন। যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন লর্ড ডার্বি ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। প্রথমে যেভাবে ঘোষণাপত্র লিখিত হইয়াছিল, তাহা মহারাণী এবং তদীয় স্বামী যুবরাজ আলবার্টের দ্বারা অনুমোদিত হয় নাই। মহারাণী আপনার আপত্তি নির্দেশপূর্বক প্রধানমন্ত্রীকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি যেন তদীয় অত্যুৎকৃষ্ট ভাষায় ঘোষণাপত্রখানি লিখেন। সুতরাং ঘোষণাপত্রখানি পূর্নবার লিখিত হয়, এবং এইরূপে উহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অসামান্য মহানুভবতা ও সমদর্শিতার পরিচয়স্থল হইয়া উঠে।"

আমরা এই অসামান্য মহানুভবতা ও সমদর্শিতার পরিচয়রূপী ঘোষণাপত্রখানির বাংলা অনুবাদ পেশ করিলাম।

মহারাণীর ঘোষণাপত্র

"আমি ভিক্টোরিয়া, জগদীশ্বরের প্রাসাদে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ড, এই সম্মিলিত রাজ্যের এবং ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতে উক্ত সম্মিলিত রাজ্যের যে সকল উপনিবেশ ও অধীনে জনপদ আছে, তৎসমুদয়ের অধীশ্বরী ও ধর্ম রক্ষাকারিনী।

"ভারতবর্ষের যে সকল প্রদেশ আমার অধিকারে আছে, এতদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তৎসমুদয় শাসন করিয়া আসিতেছিল। এক্ষণে আমি পার্লামেন্ট মহাসভার সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের উক্ত প্রদেশসমূহের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছি।

"এই ঘোষণাপত্র দ্বারা সাধারণকে জানাইতেছি যে, আমি পার্লামেন্ট মহাসভার পরামর্শে ও সম্মতিক্রমে ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে লইলাম।

www.pathagar.com

ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের প্রতি আমার এই আদেশ যে, তাহারা প্রজার যথার্থ ধর্ম পালন করিবে, আমার উত্তরাধিকারিগণের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবে, আমি ভারতবর্ষের শাসন কার্য নির্বাহের জন্য যে সকল কর্মচারী নিযুক্ত করিব তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে এবং তাঁহাদের আদেশ অনুসারে চলিবে।

আমার বিশ্বস্ত অমাত্য ও প্রিয়পাত্র মিষ্টার চার্লস জন ভাইকাউন্ট ক্যানিং বাহাদুরের প্রভুভক্তি, কর্মদক্ষতা ও সদ্বিবেচনার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া আমি তাঁহাকে আমার ভারত সাম্রাজ্যের প্রথম ভাইসরয় ও গভর্ণর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত করিলাম। আমি আমার কোন সেক্রেটারির দ্বারা সময়ে সময়ে যে সকল নিয়ম ও আদেশ প্রচার করিব, সেই সকল নিয়ম ও আদেশের অনুবর্তী ভাইকাউন্ট ক্যানিং বাহাদুর ভারত সাম্রাজ্যের শাসনকার্য নির্বাহ করিবেন।

"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য সময়ে যে সকল ব্যক্তি রাজকীয় কর্মে নিয়োজিত আছেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের আপন আপন কর্মে রাখা গেল। কিন্তু ভবিষ্যতে আমার যেরূপ ইচ্ছা হইবে, অথবা যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যাইবে, ঐ সকল কর্মচারীকে রাখা বা না রাখা, সেই ইচ্ছা ও সেই নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট হইবে।

"এতদ্বারা ভারতবর্ষের ভূপতিগণকে জানান যাইতেছে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের সহিত যে সকল সন্ধি ও তাঁহাদের নিকটে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, আমি সেই সকল সন্ধি রক্ষা ও সেই সকল প্রতিশ্রুতি পালন করিব। আশা করি, ভারতবর্ষের ভূপতিগণও আমার ন্যায় সন্ধি রক্ষা ও প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন।

"ভারতবর্ষে এখন আমার যে অধিকার আছে, তাহার আর বৃদ্ধি করিব না। অন্যে আমার রাজ্য আক্রমণ করিলে তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল দিতে ত্রুটি করিব না। যাঁহারা আমাদের পক্ষে আছেন, তাঁহাদিগকেও অপরের রাজ্য আক্রমণ করিতে দিব না। আমি ভারতবর্ষের ভূপতিদিগের অধিকার, পদ ও মর্যাদা, নিজের অধিকার, পদ ও মর্যাদার মত জ্ঞান করিব। দেশে শান্তি থাকিলে যেরূপ সুখ ও সৌভাগ্য ঘটিতে পারে, ভারতবর্ষের ভূপতিগণ এবং আমার প্রজাবর্গও সেইরূপ সুখে ও সৌভাগ্যে কালযাপন করিবেন।

"রাজধর্মের পালনার্থে আমি অপরাপর প্রজার নিকটে যেরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি, ভারতবর্ষের নিকটেও সেইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকিব। সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের প্রসাদে আমি এই প্রতিশ্রুতি যথারীতি পালন করিব।

"খ্রীষ্টীয় ধর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এই ধর্মের আশ্রয় লইলে যে সুখ ও

www.pathagar.com

সন্তোষ জন্মে, তাহাও আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করি। কিন্তু আমি আমার প্রজাবর্গ সম্বন্ধে এই বিশ্বাস অনুসারে কোন কার্য করিব না। আমি প্রকাশ করিতেছি যে, কোন ব্যক্তি তাহার বিশ্বাসমত কোন ধর্মসঙ্গত কার্যের অনুষ্ঠান করিলে অনুগৃহীত, নিগৃহীত বা উৎপীড়িত হইবে না। সকলেই আপনাদের বিশ্বাস অনুসারে আপন আপন ধর্মসম্মত কর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং সকলেই আমার অধিকারে তুল্যরূপে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইবে। যাঁহারা আমার অধীন ভারতবর্ষের শাসনকার্যে নিয়োজিত থাকিবেন, তাঁহাদিগকে আমি এই আদেশ দিতেছি যে, তাঁহারা যেন আমার কোন প্রজার ধর্মে কোনরূপে হস্তক্ষেপ না করেন। যিনি হস্তক্ষেপ করিবেন, তিনি আমার যারপর-নাই বিরাগভাজন ও কোপে পতিত হইবেন।

"আমার প্রজারা যে জাতি বা যে ধর্মাবলম্বী হউক না কেন, আপনাদের বিদ্যা, ক্ষমতা ও সচ্চরিত্রতাবলে গভর্ণমেন্টের অধীনে যে সকল কর্ম করিতে সমর্থ হইবে, তাহাদিগকে বিনা পক্ষপাতে সেই সকল কর্মে নিযুক্ত করা যাইবে।

"ভারতবর্ষীয়গণ আপন আপন পূর্ব পুরুষ হইতে যে সকল ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, তৎসমুদয়ের উপর তাহাদের যে কত মায়া ও কত যত্ন জন্মে, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। ঐ সকল ভূসম্পত্তিতে যাহার যেরূপ স্বত্ব ও অধিকার আছে, তাহাকে সেই স্বত্ব ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। কিন্তু তাহাকে গভর্ণমেন্টের প্রাপ্য অংশ যথানিয়মে দিতে হইবে। আইন প্রস্তুত করা ও আইন অনুসারে কার্য করার সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রাচীন স্বত্ব প্রাচীন রীতিনীতির উপর দৃষ্টি রাখা যাইবে।

"কতকগুলি দুরাশয় লোকে অমূলক জনরব তুলিয়া দিয়া, তাহাদের স্বদেশীয়দিগকে প্রতারিত ও রাজবিদ্রোহে নিয়োজিত করাতে দেশের অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছে। আমি এজন্য সাতিশয় দুঃখিত আছি। রাজবিদ্রোহ নিবারিত হওয়াতে আমাদের প্রভাব ও পরাক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সকল লোক প্রতারিত হইয়াছিল, এখন যদি তাহারা পুনরায় প্রজার ধর্ম অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধের মার্জনা করিব, এবং তাহাদের প্রতি দয়া ও সৌজন্য দেখাইব।

"ভারত সাম্রাজ্য নিরুপদ্রব করিবার অভিপ্রায়ে, ইহার পূর্বে আমার প্রতিনিধি ও গভর্ণর-জেনারেল ভাইকাউন্ট ক্যানিং বাহাদুর একটি প্রদেশের অপরাধীদিগকে তাহাদের অপরাধ মার্জনা করিবার আশা দিয়াছেন। যাহাদের অপরাধ মার্জনার যোগ্য নয়, তাহাদিগকে যে যথোচিত শাস্তি দেওয়া হইবে, তিনি তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। আমি গভর্ণর-জেনারেলের কার্যের অনুমোদন করিতেছি। অধিকন্তু

www.pathagar.com

সাধারণের গোচরার্থে প্রকাশ করিতেছি যে,-

"যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার ব্রিটিশ প্রজাদিগের নিধনে লিপ্ত ছিল, তাহারা ব্যতীত আর সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। এই নরঘাতকদিগের প্রতি ন্যায়ানুসারে দয়া প্রদর্শিত হইতে পারে না।

"যাহারা জানিয়া শুনিয়া নিজের ইচ্ছায় নরঘাতকদিগকে আশ্রয় দিয়াছে, কিংবা যাহারা গত রাজবিদ্রোহে কর্তৃত্ব করিয়াছে, তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে না, কিন্তু অন্য উপযুক্ত দণ্ড হইবে। ঐ সকল লোককে যথাযোগ্য দণ্ড দিবার সময়ে বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহারা কি অবস্থায় অন্যের কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া রাজবিদ্রোহীদিগকে প্রশ্রয় দিয়াছিল। প্রতারকদিগের কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া যাহারা অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের প্রতি যথোচিত অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইবে।

"এতদ্ব্যতীত যাহারা গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহারা যদি আপনাদের গৃহে ফিরিয়া গিয়া শান্ত ভাবে বৈষয়িক কর্মে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধের মার্জনা করা হইবে, এবং তাহারা যে অপরাধ করিয়াছিল তাহা আর মনে করা হইবে না।

"অপরাধ মার্জনা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম উল্লিখিত হইল, আগামী পহেলা জানুয়ারীর পূর্বে যাহারা সেই সকল নিয়ম পালন করিবে, তাহাদের সকলকে ক্ষমা করা যাইবে এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইবে।

"জগদীশ্বরের আশীর্বাদে শান্তি স্থাপিত হইলে ভারতবর্ষের কৃষি-বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্যে যথোচিত উৎসাহদান , সাধারণের উপকারে ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিষয়ের উৎকর্ষ সাধন এবং ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের উপকারের জন্য ভারত সাম্রাজ্য শাসন করা হইবে। ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের শ্রীবৃদ্ধি হইলেই আমি আপনাকে নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ ভাবিব, এবং প্রজারা সন্তুষ্ট হইয়া যে কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তি দেখাইবে, তাহাই আমি সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করিব। পরিশেষে প্রার্থনা এই, প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থে এই সকল সংকল্প যাহাতে আমি কার্যে পরিণত করিতে পারি, সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর আমাকে এবং আমার আদেশে যাঁহারা রাজ্যশাসন করিবেন, তাঁহাদিগকে সেইরূপ ক্ষমতা দান করুন।"

* * * *

কিন্তু এদেশবাসীর মনে ইংরেজের প্রতি অবিশ্বাস ও ঘৃণা এত শক্তভাবে শিকড় বিস্তার করিয়াছিল যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এই ঘোষণাপত্র প্রচারের পর হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু প্রেট্রিয়ট' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন-

www.pathagar.com

"বারংবার বিশ্বাসভঙ্গের ফলে ইংরেজ সরকারের ইজ্জত এত কমে গিয়েছে যে, সততার বাস্তব প্রমাণ না দিলে এই ঘোষণাপত্র যাদের উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়েছে তারা সহজে এ বিশ্বাস করবে না। এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে, আবার সুযোগ বুঝে সরকার তাদের এই প্রতিজ্ঞাগুলি ভঙ্গ করবে না। রাজাদের সঙ্গে যেসব সন্ধি প্রচলিত পন্থা অনুসারে পবিত্র প্রতিশ্রুতির দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেই সন্ধিগুলিই যখন বিনা দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে যাদের দ্বারা ভঙ্গ হতে পেরেছিল, তারাই যে এই নতুন প্রতিশ্রুতিগুলি অনুসারে কাজ করবে, তার গ্যারান্টি কোথায়, যদিও এই প্রতিশ্রুতিগুলি মহিমান্বিত সম্রাজ্ঞীর মুখ থেকে বের হয়েছে?"

www.pathagar.com

THE BENGALEE'S ADDRESS

TO

THE RIGHT HON'BLE CHARLES JOHN VISCOUNT CANNING,
Governor-General of India

My Lord- We, the undersigned Rajahs, Zeminders, Talookdars, Merchants, and other Natives of The province of Bengal, take the earliest opportunity, on the retaking of Delhi, to offer your Lordship in Council our warmest congraturations on the signal success which has attended the British arms, under circumstances unparalleled in the annals of British India.

The establishment of British supremacy was considered to have been completely effected a century ago, when Clive led a few ill-trained battalions against the preponderating and well-equipped force which represented the Mogul power on the plains of Plassey. But whether the inadequacy of the means of the magnitude of that achievement were more deserving of admiration, has not yet been determined by history.

No difference of opinion, however, can exist, as to the recapture of Delhi, the details of which have recently been published for general information. Though no one capable of forming a judgment on the subject ever doubted for a moment to the speedy reduction of Delhi, yet some little misgiving might have been felt by those who knew how well furnished was the place with the munitions of war, and occupied by what an immense number of men, whose fiendish animosity was excited to the utmost by that resolution, discipline, and acquaintance with the art of war, which they had basely revolted. But there can be no question of the admiration with which the world will learn by what a handful of men the arduous work has been achieved,- in a brief period,-

www.pathagar.com

with the limited resources, arising from the unhealthiness of the season, that were all but overwhelming.

Such a result, under such circumstances, never could have been hoped for but from the well grounded confidence of brave hearts, heroically devoted to the service of their country and sustained by a sense of heriditary and indomitable prowess.

Happily remote from the scene of the outrages, which have darkened the aspect of the land, and tarnished that reputation for fidelity for which the native soldiery were once pre-eminent, we have derived sincere consolation from the reflection that in Bengal proper there has been no disturbance, not even a symptom of disaffection; but that, on the contrary, the people have maintained that loyalty and devotion to the British Government, which led their ancestors to hell, and as far as they could to facilitate, the rising ascendency of that power.

Under the fostering influence of that Government, the population of the country has increased, its agliculture has extended, security has been given to life and property, and the value of land, both at the Presidency and in the interior, has been very considerably enhanced.

Such, indeed, has been the confidence of the people throughout Bengal in the security of the British rule, that these benefits have gone on progressively, even during the height of the disturbances and alarms that have prevailed in the North-Western Provinces.

Sensible of the benefits they have enjoyed under British administration, the people could not but cordially sympathize with the embarrassing position in which their rulers had suddenly been placed, and sincerely long for the speedy and entire re-establishment of British supremacy in the disturbed districts. So entirely

www.pathagar.com

have they identified their interests with those of their rulers that the natives of Bengal, men, women, and children, have in every part of the scene of the mutinies, been exposed to the same rancour and treated with the same cruelty, which the mutineers and their misguided countrymen have displayed towards the British within their reach.

While we review with exultation the benefits our countrymen at large have derived from connection with and steadfast adherence to the British power, and while we congratulate your Lordship in Council on the success of the Britih arms against the mutinous soldiery, and on the happy prospect before us of the early restoration of tranquillity, we cannot fail to advert, and with no less satisfaction, to the administrative abilities which have conspicuouly mark this part of your Lordship's career, and which have indeed been fully equal to the crisis. No sooner had the disloyalty to the sepoys been distinctly exhibited, than your Lordship took measures, with equal foresight and energy, to obtain reinforcements of British troops as well from the neighbouring Presidencies and dependencies of the British Crown, as from the expedition then known to be on its way to a wholly defferent sphere of operations, and hasten them to the disturbed districts.

Such measures at once assured the public on the speedy restoration of tranquillity throughout these territories. But not satisfied with these prospective advantages, your Lordship in Council made such prompt use of the means that were within your immediate reach at the moment, as to ensure the reduction of the stronghold and rallying point of the mutineers, long ere the arrival of any considerable portion of the succours which Her Majesty's Government were prepared to send out to India, for the restoration of this empire to its former codition.

www.pathagar.com

In our anxiety to dispel those clouds which have troubled the political horizon, your Lordship has not been inattentive to measures which would have appeared as of subordinate importance to minds of less perspicacity, foresight, and comprehension. It has been a prominent object with your Lordship both effectually to crush the disaffected and rebellious, and to protect and re-assure the loyal and obedient. Accordingly, the extensive powers of legislation vested in your hands have been employed to punish crimes of every form and magnitude against the state with promptitude and rigour; to check vigorously the progress of sedition and disloyalty; and to give a guarantee to the people at large that those powers would be wielded with justice and indiscrimination, so as to guard as far as possible against faithful and innocent subject being confounded with the disseminators of sedition and perpetrators of open mutiny or secret treachery.

Permit us to hope that your Lordship in Council will receive our heartfelt congratulation on the eminent success which has crowned the British Arms, and the warmest expression of our confidence from the opportune display of those signal talents which have distinguished your administration in times of unexampled difficulty, and have largely contributed to the safety of the British empire in these regions and the re-assurunce of the peaceful and loyal.

We have the honour to be,
My Lord
Your most obedient and faithful servants,
(Sd.) Maharajah Mahatab Chund Bahadoor, of Burdwan,
Rajah Radhakant Bahadoor,
Raja Kali Krisna Bahadoor,
and others, inhabitans of Bengal, upwards of Two thousand Five Hundred.

www.pathagar.com

REPLY

NO. 2699

From CECIL BEADON, Esq.

Secretary to the Government of India.

To Maharajah MAHATAB CHUND BAHADOOR, of Burdwan, Rajah RADHAKANT BAHADOOR, Rajah KALI KRISNA BAHADOO R and others.

Home Department Dated the 17th December, 1857.

Gentlemn.- I am directed by the Right Hon'ble the Governor-General in Council to thank you for your address of congratulation upon the success of the British Arms in The North-Western Provinces.

The honour which you give to the brave men who recaptured Delhi is richly deserved. The Governor-General in Council agrees with you in believing that when the difficulties and discouragement by which Major- General Wilson and his troops were beset, shall be fully known, their achievenment will call forth the admiration of the World.

It is a pleasure to the Governor- General in Council to be able to confirm the praise for unbroken loyalty, which you have claimed for the province of Bengal proper. Excepting places where the inhabitants have suffered violence from a mutinous soldiery beyond the reach of English troops, there has been no disturbance in that province; the wealthiest, the most richly cultivated, and the most thickly peopled, India, and yet the one which for many years past has had least share of protection from European troops.

The Governor-General in Council receives with great satisfaction the expression for your confidence in the Government. No man living has a deeper stake in its measures and its policy than yourselves. If peace, order, and security are valuable to any, they are so to those who, like, the foremost amongst you, hold high rank,

www.pathagar.com

large hereditary possessions, accumulated wealth, and respected social position. You do rigard your interests, as bound up with those of your rulers, and you may be certain that your rulers, will do nothing to severe them. Justice, policy, and the duty of England to India forbid it.

In conclusion, the Governor-General in Council desires me to thank you for the spirit of attachment and loyalty to the British Government which has dictated your address.

Fort William — I have the honour to be, Etc.

The 17the Dec, 1857 — (Sd.) CECIL BEADON,

Secy, to the Govt. of India

To

The Right Hon'ble CHARLES JOHN VISCOUNT CANNING,

Governor- General of India in Council

My Lord,- We, the undersigned Rajahs, Zemindars, Talookdars, Merchants, Tradesmen, Agriculturists, and other natives of the provinces of Bengal, Behar and Orissa, beg leave to approach your Lordship in Council with this address expressive of our deep sense of gratitude for the several measures of security adopted by your Lordship in Council since disturbaces have broken out in the Upper and Central provinces of British India, and of our admiration for the wisdom, justice and foresight which characterize measures.

The difficulties which beset the Government of an empire so peculiarly constituted as that of British India, must under any circumstances, be great and calculated to task the most practised statesmanship. But at a time like this when the most momentous crisis that can occur in the history of a country is passing over ours, the successful conduct of affairs ought to entitle those entrusted with the public safety to the most unbounded praise and to inspire the utmost confidence in their

www.pathagar.com

measures.

We, the undersigned, on our part and on the part of our countrymen generally, beg leave most respectfully to affirm that such praise is emphatically due to the administration of which your Lordship is the head, and such confidence is most worthily reposed by your countrymen in its justice, capacity and wisdom.

Such an expression of opinion as we intend this address to be, might under ordinary circumstances, be liable to be considered as uncalled for, and even, perhaps, presumptuous. But under existing circumstances, we feel it a duty to our countrymen to adopt the course we have done. It has become notorious throughout this land that your Lordship's administration has been assailed by faction, and assailed because your Lordship in Council has refused compliance with capricious demands, and to treat the loyal portion of the Indian population as rebels, because your Lordship has directed that punishment for offences against the State should be dealt out with indiscrimination, because your Lordship having regard for the future has not pursued a policy of universal irritation and unreasoning violence, and finally because your Lordship has confined coercion and punishment within necessary and politic limits.

Whatever may be the motives that influenced those who have joined in these proceedings, we entertain no apprehensions whatever of their representations having the effect which they desire to produce. We have observed with pain, but without misgiving, the incessant, though happily harmless, endeavours made by them to thwart the action of authority, to impeach its views and to embarrass its councils. But now that, My Lord, they have ventured to carry their misstatements to the foot of Throne, it is time and justice to ourselves and to our countrymen demands,-that a national protest against these most unjustifiable proceedings should be thus placed upon record.

www.pathagar.com

We beg permission to subscribe ourselves.
My Lord.

Your Lordship's most obedient and faithful servants.

(Sd.) MAHARAJAH SREESH CHUNDER ROY.

And more than 5,000 natives of the provinces of Bengal. Behar and Orissa.

REPLY

NO. 2700

From CECIL BEADON. Esq.

Secretary to the Government of India.

To Maharajah SREERH CHUNDER BAHADOOR. of Nuddeah.

Rajah PERTAUB CHANDER SINGH BAHADOOR.

Rajah PRASONONATH ROY BAHADOOR.

Baboo JOYKISSEN MUKERJEE. and others.

Home Department Dated the 17th December 1857.

Gentlemen,- The Right Hon'ble the Governor-General in Council directs me to thank you for the address which he has received at your hands.

The Governor-General in Council sees amongst the numerous signatures to that address the names of men of ancient lineage. of vast possessions. and of great wealth; of men of cultivated intelligence. who have been foremost in measures of beneficence in the encouragement of education. and in works of material public improvement; men whose influence with their fellow-countrymen is deservedly great. and whose interest in the peace and well-being of India. it would be difficult to exaggerate.

No person will hold cheaply the opinions of such a body. and the possession of its confidence and good will would be a source of strength to any Government.

Therefore the Governor-General in Council desires me in thanking you for your address. to add emphatically that he receives it with much satisfaction.

The motives which have induced the presentation of

www.pathagar.com

the address are stated by you. Upon these the Governor-General in Council desires me to say a few words.

In times of heat and violence, when the hearts of individuals have been torn, and the feelings of classes inflamed, the judgment which men pass upon each other and upon events around them are seldom dispassionate; especially their judgment upon those whose high and solemn duty it is, whilst repressing crime and averting danger, to guide the measures of the State in the straight path of justice.

In such times there lies upon every loyal man the obligation so to govern his acts and words so as to prevent or allay irritation; not to excite or heighten it. The Governor-General in Council calls upon you, each in your sphere, to be mindful of this duty.

The Governor-General in Council wishes you to rest assured that the Goverment of India will not forget, that England will not forget that if unhappily the mutineers and rebels of India are to be reckoned by thousands, the peaceful and loyal subjects of the Queen in India are numbered by millions. You may be sure that by no act of the Government, by no general proscriptions of sweeping condemnations of race or creed, shall these last men be classed with the first.

The course of the Goverment of India has been, and will continue to be simple and clear; to strike down resistance without mercy; but when resistance ends to allow deliberate justice to resume its sway : justice stern and inflexble, but indiscriminatin.

Fort William
The 17th December, 1857

I have the honour to be
Gentlemen,
Your most obedient servant,
(Sd.) CECIL BEADON,
Secy. to the Govt. of India,

www.pathagar.com

[কার্ল মার্কসের "ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী" থেকে (প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতাযুদ্ধ ১৮৫৭–১৮৫৯, পৃষ্ঠা ১৯৭–২০৬ এবং উক্ত গ্রন্থটির অন্যান্য অংশ –পৃঃ ২৪০, ১৫৭–১৫৮– উদ্ধৃত]।

১৮৫৬ নবাবের কুশাসনের জন্য অযোধ্যা আত্মসাৎ। – পাঞ্জাবের মহারাজা দলীপ সিংহ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। অহংকারপূর্ণ একটি 'বিদায়কালীন কার্যবৃত্তি' লিখে ডালহৌসির প্রত্যাবর্তন; অন্যান্য জিনিসের মধ্যে খাল, রেলপথ, ইলেকট্রিক, টেলিগ্রাফ নির্মাণ; অধিকারভুক্ত অযোধ্যার আয় বাদ দিয়েও রাজস্বে ৪০ লক্ষ পাউন্ডের বৃদ্ধি; কলকাতায় বাণিজ্যকারী জাহাজের বাহিত মালের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বেশি; বস্তুত সরকারী খাতের ঘাটতি, কিন্তু তার কারণ পূর্ত কর্মে মোটা খরচ। এ জাঁকজমকের জবাব এল সিপাহী বিপ্লব (১৮৫৭–১৮৫৯)। অযোধ্যা ছিল মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু আঠারো শতকের মাঝামাঝি অযোধ্যায় মোগল শাসনকর্তা কার্যক্ষেত্রে একজন স্বাধীন শাসক হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজরা ১৭৬৫ সালে অযোধ্যাকে বৃটিশের অধীন এক করদ রাজ্যে পরিণত করে। রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে চলে যায় বৃটিশ রেসিডেন্টের হাতে। এই অবস্থা ঢাকার জন্য ইংরেজরা অযোধ্যার শাসককে প্রায়ই অভিহিত করত রাজা বলে।

কলমের এক খোঁচায় ইংলন্ড শুধু কতিপয় অভিজাত বা এক রাজবংশের সম্পত্তিই নয়, বাজেয়াপ্ত করেছে প্রায় আয়ার্ল্যান্ডের মতো বৃহৎ একটা রাজ্যের গোটা এলাকা, স্বয়ং লর্ড এলেনবরো–র ভাষায়, "একটা গোটা জাতির উত্তরাধিকার।" ··· সংক্ষেপে, অযোধ্যার লোকেরা বৃটিশ সরকারের বৈধ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং বৃটিশ সরকার এখন পরিষ্কার ঘোষণা করছে যে বাজেয়াপ্তির যুক্তি হিসাবে বিদ্রোহই যথেষ্ট। সুতরাং লর্ড ক্যানিঙের সমস্ত ধানাই–পানাই বাদ দিলে গোটা প্রশ্নটা দাঁড়ায় এই যে, তিনি ধরে নিচ্ছেন অযোধ্যায় বৃটিশ শাসন বৈধভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অযোধ্যায় বৃটিশ শাসন কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এইভাবে ঃ ১৮৫৬ সালে লর্ড ডালহৌসি যখন ভাবলেন ব্যবস্থা গ্রহণের সময় হয়েছে, তখন তিনি কানপুরে একদল সৈন্য সমাবেশ করলেন, অযোধ্যার রাজাকে (ওয়াজিদ আলি শাহ্) বলা হল, ওটা নেপালের বিরুদ্ধে একটা পর্যবেক্ষণ কোর হিসাবে কাজ করবে। এই সৈন্যবাহিনী সহসা অভিযান করে লক্ষ্ণৌ দখল ও রাজাকে বন্দী করে। বৃটিশের হাতে দেশটা তুলে দেবার জন্য তাঁকে তাগাদা দেওয়া হয়, কিন্তু কোন কাজ হয়

www.pathagar.com

না। তখন তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয় ও দেশটা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এলাকাভুক্ত করে নেওয়া হয়। এই বেইমানি আক্রমণের ভিত্তি হল লর্ড ওয়েলেসসি সম্পাদিত ১৮০১ সালে ৬ নং ধারা। এ চুক্তিও ছিল ১৭৯৮ সালে স্যার জন শোর সম্পাদিত চুক্তির স্বাভাবিক পরিণতি। দেশীয় রাজাদের সহিত আচরণে ইঙ্গ-ভারতীয় সরকারের সাধারণ কর্মনীতি অনুসারে ১৭৯৮ সালে এই প্রথম চুক্তিটি ছিল উভয় পক্ষের আক্রমণাত্মক আত্মরক্ষামূলক মৈত্রীর একটি চুক্তি। এতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পাওনা হয় বছরে ৭৬ লক্ষ টাকার একটা ভরণ পোষণ, কিন্তু ১২ নং ও ১৩ নং ধারা অনুসারে রাজা দেশের করভার হ্রাস করতে বাধ্য থাকেন। বস্তুতপক্ষে, এ দুটি শর্ত প্রকাশ্যেই পরস্পর বিরোধী এবং যুগপৎ এ দুটি পূরণ করা রাজার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রত্যাশিত সে পরিণতি থেকে দেখা দেয় নতুন জটিলতা, তার ফল ১৮০১ সালের চুক্তি, যার বলে ভূতপূর্ব চুক্তির তথাকথিত লংঘনের জন্য রাজ্যের একাংশ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ছেড়ে দিতে হয়। প্রসঙ্গত, এ ভাবে অঞ্চল কেড়ে নেওয়া সে-সময় পার্লামেন্টে ডাহা ডাকাতি বলে নিন্দিত হয়, লর্ড ওয়েলেসলির পরিবারের যে রাজনৈতিক দাবী উঠেছিল তা না থাকলে তখন তাঁকে তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হতে হত।

১৭৫৭-সিপাহী বিদ্রোহ। কয়েক বছর হল সিপাহী বাহিনী অত্যন্ত বিশৃঙ্খল; অযোধ্যার ৪০,০০০ সৈন্য এতে ছিল, বর্ণ ও জাতির সূত্রে তারা আবদ্ধ; সে বাহিনীতে একই নাড়ীর টান সবায়ের মধ্যে, উপরওয়ালারা কোনো রেজিমেন্টেকে অপমান করলে সে অপমান লাগত সবার গায়ে; অফিসাররা ক্ষমতাবিহীন; শৃংখলার অভাব; প্রকাশ্য বিদ্রোহ প্রায় ঘটত, কোনোক্রমে তার দমন দলত, রেঙ্গুন আক্রমণে সমুদ্র পাড়ি দিতে সরাসরি অস্বীকার করল বেঙ্গল আর্মি, ফলে তাদের জায়গায় আনতে হয় শিখ রেজিমেন্টগুলিকে (১৮৫২)। (এ সমস্ত ঘটে পাঞ্জাব আত্মসাৎ করার পর ১৮৪৯-এ, এবং ১৮৫৬-এ অযোধ্যা গ্রাসের পর অবস্থা আরও খারাপ হয়)। স্বেচ্ছাচারী কাজ করে লর্ড ক্যানিং প্রশাসন শুরু করেন; তখন পর্যন্ত মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে সিপাহীদের রেগুলেশন মাফিক ভর্তি করা হত পৃথিবীর যে কোনো স্থানে কাজের জন্য, আর বাঙ্গালীদের শুধু ভারতে কাজের জন্য; ক্যানিং "কর্মস্থান নির্বিশেষে সৈন্য শ্রেণী ভুক্তি ব্যবস্থা" চালু করলেন বঙ্গে। এটিকে জাতিপ্রথা অবসানের প্রয়াস ইত্যাদি বলে নিন্দা করে "ফকিরেরা।"

১৮৫৭-র গোড়ার দিকে সেইমাত্র প্রচলিত শূয়র ও গরুর চর্বি মাখানো টোটার প্রবর্তন, ফকিররা বলতে লাগল, ইচ্ছে করে করা হয়েছে যাতে প্রত্যেক সিপাহী

www.pathagar.com

জাত খোয়ায়।

সুতরাং ব্যারাকপুরে (কলকাতার কাছে) এবং রানীগঞ্জে (বাঁকুড়ার কাছে) সিপাহী বিদ্রোহ।

২৬ শে ফেব্রুয়ারী বহরমপুরে (মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে, হুগলীর উপরে) সিপাহী বিদ্রোহ; মার্চে ব্যারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহ; এ সমস্তই ঘটে বঙ্গে (বলপূর্বক দমিত)।

মার্চ ও এপ্রিল আম্বালা ও মিরাটের সিপাহীরা বারবার গোপনে নিজেদের ব্যারাকে আগুন লাগাত; অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলিতে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে লোকেদের ওসকাতে লাগল ফকিররা। বিথুরের (গঙ্গাকুলে) রাজা নানাসাহেব রাশিয়া, পারস্য, দিল্লীর রাজন্য এবং অযোধ্যায় ভূতপূর্ব রাজার সঙ্গে চক্রান্ত করছিলেন, চর্বি-মাখানো টোটার দরুন সিপাহীদের মধ্যে গন্ডগোলের সুবিধা নিলেন।

২৪শে এপ্রিল লক্ষ্ণৌতে ৪৮ নং বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৩ নং দেশীয় ঘোড়সওয়ার বাহিনী, ৭ নং অযোধ্যা ইররেগুলার্সের বিদ্রোহ ইংরাজ সৈন্য আনিয়ে দমন করলেন স্যার হেনরি লরেন্স। মিরাটে (দিল্লীর উত্তর-পূর্বে) ১১ নং এবং ২০ নং দেশীয় পদাতিক বাহিনী ইংরাজদের আক্রমণ করে নিজেদের অফিসারদের গুলী করে মেরে শহরে আগুন লাগিয়ে সমস্ত ইংরাজ মহিলা ও শিশুদের হত্যা করে চলে গেল দিল্লীতে।

দিল্লীতে রাত্রিবেলায় কিছু বিদ্রোহী ঘোড়ায় চেপে ঢুকল, সেখানকার সিপাহীরা (৫৪ নং, ৭৪ নং, ৩৮ নং দেশীয় পদাতিক বাহিনী) বিদ্রোহ করল; ইংরাজ কমিশনার, পাদরি অফিসারবর্গ নিহত; ন'জন ইংরাজ অফিসার অস্ত্রাগার রক্ষা করে তা উড়িয়ে দিল (দু'জনের মৃত্যু); শহরের অন্যান্য ইংরাজরা পালিয়ে গেল জঙ্গলে, বেশির ভাগ মারা গেল হয় দেশীয় লোকের হাতে, নয় ভয়ংকর আবহাওয়ার দরুন; কয়েকজন নিরাপদে পৌছল মিরাটে, সেখানে তখন সৈন্য নেই। দিল্লী কিন্তু অভ্যুত্থানীদের হাতে।

ফিরোজপুরে ৪৫ নং এবং ৫৭ নং দেশীয় পদাতিক বাহিনী দূর্গ দখলের চেষ্টা করে বিতাড়িত হল ৬১ নং ইংরাজ দলের হাতে; কিন্তু তারা শহর লুট করে আগুন লাগাল, পরের দিন দুর্গ থেকে বেরিয়ে ঘোড়সওয়াররা তাদের তাড়িয়ে দিল।

লাহোরে মিরাট এবং দিল্লীর খবর আসাতে জেনারেল করবেটের আদেশে সিপাহীদের সাধারণ প্যারেডে ডেকে তাদের নিরস্ত্র করা হল (কামান সমেত

www.pathagar.com

ইংরাজ সৈন্য তাদের ঘেরাও করে)।

২০শে মে; ৬৪ নং, ৫৫ নং, ৩৯ নং দেশীয় পদাতিক বাহিনীকে নিরস্ত্র করা হল পেশোয়ারে (লাহোরের মতন); তারপর অবশিষ্ট ইংরাজ ও বিশ্বস্ত শিখরা নৌশেরা ও মর্দানের অররুদ্ধ ষ্টেশন বাঁচাল, এবং মে মাসের শেষে কাছাকাছি ষ্টেশন থেকে জমায়েৎ করা কয়েকটি ইউরোপীয় রেজিমেন্ট কর্তৃক রক্ষিত আম্বালার ষ্টেশন : এখানে জেনারেল অ্যানসনের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনীর সার ভাগটা জড় হল—পাহাড় ষ্টেশন সিমলাকে আক্রমণ করা হয়নি, সেখানে গ্রীষ্মকালের দরুন বিস্তর ইংরাজ পরিবার।

২৫শে মে ছোট বাহিনী নিয়ে অ্যানসন দিল্লী রওয়ানা হলেন; ২৭শে মে তাঁর মৃত্যু ঘটে, তাঁর জায়গা নিলেন স্যার হেনরি বার্নার্ড; জেনারেল উইলসনের অধীনে ইংরাজ সৈন্যদল তাঁর সঙ্গে মিলিত হয় ৭ই জুন (এরা আসে মিরাট থেকে; পথে সিপাহীদের সঙ্গে কিছু লড়াই হয়)। সারা হিন্দুস্তানে বিদ্রোহের প্রসার; বিশটি বিভিন্ন জায়গায় এক সঙ্গে সিপাহীদের বিদ্রোহ এবং ইংরাজদের হত্যা; প্রধান ঘটনাস্থল ঃ আগ্রা, বেরিলি, মোরাদাবাদ। "ইংরাজ কুত্তাদের" বিশ্বাস রক্ষা করলেন সিন্ধিয়া, কিন্তু তাঁর "সৈন্যরা" নয়; পাতিয়ালার রাজা– ধিক! – ইংরাজদের সাহায্যার্থে বড়ো সৈন্যদল পাঠালেন! মৈনপুরে (উত্তর–পশ্চিম প্রদেশে) একটি নবীন জানোয়ার লেফটেনান্ট দ্য কান্টজো কোষাগার ও দুর্গ বাঁচালেন।

কানপুরে ১৮৫৭–র ৬ই জুনে স্যার হিউজ হুইলারকে অবরোধ করলেন নানাসাহেব (কানপুরে বিদ্রোহী তিনটি সিপাহী রেজিমেন্ট এবং দেশীয় ঘোড়সওয়ারদের তিনটি রেজিমেন্টের ভার তিনি নিয়েছিলেন, এদিকে কানপুর সৈন্যদলের সেনাপতি স্যার হিউজ হুইলারের কাছে ছিল ইউরোপীয় পদাতিকের একটি মাত্র ব্যাটালিয়ন, আর বাইরে থেকে সামান্য কিছু সৈন্য পেয়েছিলেন তিনি; দুর্গ এবং ব্যারাক তিনি রক্ষা করেছিলেন, সেখানে সমস্ত ইংরাজরা, নারী ও শিশুরা আশ্রয় নিয়েছিল)।

১৮৫৭, ২৬ শে জুন কানপুর ছেড়ে দিলে ইউরোপীয়দের সবাইকে ফিরে যেতে দেবার প্রস্তাব করলেন নানাসাহেব; ২৭ শে জুন (হুইলার এ প্রস্তাব মেনে নেওয়াতে) জীবিতদের ৪০০ জনকে নৌকায় চেপে গঙ্গা হয়ে যেতে দেওয়া হল; দুই তীর থেকে তাদের উপর গুলীবর্ষণ করেন নানা; একটি নৌকা রেহাই পায়, আরো কিছু দূর ভাটির দিকে সেটিকে আক্রমণ করা হল, নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া হল, রক্ষী সৈন্যদলের মাত্র চারজন পুরুষ পালাতে পারে। বালুচরে লেগে যাওয়া নারী ও শিশু বোঝাই একটি নৌকা ধরা পড়ে, লোকেদের কানপুরে নিয়ে গিয়ে

www.pathagar.com

সেখানে তাদের বন্দী হিসাবে কড়া পাহারায় রাখা হয়; চৌদ্দ দিন পর (জুলাই মাসে) ফতেগড় (ফারাক্কাবাদ থেকে তিন মাইল দূরে সামরিক ষ্টেশন) থেকে আরো ইংরাজ বন্দীদের সেখানে টেনে আনল বিদ্রোহী সিপাহীরা।

ক্যানিঙের আদেশে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও সিংহল থেকে সৈন্য আনয়ন। ২৩ শে মে নিলের নেতৃত্বে মাদ্রাজের অতিরিক্ত দল তীরে অবতরণ করল এবং বোম্বাইয়ের দল সিন্ধু নদের উজান হয়ে যাত্রা করল লাহোরে।

১৭ই জুন স্যার প্যাট্রিক গ্রান্ট (বঙ্গে অধিনায়কের পদে তিনি এসেছিলেন অ্যানসনের জায়গায়) এবং এ্যাডজুটান্ট-জেনারেল হ্যাভলক কলকাতা পৌছেই সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে রওয়ানা হলেন।

৬ই জুন এলাহাবাদে সিপাহীদের বিদ্রোহ, তারা (ইংরাজ) অফিসারদের স্ত্রী ও শিশু শুদ্ধ হত্যা করে দুর্গ দখলের চেষ্টা করল, দুর্গ রক্ষা করছিলেন কর্ণেল সিম্পসন, তিনি ১১ই জুন কলকাতা থেকে মাদ্রাজ ফুজিলিয়ার্সসহ আগত কর্ণেল নিলের সাহায্য পেলেন; শেষোক্তটি সমস্ত শিখদের বের করে দিয়ে দুর্গ দখলে এনে শুধু বৃটিশ সৈন্য মোতায়েন করেন সেখানে। (পথে তিনি বারানসী দখল এবং সবে অভ্যুত্থিত ৩৭ নং দেশীয় পদাতিক দলকে পরাজিত করেন; সিপাহীরা পালায়); (ইংরাজ) সৈন্যরা চারিদিক থেকে পালিয়ে আসে এলাহাবাদে।

৩০শে জুন এলাহাবাদে এসে জেনারেল হ্যাভলক সেনাপতিত্ব নিলেন, প্রায় ১,০০০ বৃটিশ সৈন্য সঙ্গে নিয়ে তিনি কানপুর অভিযান করেন; ১২ই জুলাই ফতেহপুরে সিপাহীরা প্রতিহত ইত্যাদি, আরো কয়েকটি লড়াই।

১৬ই জুলাই হ্যাভলকের বাহিনী কানপুরের উপকণ্ঠে; ভারতীয়দের পরাজয়, কিন্তু শহরের দূর্গে প্রবেশ করতে তাঁর অনেক দেরী হয়ে যায়; রাত্রে নানাসাহেব সমস্ত ইংরাজ বন্দীদের- অফিসার, নারী, শিশু সবাইকে হত্যা করেন; তারপর অস্ত্রাগার উড়িয়ে দিয়ে শহর ছেড়ে যান। ১৭ই জুলাই শহরে ইংরাজ সৈন্যদের প্রবেশ,- নানার আস্তানা বিথুরে গিয়ে হ্যাভলক বিনা বাধায় অধিকার করে প্রাসাদ ধ্বংস করলেন, উড়িয়ে দিলেন দুর্গ, তারপর ফিরে গেলেন কানপুরে; সেখানে ষ্টেশন রক্ষার ভার নিলকে দিয়ে লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের জন্য গেলেন; সেখানে স্যার হেনরি লরেন্সের প্রয়াস সত্ত্বেও রেসিডেন্সি বাদ দিয়ে সমস্ত শহর বিদ্রোহীদের হাতে চলে যায়।

৩০ শে জুন আশেপাশের বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে রক্ষী সেনাদলের সবাই বেরিয়ে আসে; প্রতিহত হয়; আবার রেসিডেন্সিতে আশ্রয় গ্রহণ; রেসিডেন্সি অবরুদ্ধ।

৪ঠা জুলাই স্যার হেনরি লরেন্সের মৃত্যু (২রা জুলাই একটি গোলার বিস্ফোরণে

www.pathagar.com

আঘাতের ফলে); ভার নিলেন কর্ণেল ইংলিস; বিদ্রোহীদের মাঝে মাঝে ছোটখাটো আক্রমণ করে তিন মাস তারা আত্মরক্ষা করে রইল।–হ্যাভলক কর্তৃক লড়াই। তিনি কানপুরে ফিরে গেলে অনেক সৈন্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে মিললেন স্যার জেমস উট্র্যাম, হ্যাভলকও বিভিন্ন বিদ্রোহী জেলা থেকে এমন অনেক রেজিমেন্ট আনিয়ে দিলেন।

১৯ শে সেপ্টেম্বর হ্যাভলক, উট্র্যাম ও নিলের অধীনে গোটা দল গঙ্গা পার হল। ২৩ শে এরা লক্ষ্ণৌ থেকে আট মাইল দূরে অযোধ্যার গ্রীষ্মকালীন রাজপ্রাসাদ আলমবাগ আক্রমণ করে দখল করে।

২৫ শে সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌর উপর চূড়ান্ত আক্রমণ চালিয়ে এরা পৌঁছল রেসিডেন্সিতে, এখানে অবরুদ্ধ অবস্থায় আরো দু'মাস থাকতে হল মিলিত দলটিকে। (শহরে লড়াইয়ের সময়ে জেনারেল নিলেন মৃত্যু; উট্র্যামের হাতে ভীষণ চোট লাগে)

২০ শে সেপ্টেম্বর জেনারেল উইলসনের পরিচালনায় ছ'দিন সত্যকার যুদ্ধের পর দিল্লী অধিকৃত (দিল্লী দখলকে আমরা অসাধারণ বা অতি বীরোচিত একটা সাহসের কাজ বলে গণ্য করি না, যে–কোনো লড়াইয়ের মতোই দুপক্ষ থেকে অবশ্যই অতি উদ্দীপনাময় বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে, ঘোড়সওয়ারী দল নিয়ে হডসন রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়ে বৃদ্ধ বাদশা ও বেগমকে (জিনাত মহল) ধরেন, দু'জনকে কারাগারে বন্দী করা হয়, এদিকে হডসন নিজের হাতে গুলী করে রাজকুমারদের হত্যা করলেন। দিল্লীতে রক্ষী সেনাদল রেখে ঠান্ডা করা হল। ঠিক তার পর কর্ণেল গ্রেডহেড দিল্লী থেকে গেলেন আগ্রায়, তার কাছাকাছি হোলকারের রাজধানী ইন্দোর থেকে আগত একটি বড়ো বিদ্রোহী দলকে তিনি পরাজিত করেন।

১০ই অক্টোবর আগ্রা অধিকার করে তিনি কানপুরে রওয়ানা হলেন, সেখানে পৌঁছেন ২৬শে অক্টোবর; ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটে আজমগড়ে, ছাতরা (হাজারিবাগের কাছে), খাজোয়া এবং দিল্লীর আশেপাশের এলাকায় ক্যাপ্টেন বোআলো, মেজর ইংলিস, পীলের (শেষোক্তটির সঙ্গে ছিল নৌবাহিনীর ব্রিগেড; তাছাড়া তখন লড়াইয়ে নামো–নামো হয়েছে ইংলণ্ড থেকে প্রেরিত প্রবিন ও ফেনের ঘোড়সওয়ারী দল; ভলান্টিয়ার রেজিমেন্টও গড়ে তোলা হয়েছে) এবং শাওয়ার্সের কাছে। আগষ্টে কলকাতার ভার গ্রহণ করে স্যার কলিন ক্যামবেল ব্যাপকতর আকারে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

১৮৫৭, ১৯শে নভেম্বর লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সিতে অবরুদ্ধ দলকে উদ্ধার করলেন

www.pathagar.com

স্যার কলিন ক্যামবেল। (২৪শে নভেম্বর স্যার হেনরি হ্যাভলকের মৃত্যু ঘটে)।

১৮৫৭, ৬ই ডিসেম্বর কানপুরে কলিন ক্যামবেলের বিজয়ী যুদ্ধ, শহর ফাঁকা করে ফেলে রেখে বিদ্রোহীদের পলায়ন, পিছু ধাওয়া করে স্যার হোপ গ্রান্ট তাদের খণ্ডবিখণ্ড করেন। পাতিয়ালা এবং মৈনপুরে বিদ্রোহীদের পরাজয় যথাক্রমে কর্ণেল সিটন এবং মেজর হডসনের কাছে; এবং অন্যান্য অনেক স্থানে।

১৮৫৮, ২৭শে জানুয়ারী ডৌস ইত্যাদির পরিচালনায় দিল্লীর বাদশার কোর্ট-মার্শাল, "অপরাধী" (১৫২৬-এ প্রতিষ্ঠিত মোঘল রাজবংশের প্রতিনিধি!) হিসাবে প্রাণদণ্ড। রেঙ্গুনে আজীবন কারাবাসে এ দণ্ডের লাঘব। বছরের শেষে তা করা হয়।

১৮৫৮-এ স্যার কলিন ক্যামবেলের অভিযান। ২রা জানুয়ারী ফারাক্কাবাদ এবং ফতেগড় জয় করে তিনি কানপুরে আস্তানা গাড়লেন এবং চারিদিক থেকে যাতে সেখানে সৈন্য রসদ ও কামান যা আছে পাঠানো হয় তার আদেশ দিলেন। বিদ্রোহীরা লক্ষ্ণৌর কাছাকাছি দল বেঁধে জমায়েৎ হল, তাদের ঠেকিয়ে রাখেন স্যার জেমস উট্র্যাম। -অন্যান্য অনেক ঘটনার পর ১৫ই মার্চ লক্ষ্ণৌ পুনরায় অধিকৃত (কলিন ক্যামবেল, স্যার জেমস উট্র্যাম ইত্যাদির পরিচালনায়); শহর লুণ্ঠিত, এখানে প্রাচ্য শিল্পকলার বহুমূল্য বস্তুর আগার ছিল; ২১শে মার্চ যুদ্ধ শেষ; ২৩শে মার্চ শেষ কামান ছোঁড়া হয়।-দিল্লীর সাহের পুত্র শাহযাদা ফিরোজ, বিথুরের নানাসাহেব, ফৈজাবাদের মৌলভী এবং অযোধ্যার বেগম হজরৎ মহলের নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের বেরিলিতে পলায়ন।

১৮৫৮, ২৫শে এপ্রিল শাহজাহানপুর দখল করেন ক্যামবেল; বেরিলির কাছে বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিহত করলেন মগ্‌স্; ৬ই মে অবরোধের কামান ছোঁড়া শুরু হল বেরিলির উপর। এদিকে মোরাদাবাদ অধিকার করার পর জেনারেল জোনস কথা মতো এসে পৌছলেন, নানা এবং তাঁর অনুচরদের পলায়ন, বিনা বাধায় বেরিলি দখল। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীগণ কর্তৃক নিবিড়ভাবে অবরুদ্ধ শাহজাহানপুরকে উদ্ধার করলেন জেনারেল জোনস; লক্ষ্ণৌ থেকে আগত লুগার্ডের ডিভিসন কানোয়ার সিংহের অধীনে বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ভীষণভাবে পরাজিত হল; কিছুদিন পর ফৈজাবাদের মৌলভী নিহত, এর আগে স্যার হোপ গ্রান্ট পরাজিত করেন বেগমকে, তিনি নূতন দল গড়ার জন্য পালিয়ে যান গোগরা নদীতে।

১৮৫৮, জুনের মাঝামাঝি সর্বত্র বিদ্রোহীদের পরাজয়; সম্মিলিত সংগ্রামে অসমর্থ, লুঠেরা দলে ভেঙে গিয়ে এরা ইংরাজদের বিচ্ছিন্ন নানা দলকে অত্যন্ত চাপ দিতে লাগল। এদের কার্যকলাপের কেন্দ্রঃ বেগম, দিল্লীর শাহযাদা ও

www.pathagar.com

নানাসাহেবের পতাকার নীচে। মধ্য ভারতে দু'মাস ব্যাপী (মে এবং জুন) অভিযানে স্যার হিউ রোজ বিদ্রোহীদের শেষ আঘাত দেন।

১৮৫৮, জানুয়ারী রথগড় দখল করেন রোজ, ফেব্রুয়ারীতে সাগর এবং গাররাকোটা, তারপর অভিযান করেন ঝাঁসিতে, সেখানে রাণী (লক্ষ্মীবাঈ) প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

১৮৫৮, ১লা এপ্রিল ঝাঁসি রক্ষার জন্য কল্পি থেকে আগত নানাসাহেবের খুল্লতাত ভ্রাতা তাঁতিয়াটোপীর বিরুদ্ধে ঘোর সংগ্রাম; তাঁতিয়ার পরাজয়।

৪ঠা এপ্রিল ঝাঁসি দখল; রাণী এবং তাঁতিয়াটোপী সেখান থেকে সরে গিয়ে কল্পিতে ইংরেজদের প্রতীক্ষায় রইলেন।

১৮৫৮, ৭ই মে কানিয়া শহরে শত্রুপক্ষের একটি জোরালো দল কর্তৃক রোজ আক্রান্ত; দলটির সম্পূর্ণ পরাজয়।

১৮৫৮, ১৩ই মে কল্পির কয়েক মাইলের মধ্যে এসে পড়লেন রোজ; বিদ্রোহীদের কঠিনভাবে অবরোধ করলেন।

১৮৫৮, ২২শে মে কল্পি থেকে মরিয়া হয়ে বেরিয়ে এসে ছোটখাটো আক্রমণ করল বিদ্রোহীরা; পরাজিত হয়ে পলায়ন!

১৮৫৮, ২৩শে মে কল্পি অধিকার করলেন রোজ। যুদ্ধে এবং গরমে শ্রান্তক্লান্ত সৈন্যদের জিরিয়ে নিতে দেবার জন্য সেখানে কয়েকদিন থেকে গেলেন তিনি। ২রা জুন নবীন সিন্ধিয়া (ইংরাজদের পোষা কুকুর) কঠিন লড়াইয়ের পর নিজের সৈন্যদল কর্তৃক গোয়ালিয়র থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রাণ ভয়ে পালালেন আগ্রায়; গোয়ালিয়র যাত্রা করলেন রোজ, বিদ্রোহীদের পরিচালনা করে ঝাঁসির রাণী এবং তাঁতিয়াটোপী তাঁর সঙ্গে–

১৯শে জুন লড়াই করলেন লস্কর পাহাড়ে (গোয়ালিয়রের সামনে) ঃ রাণী নিহত, ঘোর লড়াইয়ের পর তাঁর সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ, গোয়ালিয়র ইংরাজদের হাতে।

১৮৫৮ জুলাই, আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর স্যার কলিন ক্যামবেল, স্যার হোপ গ্রান্ট এবং জেনারেল ওয়ালপোল বিদ্রোহীদের পাণ্ডাদের খুঁজে পেতে তাড়া করার এবং যে সব দুর্গের মালিকানা নিয়ে বিরোধ আছে সেগুলি দখল করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন; বেগম কয়েকবার শেষ প্রতিরোধের জন্য দাঁড়ান, তারপর নানাসাহেবের সঙ্গে রাপ্তি নদী পার হয়ে ইংরাজদের পোষা কুকুর নেপালের জঙ্গ বাহাদুরের এলাকায় পালিয়ে গেলেন; নিজের এলাকায় বিদ্রোহীদের পিছু ধাওয়ার অনুমতি তিনি ইংরাজদের দেন, এভাবে "শেষ বম্বেটে দলগুলি ছত্রভঙ্গ হল"; নানা এবং

www.pathagar.com

বেগম পালিয়ে গেলেন পাহাড়ে, তাঁদের অনুচররা অস্ত্র সমর্পণ করল।

১৮৫৯–র গোড়ার দিক, তাঁতিয়াটোপীর লুক্কায়ন স্থল ধরা পড়ে গেল। তাঁর বিচার এবং প্রাণদণ্ড।–লোকে বলে নানাসাহেবের মৃত্যু ঘটে নেপালে। বেরিলির খাঁ ধৃত, গুলি করে মারা হল তাঁকে, লক্ষ্ণৌর মামু খাঁর আজীবন কারাবাস; অন্যরা নির্বাসিত বা বন্দী হল বিভিন্ন মেয়াদে, বিদ্রোহীদের মূলভাগ– তাদের রেজিমেন্ট ভেঙ্গে দেওয়া হয়– অস্ত্র ত্যাগ করে রায়ত হয়ে গেল। অযোধ্যার বেগম নেপালে কাঠমুণ্ডুতে বাস করতে লাগলেন।

অযোধ্যাভূমি বাজেয়াপ্ত, ক্যানিং ঘোষণা করলেন এটা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সরকারের সম্পত্তি! স্যার জেমস উট্র্যামের জায়গায় স্যার রবার্ট মন্টোগোমারিকে অযোধ্যার চিফ কমিশনার করা হল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবলোপ। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই এটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

১৮৫৭, ডিসেম্বর, পামারষ্টোনের ভারত বিল, ১৮৫৮ ফেব্রুয়ারীতে ডিরেক্টরদের বোর্ডের সবিশেষ প্রতিবাদ সত্ত্বেও প্রথম পাঠ অনুমোদিত, কিন্তু লিবারেল মন্ত্রিসভার জায়গায় এল টোরিরা।

১৮৫৮, ১৯শে ফেব্রুয়ারী ডিজরেলির ভারত বিল পাস, এতে করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবসান ঘটল। "মহারাণী" ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হল ভারত!

(কার্ল মার্কস কর্তৃক১৮৭০–এর দশকে লিখিত)

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

১. Selections from the Writings of Harish Chandra Mukherjee. edited by Naresh Chandra Sengupta

২. A History of the Sepoy War in India. 3. vols. by Sir John William Kaye

৩. History of the Indian Mutiny. 3 vols. by G. W. Forrest

৪. History of the Indian Mutiny. 3 vols. by Col. G. B. Malleson

৫. Reminiscences of the Great Mutiny. by Forbes-Mitchell

৬. সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ৫ খণ্ড, রজনীকান্ত গুপ্ত

৭. প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা-যুদ্ধ ১৮৫৭-১৮৫৯, কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

৮. মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭- প্রমোদ সেনগুপ্ত

৯. ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার রচিত দ্য ইণ্ডিয়ান মুসলমানস- অনুবাদ ঃ আবদুল মওদুদ

১০. মুক্তির সন্ধানে ভারত -যোগেশ চন্দ্র বাগল

১১. History of the Indian Mutiny. 3 Vols. by Charles Ball

১২. Selections from the letters. despatches and other State Papers. 1857-1858. Edited by G. W. Forrest

১৩. Indian Empire. 3 Vols. by Montgomery Martin

১৪. Two Native Narratives of the Mutiny at Delhi. Edited by Sir T. Metcalfe

১৫ Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 by Dr. Ramesh Chandra Majumder

www.pathagar.com

আমার 'জীবন-কথা'র কিছু কথা

আসকার ইবনে শাইখ

।দশ।

উনিশ শ' পঞ্চান্ন সাল থেকে আরম্ভ এই চতুর্থ খণ্ড রচনাবলীর কাল। এর মধ্যে আমার সংসার-জীবনের চাপ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে টাকা পাই, তাতে ঢাকার সংসার-খরচ চলে যায়। চলে যায় এজন্য যে, আমাদের জীবনধারায় অকারণে নাগরিক জীবনের বড়মানুষি প্রকাশের কোন দুর্বলতা কখনই দেখা দেয় নি। তবুও চাপ বৃদ্ধির কারণ- নিজ সংসারের কলেবর বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করেছে এবং তার সঙ্গে গ্রামের বাড়ীতে 'অভাব নিরসনে' আমাদের কর্তব্যের পরিধিটাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার অর্থ, দু'টি সংসারই আমাদের চালাতে হচ্ছে- একটি ঢাকায়, অন্যটি গ্রামে। একাজে আমার 'তিনি'ও রীতিমত প্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছেন। তাই চাপটা কষ্টকর হয়েই উঠেছে এর মধ্যে। কষ্ট লাঘবের একমাত্র উপায় স্বনামে বা অন্যের নামে ফরমায়েসী লেখার মাধ্যমে কিছুটা বাড়তি উপার্জনের চেষ্টা করা। তা-ই করছি কিছু কিছু।

তদুপরি, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কাজে আরও মনোযোগী হতে হচ্ছে স্বাভাবিক কারণেই। এম.এসসি-তে আমার সতীর্থ ছিলেন যারা, তারা সবাই উন্নতির পথে অনেক এগিয়ে গেছেন এরই মধ্যে। এমন কি, অধ্যাপনারম্ভের প্রথম দিকের ছাত্রদের কেউ কেউ বিদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে এসে গেছেন বা আসছেন। এমনি অবস্থায় অধ্যাপনার চাকরীতে আমার উন্নতির প্রশ্নটাও মনে জাগা স্বাভাবিক। বুঝতে পারি, সে-উন্নতির জন্য শুধুমাত্র সিনিয়রিটিই যথেষ্ট নয়, গবেষণা কৃতিত্বেরও প্রয়োজন আছে এবং সেটাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা দিকে মনটা ঘুরঘুর করতে চাইলেও গবেষণার অঙ্গনেও মনোনিবেশ করতেই হচ্ছে।

তমদ্দুন মজলিসের কর্মকাণ্ডে যে ভাটার টান এর মধ্যে ভাল করেই ধরেছে, তা তো আগেই বলেছি। সেখানকার সহকর্মীরা এখন শুধুই পরিচিত সুজন মাত্র। দেখা হলে সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা হয়- এ পর্যন্তই। অর্থাৎ আমাদের সবারই এখন পৃথক অস্তিত্ব ও অবস্থান কোন আদর্শের ছোঁয়া-লাগা মনে এমনি অবস্থায় সাধারণত শূন্যতাই এসে ভর করে। আমার বেলায়ও হল তা-ই। প্রগতিশীল ইসলামী বিপ্লবের কথা আগে যা শুনতাম, এখন তা মাঝে মধ্যে শুনলেও তাতে খুব একটা উৎসাহ বোধ করি না। ও-জাতীয় বিপ্লবের জন্য অনুসরণীয় যোগ্য লোকের প্রকট অভাবই দেখা দিল আমার বিবেচনায়। হতে পারে, সেটা আমার বিবেচনার সীমাবদ্ধতার কারণেই! কিন্তু সীমাবদ্ধ হলেও তা-ই ছিল আমার বিবেচনা। বিবেচনাটা একান্তভাবে আমারই, এবং সেই সূত্রে আমার মানসিক অবস্থাটা ছিল এক রকম মোহমুক্তির অবস্থা।

এ হেন অবস্থায় অন্য কোন আদর্শের মোহে জড়াতে চাইলেও নানা বিচার-বিবেচনা

www.pathagar.com

ও যাথার্থের প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়, সহজে মোহটা জমে উঠতে চায় না। আমার বেলায় তা জমে উঠলও না। ক্রমে অবস্থাটা এমন হয়ে দাঁড়াল যে, আমাদের এদেশীয় মুসলমান সমাজ তথা ভারতীয় ও অন্যান্য মুসলমান সমাজের শ্রুতিমূলক দুর্দশার কথা ও তার কারণের প্রতি আমার মনোযোগ বেশি করে আকৃষ্ট হতে লাগল। কারণ হিসাবে এতদিন যা জানতাম, তা ছিল নিতান্তই ভাসা-ভাসা। এবার তা বিশেষভাবে জানার আগ্রহ আমার মনে জন্মাতে লাগল। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে আমার যাতায়াত গেল বেড়ে। আর এ ব্যাপারে মজার ব্যাপার এই যে, একবার কিছুটা জানলে আরও জানার আগ্রহটা ক্রমবৃদ্ধিমান হয়। একটা পণ্ডিতী বা কেতাবী স্বভাবের বিকাশ ঘটতে থাকে।

ওই সময়টায় প্রায় বছর দু'য়েক নাটক রচনায় মনোনিবেশ করা আমার পক্ষে তেমন একটা সম্ভব হয় নি। উনিশ শ' সাতান্ন সালও এগিয়ে আসছে। আঠার শ' সাতান্ন সালের পর এক শ' বছর শেষ হতে যাচ্ছে। দেশে পালিত হতে যাচ্ছে তারই শতবার্ষিকী। তাই এর মধ্যে আঠার শ' সাতান্ন-আটান্নর সিপাহীদের মহা অভ্যুত্থান-কথা সাধ্যমত জানার চেষ্টা করলাম। তারই ফলে রচিত হল মঞ্চনাটক 'রক্তপদ্ম', 'অনেক তারার হাতছানি', ওই অভ্যুত্থানভিত্তিক কয়েকটি বেতার নাটক (যার কপি এখন আর কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না) এবং চৌদ্দটি সত্য ঘটনামূলক গল্প। ওই গল্পগুলিই পরে 'কালো রাত তারার ফুল' শিরোনামের গল্পগ্রন্থে সঙ্কলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

এমনিতে সেই সাতান্ন-আটান্নর সিপাহী অভ্যুত্থানের কথা আমার জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, সেই অভ্যুত্থান-কথা ও কথাকারদের মনোভাবের সঙ্গে আমার ওই সময়কার জিজ্ঞাসামূলক চিন্তাধারার যথেষ্ট সম্পর্ক ছিল বলেই আমার জীবন-কথার কিছু কথা তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। তাই এখানে তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরে তদনুসারে আমার চিন্তাধারা সম্পর্কেও কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

আঠার শ' সাতান্ন-আটান্নর সিপাহী অভ্যুত্থানের উপর অনেক তথ্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সেই সিপাহী-যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যসমৃদ্ধ প্রায় সকল ইতিহাসই রচনা করেছেন ইউরোপীয়রা। ভারতীয় লেখকদের গ্রন্থগুলি উপরোক্ত গ্রন্থাবলী ও দলিলাদির উপর নির্ভর করে বিশ্লেষণী ধারায় রচিত। ভারতীয় গ্রন্থগুলি মোটামুটিভাবে দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের গ্রন্থকারগণ বিদেশী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-শক্তিকে আগ্রাসী শক্তি হিসাবে গণ্য করে তার বিরুদ্ধে সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান-কথা তাঁদের গ্রন্থে বিবৃত করেছেন, আর অন্য ভাগের গ্রন্থকারগণ অবস্থান গ্রহণ করেছেন এর বিপরীতে। এই বিপরীত অবস্থান গ্রহণকারীদের নেতৃত্বে রয়েছেন স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার। এবং প্রথমোক্ত গ্রন্থকারদের মধ্যে, আমার মতে, প্রমোদ সেনগুপ্তের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর রচিত History of the Freedom Move-

www.pathagar.com

ment in India, Vol.1-এ সিপাহী-যুদ্ধ সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন, তা প্রমোদ সেনগুপ্তের কথায়, ১৩৬১ সালের আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যের অনুরূপ। 'প্রবাসী' সম্পাদকের মতেঃ (ক) ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ জাতীয় অভ্যুত্থান নয়, সিপাহীদেরই একটা বিদ্রোহ মাত্র; (খ) এটা মরণোন্মুখ বাদশাহীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টামাত্র; (গ) কোনরূপ প্রগতি-চেতনাশূন্য এটা একটা মধ্যযুগীয় বর্বরতার অন্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়; (ঘ) এই বিদ্রোহের সঙ্গে জনসাধারণের কোনো যোগাযোগ ছিল না।

প্রমোদ সেনগুপ্ত তাঁর রচিত 'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭' গ্রন্থে এজাতীয় সকল মন্তব্যের যুক্তিগুলো খণ্ডন করেছেন যথাযথভাবে। শ্রী সেনগুপ্ত তার জন্য প্রয়োজনীয় বহু উদ্ধৃতি দিয়েছেন বিভিন্ন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক কে', ফরেষ্ট, ম্যালিসন, বল্ প্রমুখ এবং ১৮৫৭ সালের উপর অন্যান্য লেখকের রচিত গ্রন্থরাজির 'প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উল্লেখিত' তথ্যভাণ্ডার থেকে। এসব তথ্যের সাহায্যে শ্রী সেনগুপ্ত প্রমাণ করেছেন যেঃ সাতান্নর বিদ্রোহ ছিল এক জাতীয় অভ্যুত্থান, শুধুমাত্র সিপাহীদের বিদ্রোহ নয়; এটা মুঘলশাহীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা ছিল না; প্রগতি-চেতনাপুষ্ট অভ্যুত্থানকারীদের নির্মমতা ছিল ইংরেজদের নির্মমতার চাইতে অনেক কম; এবং এই বিদ্রোহের সঙ্গে শুধুমাত্র জনসাধারণের সঙ্গে নয়, সম্ভ্রান্ত অনেক রাজপুরুষেরও সংযোগ ছিল।

"মিরাট ও বেরিলি ডিভিশনের কতকগুলি জেলাতে সিপাহীদের বিদ্রোহের ভয় থেকে জনসাধারণের বিদ্রোহের ভয়ই ছিল বেশী। প্রথম বিপদ এসেছিল বিক্ষুব্ধ সম্প্রদায়গুলি থেকে; সিপাহীরা তখনও বিশ্বস্তই ছিল।... সাহারানপুর, মুজাফ্ফরনগর, মোরাদাবাদ ও বুদায়নে তা বিশেষভাবে ঘটেছিল।... বেসামরিক শ্রেণীদের দ্বারা এই উদাহরণ স্থাপিত হবার পর সিপাহীরা তাতে যোগ দিয়েছিল।...জমিদারেরা নীচ শ্রেণীর সঙ্গে একত্র হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহ, কেবলমাত্র লুণ্ঠনই নয়, বেশীর ভাগ লোককে উদ্বুদ্ধ করেছিল।"

(কে'ঃ হিস্ট্রি অব দ্য সিপয় মিউটিনি, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৬-৫০)

'দি ইণ্ডিয়ান রেবেলিয়ান' গ্রন্থে ডক্টর এ. ডাফ লিখেছেনঃ "যখনই শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে, তখনই তাদের পরাজিত করে দেওয়া হচ্ছে ও তাদের কামানগুলি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বারবার পরাজয় সত্ত্বেও তারা আবার জমায়েত হচ্ছে ও পুনরায় যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে। একটা শহর দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা শহরে বিপদ ঘনিয়ে আসছে।-একটা জেলায় ইংরেজ সৈন্যরা যেই এসে শান্তি স্থাপন করছে, তখনই আর একটা জেলায় অশান্তি ছড়িয়ে পড়ছে। যেই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গমনাগমনের জন্য একটা বড় রাস্তা মুক্ত করা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তা আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং এক বৎসরের জন্য তাতে গমনাগমন বন্ধ থাকছে। একটা অঞ্চল থেকে বিদ্রোহীদের উৎখাত করা মাত্রই দ্বিগুণ তিনগুণ শক্তি নিয়ে তারা আর একটা অঞ্চলে গিয়ে হাজির হচ্ছে। যে মুহূর্তে একটি দ্রুতগামী বাহিনী শত্রুদের ভেদ করে চলে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে তারা

www.pathagar.com

পশ্চাৎভাগ দখল করে বসছে। শত্রু বাহিনীর সংখ্যা হ্রাসের ক্ষতি মুহূর্তের মধ্যে পূরণ হয়ে যাচ্ছে।" (পৃঃ ২২৩)

এমনি আরও অনেক প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিকের বক্তব্য উদ্ধৃত করে প্রমোদ সেনগুপ্ত সিদ্ধান্তমূলক মন্তব্য করছেনঃ "এই মহাবিদ্রোহের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তখন ভারতে কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। শিক্ষিতদের মধ্যে যাঁরা রাজনীতির চর্চা করতেন, তাঁরা সশস্ত্র বিদ্রোহের কথা চিন্তাও করতে পারতেন না। তাঁদের রাজনীতি ছিল মুষ্টিমেয় ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একমাত্র সিপাহীরাই ছিল তখন ভারতব্যাপী একটা সুসংগঠিত শক্তি এবং তারাই অধিকাংশ স্থলে বিদ্রোহে অগ্রণী হয়ে এসেছিল। ভারতের সাধারণ মানুষের একটা বিরাট অংশ তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।– লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ এই বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল বলেই এবং আরও লক্ষ লক্ষ মানুষের এই বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতি ছিল বলেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও এই বিদ্রোহ দমন করতে ইংরেজের দু'বৎসর সময় লেগেছিল।– ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ যে জাতীয় বিদ্রোহ ছিল না, তা প্রমাণ করার জন্য ডঃ মজুমদারের প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই যে, এই বিদ্রোহ কেবলমাত্র অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড এবং পশ্চিম–বিহার ও বুন্দেলখণ্ডের কোনো কোনো অংশে সীমাবদ্ধ ছিল; ভারতের বড় অংশটাই এতে যোগ দেয় নি।– এইসব বিবেচনা করে, এমন কি অযোধ্যার ও পশ্চিম–বিহারের বিদ্রোহকেও প্রকৃত অর্থে গণবিদ্রোহ কিম্বা জাতীয় বিদ্রোহ বলা কঠিন। (এখানে উল্লেখ্য যে, ডক্টর মজুমদারের মতে বাংলার ও ভারতের 'অগ্নিযুগের' বৈপ্লবিক আন্দোলনই ছিল ভারতের প্রথম জাতীয় আন্দোলন– বর্তমান লেখক)। – এই 'প্রকৃত অর্থ' কথাটা বারংবার ব্যবহার করলেও এই বস্তুটি কি, তা ডঃ মজুমদার কোথায়ও ব্যাখ্যা করেন নি। যাই হোক, এইরূপ 'প্রকৃত অর্থে' ১৬৪৮ সালের ইংল্যাণ্ডের বিপ্লব, ১৭৫৭–৮৩ সালের আমেরিকান বিপ্লব, ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব, ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালের ইউরোপের বিপ্লব, ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব এবং সর্বশেষে, বর্তমানের চীন, ইন্দোচীন প্রভৃতির বিপ্লবগুলিকেও 'জাতীয়' বলা যায় না; কারণ, এইসব দেশের সর্বশ্রেণীর সব লোকই এইসব বিদ্রোহগুলিতে যোগ দেয় নি। আমেরিকান বিপ্লবের সময় অনেক আমেরিকান ইংল্যাণ্ডের দিকে ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল; তা ছাড়া সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রই বিদ্রোহে যোগ দেয় নি। ফরাসী ও রুশ বিপ্লবের সময় ঐ দেশগুলির সব অংশই বিদ্রোহে যোগ দেয় নি; প্রচুর সংখ্যক ফরাসী ও রুশ বিদেশী আক্রমণকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজেদের মাতৃভূমির বিরুদ্ধে লড়েছিল। ডঃ মজুমদারের 'প্রকৃত অর্থে' বাংলার ও ভারতের অগ্নিযুগের বৈপ্লবিক আন্দোলনকেও জাতীয় আন্দোলন বলা যায় না, তার কারণ বিপ্লবীদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য, সমগ্র দেশের লোক তাতে যোগ দেয় নি এবং অনেক ভারতীয় পুলিস অফিসার, গোয়েন্দা , রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর ইংরেজদেরই সাহায্য করেছিল। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনকেও 'জাতীয়' বলা যায় না, কারণ তা মাত্র কয়েকটি অঞ্চলেই প্রকাশ পেয়েছিল– ভারতের অনেক বড় বড় অঞ্চলে তা বিশেষ

www.pathagar.com

বিস্তার লাভ করে নি; রাজা, মহারাজা, জমিদাররা তার বিরুদ্ধে ছিলেন; ভারতের ৩৫ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ৮০,০০০ লোক কারাবরণ করেছিলেন এবং তার চাইতে বেশী সংখ্যক লোক ইংরেজের পক্ষেই ছিল।–

দিল্লীর যুদ্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, কি ভাবে সিপাহীদের 'মিলিটারী কোর্ট' গণতান্ত্রিক উপায়ে বিভিন্ন কমিটির মারফত সিপাহীদের ক্ষমতা বিস্তার করছিল এবং কি ভাবে বাদশাহের সামন্ততান্ত্রিক দরবারের সঙ্গে তাদের দিনের পর দিন সংঘর্ষ বাধছিল এবং সর্বশেষে আমরা এ–ও দেখেছি, কি ভাবে এই অন্তর্দ্বন্দ্বে সিপাহীদেরই জয় হয়েছিল। দিল্লীতে যে গণতান্ত্রিক চেতনার ক্রমবিকাশ ও তদনুসারে কার্যাবলীর ক্রমপরিণতি দেখা গিয়েছিল, অন্যান্য স্থানেও সেই একই ধরণের ক্রমবিকাশ লক্ষিত হচ্ছিল। দিল্লীর মতো লক্ষ্ণৌতেও অনুরূপ 'মিলিটারী কোর্ট' স্থাপিত হয়েছিল এবং সেখানকার কার্যধারা দিল্লীর মতোই গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ঝান্সীতে 'মিলিটারী কোর্ট' স্থাপিত না হলেও, নানা প্রকারের গণতান্ত্রিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। গ্রামাঞ্চলেও তালুকদার ও জমিদাররা তাঁদের একাধিপত্য স্থাপন করতে পারে নি। বিদ্রোহী কৃষকদের পঞ্চায়েতগুলি ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। কয়েকটি ক্ষেত্রে অযোধ্যায় এমনও দেখা গিয়েছে যে, সিপাহীদের এইরূপ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে জমিদাররা প্রথম সুযোগেই ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল।–

দিল্লীতে আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে, বিদ্রোহীরা এবং জনসাধারণ ক্রমশঃ এক প্রকারের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। ১৮৫৭ সালে যদিও মোগল বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্‌কে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, তবু বিদ্রোহী সিপাহী ও জনসাধারণের গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রধান প্রস্তাব (Chief premise) হল এই যে, সমস্ত রাষ্ট্র–ক্ষমতার উৎস ছিল সিপাহী ও জনসাধারণ। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের ও সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার মেরুদণ্ড হল 'ভগবান প্রদত্ত ক্ষমতা' (Divine rights of Kings)। এটাই ছিল সর্বত্র– ইউরোপ, এশিয়া ও মোগলদেরও স্বৈরাচারের ভিত্তি। ১৮৫৭ সালে স্বৈরাচারের এই ভিত্তি আর রইল না– বাদশাহ্ হলেন জনসাধারণের অনুগত এবং জনসাধারণের দ্বারা বিশেষ এক বৈপ্লবিক পরিবেশে নির্বাচিত বা সমর্থিত। সুতরাং তিনি হলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজা। নির্বাসিত ওয়াজেদ আলির নাবালক পুত্র বিরজিস কাদেরকেও এইভাবেই অযোধ্যার নবাব নির্বাচিত করা হয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষিত নব্য বুদ্ধিজীবীদের মতো বার্ক, মিল, লক, মেকলে না কণ্ঠস্থ করেও যে সিপাহী ও জনসাধারণ নিজেদের বুদ্ধি ও চেতনার বলে এতখানি অগ্রসর হতে পেরেছিল, এটা কম প্রশংসনীয় কথা নয়। তৎকালীন ভারতের যে সামাজিক অবস্থা ছিল, তাতে এর বেশী অগ্রসর হওয়া বিদ্রোহীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।–(ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭, প্রমোদ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৩৪৪–৩৫২)

সিপাহী–যুদ্ধ সম্পর্কে মতামতের এই যে সুস্পষ্ট ভিন্নতা, তার কারণ আমার মতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে নিহিত। এখানে বলে নেয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ডক্টর

www.pathagar.com

মজুমদার ভারতের কংগ্রেস সরকারের পৃষ্ঠপোষণায় তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন, আর শ্রী সেনগুপ্ত তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন প্রগতিশীল চিন্তাধারার তাগিদে। দু'য়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাই এ সুস্পষ্ট ভিন্নতা। শ্রী সেনগুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিই রয়েছে আমার সমর্থন।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে দৃষ্টিভঙ্গির এই ভিন্নতার উৎস সন্ধান করতে চাইলে অন্ততপক্ষে পলাশী বিপর্যয় থেকে আরম্ভ করতে হবে। পলাশী বিপর্যয়ে এদেশে মুসলিম শক্তির ধ্বংস সাধনের যে সূচনা, তার পেছনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে প্রধানতম সহযোগী শক্তি হিসাবে বিশেষভাবে কার্যকর ছিল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন এদেশীয় ক্ষমতাশালী হিন্দু-প্রধানেরা। বলা যায়, এক 'শিবাজী-স্বপ্ন' সেসব প্রধানগণকে একাজে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ করেছিল। তার ফলে সুসম্পন্ন হল পলাশীর বিপর্যয়।

মুঘলশাহী ধ্বংস করে ভারতে পেশোয়াশাহী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মারাঠা-নায়ক শিবাজী যে যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ করেছিলেন, সে-সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচিত 'পলাশির যুদ্ধ' গ্রন্থে বলেন ঃ "শিবাজি যখন লেগে-প'ড়ে আস্তে-আস্তে এক রাজ্য গ'ড়ে তুলছিলেন তখন হিন্দুস্থানের সব হিন্দুই পরম আগ্রহে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন।" (পৃঃ ৮০)। আমি এটাকে হিন্দুদের 'শিবাজী-স্বপ্ন' বলে অভিহিত করছি। 'পলাশির যুদ্ধ' বর্ণনা করতে গিয়ে পলাশী-ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে শ্রী চট্টোপাধ্যায় আবার বলেন ঃ "ষড়যন্ত্রটা আসলে হিন্দুদেরই ষড়যন্ত্র।" (পৃঃ ১৫৮)। তাই, আমার মতে, পলাশী-বিপর্যয়ের পেছনে কার্যকর উপাদানের মধ্যে 'শিবাজী-স্বপ্ন' ছিল অন্যতম।

এই বিপর্যয়ের পর মুসলিম শক্তি আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি। তবুও প্রতিরোধ সংগ্রামের অভাব দেখা দেয় নি এদেশে। মুসলমান সমাজের মধ্য থেকে আগ্রাসী বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক প্রতিরোধ-সংগ্রাম চলতেই থাকে। নবাব মীর কাশিমের পতনের পর মজনু শা'র 'ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' থেকে আরম্ভ করে তিতুমীরের 'ওয়াহাবী বিদ্রোহ' এবং হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র 'ফরাজী বিদ্রোহ' ও 'নীল বিদ্রোহ' প্রভৃতি বেশ ক'টি আঞ্চলিক বিদ্রোহই তার প্রমাণ। এসব বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর এল ১৮৫৭ সালের 'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ'। তা-ও ব্যর্থ হল।

পলাশীর পর থেকে 'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ' পর্যন্ত সব ক'টি সংগ্রামেই কোম্পানীর অনুগ্রহপ্রাপ্ত এদেশীয় সুবিধাভোগীরা ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-শক্তির সপক্ষে। ধারণা করা চলে, সেই 'শিবাজী-স্বপ্নের' পরবর্তী ধারকেরাই যথাকালে তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের আশায় বিদেশী আগ্রাসী শক্তিকেই আপাত-সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল। চড়াই-উতরাইয়ের পথে নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে অবশেষে ভারতীয় কংগ্রেস ১৯৪৭ সালে খণ্ডিত ভারতে স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা করল। এবং মহাবিদ্রোহের পরবর্তীতে কংগ্রেসেরই মত ইংরেজ-সহযোগিতার পরিণামে ভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করল

www.pathagar.com

পাকিস্তান সরকার। ভারতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা-স্বপ্নের সঙ্গে কি সেই 'শিবাজী-স্বপ্নের' কোন সম্পর্কই নেই? আমাদের তো মনে হয়— আছে। এবং তারই জন্যে ভারতীয় কংগ্রেস সরকারের পৃষ্ঠপোষণায় রচিত গ্রন্থে 'শিবাজী-স্বপ্নের' সঙ্গে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন ডক্টর মজুমদার।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকার রচিত 'দি ইণ্ডিয়ান ওয়ার অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' গ্রন্থটির কথা। ১৯০৮ সালে রচিত তাঁর এ-গ্রন্থটি প্রথমে গোপনে ছাপা হয় হল্যাণ্ড ও প্যারিসে, পরে ভারতে ছাপা হয় ১৯৪৭ সালে। তিনিই প্রথম ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' না বলে তাকে ভারতের 'স্বাধীনতা যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু তিনি মারাঠা-প্রধান নানাসাহেবকে এই মহাবিদ্রোহের নায়করূপে চিত্রিত করে পেশোয়াশাহী পুনঃপ্রতিষ্ঠার রূপকার হিসাবে তুলে ধরেন। সুধী সমাজে এই মতামতটা গৃহীত না হলেও শিবাজী-স্বপ্নের প্রবহমানতার সত্য এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ডক্টর মজুমদার সাভারকারের মত ভুল না করে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রাপ্য সম্মান কাউকেই না দিয়ে সেই জাতীয় এক সম্মান বয়ে নিয়ে এসেছেন বিশ শতকে বাংলা ও ভারতের অগ্নিযুগের বৈপ্লবিক সংগ্রামীদের জন্য।

অথচ, ওই মহাবিদ্রোহ চলছিল যখন তখন ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট কর্তৃক বিদ্রোহের প্রাথমিক ও আশু কারণসমূহ নির্ণয়ের জন্য নিযুক্ত জেনারেল স্যার রবার্ট গার্ডিনার তার 'মিলিটারী এনালিসিস্ অব দ্য রিমোট এণ্ড প্রক্সিমেট কজেস্ অব দি ইণ্ডিয়ান রেবেলিয়ান' শিরোনামের রিপোর্টে বলেন ঃ "ভারতের এই বিদ্রোহের দুইটি চরিত্র দেখা যায়; প্রথমটির রূপ হল একটা জনসাধারণের বিদ্রোহ, আর দ্বিতীয়টির রূপ হল সিপাহীদের একটা সামরিক বিদ্রোহ।-এই দু'টি বিদ্রোহ মিশে গিয়ে একটা সামাজিক বিদ্রোহে পরিণত হল। সামরিক কারণের জন্যই এই বিদ্রোহ ঘটে নি; ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যই শক্তিশালী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিদের প্ররোচনার ফলেই এই বিদ্রোহ ঘটেছিল।-সারা ভারতবর্ষে নিপীড়িত পরাধীনতার সর্বব্যাপী একটা অনুভূতি জেগে ওঠার জন্যে সাধারণভাবে সকলেই আমাদের উচ্ছেদ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়েছিল; এবং অন্ধ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে প্রচণ্ডভাবে এই সম্মিলিত সামাজিক ও সামরিক বিদ্রোহ বজ্রাঘাতের মতো আমাদের উপর পতিত হল।" (উদ্ধৃত— প্রমোদ সেনগুপ্ত ... ইত্যাদি, পৃঃ২৫-২৬)।

এসব তথ্য, মতামত ও রায় থেকে যে প্রশ্নটি আমার মনে জেগেছিল, তা হচ্ছে— এই মহাবিদ্রোহের পেছনে জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ অনুভূতি এবং তজ্জনিত কারণে ভারত থেকে ইংরেজ বিতাড়নের এ বিপদসঙ্কুল কাজে কারা জনসাধারণ ও সিপাহীদেরকে প্ররোচনা দিয়েছিল? এ প্রসঙ্গে চরম উপনিবেশবাদী জেনারেল স্যার জেম্‌স্ আউটরাম বলেছেন যে, 'এই বিদ্রোহ ঘটেছিল মুসলমানদের চক্রান্তের ফলে, যারা হিন্দুদের অসন্তোষকে নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিল।' (উদ্ধৃত— প্রমোদ সেনগুপ্ত... ইত্যাদি, পৃঃ ২৪)।

www.pathagar.com

এই মহাবিদ্রোহ শেষে ভারতের শাসনভার সরাসরি বৃটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পরেও ইংরেজ শাসনের প্রতি মুসলমানদের বিরূপতার কারণ ও প্রতিকারের উপায় নির্ণয়ের জন্য সিভিলিয়ান ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়, তার ফলস্বরূপ রচিত হয় তাঁর রিপোর্ট ভিত্তিক গ্রন্থ 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স্'। হান্টার সাহেবের চিহ্নিত কারণসমূহও সাক্ষ্য দেয় যে, জেনারেল আউটরামের মন্তব্য ছিল সঠিক। 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স্'-এ ফুঠে উঠেছে সদ্য রাজ্যহারা ও শাসন বিষয়ে সর্ব অধিকার বঞ্চিত ভারতীয় মুসলমানদের অন্তর্জ্বালা এবং হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে অবিরাম আপোসহীন সংগ্রামের কথা।

ফকীর নেতা মজনু শাহ্‌র 'ফকীর-সন্ন্যাসী' বিদ্রোহের মাধ্যমে অবিরাম আপোষহীন সংগ্রামের যে ধারাবাহিকতার সৃষ্টি, আঠার শ' সাতান্নর 'মহা অভ্যুত্থান'-এ তারই চরম প্রকাশ। এ ধারাবাহিকতার স্বরূপ আবিষ্কার আমার কাছে খুব্ জটিল বলেই মনে হল। মজনু শাহ্-তিতুমীর-শরীয়তুল্লাহ্‌র পরিচয় আমাদের কাছে অনেক স্পষ্ট। আঠার শ' সাতান্নর মহাবিদ্রোহের নায়ক-নায়িকারাও কম পরিচিত নয়। কিন্তু এই মহাবিদ্রোহের দিক-দিশারী অন্যতম নেতা মৌলবী শাহ্ আহ্‌মদুল্লাহ্ সুফী? তিনি তো অনেকাংশেই মুজাদ্দিদ আল্‌ফে সানীর, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহ্‌লভীর, সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর চিন্তার ধারক! আল্লাহ্‌র রাহের ফকীর হযরত মেহ্‌রাব আলি শাহ্‌র ভাবশিষ্য 'ফয়জাবাদের মৌলবী' সম্পর্কে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাও ছিলেন প্রশাংসামুখর।

সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর অযোগ্য বিলাসসর্বস্ব মুঘলশাহীর পতনশীলতার প্রেক্ষাপটে ধ্বসে পড়া ভারতীয় মুসলিম সমাজকে রক্ষার মানসে মুজাদ্দিদ সাহেবের আদর্শানুসারী শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহ্‌লভী যে বিপ্লবী ইসলামী চিন্তাধারার সূচনা করেন, তার মূল বক্তব্য ছিলঃ 'যদি কোন মানগোষ্ঠীর মধ্যে সভ্যতার বিকাশধারা অব্যাহত থাকে তাহলে তাদের শিল্পকলা পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে। তারপরে শাসকগোষ্ঠী যদি ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ এবং ঐশ্বর্যের মোহে আচ্ছন্ন জীবনকেই বেছে নেয়, তাহলে সে আয়েশী জীবনের বোঝা মজদুর শ্রেণীর উপরেই চাপে; ফলে সমাজের অধিকাংশ লোক মানবতাশূন্য পশুর জীবন যাপনে বাধ্য হয়। গোটা সমাজ জীবনের নৈতিক কাঠামো তখনই বিপর্যস্ত হয় যখন তাকে বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে জীবন যাপনে বাধ্য করা হয়। তখন লোককে রুযী-রুটির জন্য ঠিক পশুর মতই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। মানবতার এ চরম নির্যাতন এবং অর্থনৈতিক দুর্যোগের মুহূর্তে এ অভিশাপ থেকে মুক্তি দেবার জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক নিশ্চয়ই কোন পথের নির্দেশ এসে থাকে, অর্থাৎ স্রষ্টা নিজেই বিপ্লবের আয়োজন করেন। জনগণের উপর থেকে বে-আইনী শাসকচক্রের জগদ্দল পাথর অপসারিত করার ব্যবস্থা তিনি করেন।'

হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহ্‌লভীর মৃত্যুর প্রায় শতবর্ষ পরে সংঘটিত 'ভারতীয়

www.pathagar.com

মহাবিদ্রোহে' অনেকাংশে তাঁরই চিন্তার ধারকেরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন— একথা নিঃসন্দেহে সঠিক। তাঁদেরই অন্যতম ছিলেন মৌলবী শাহ্ আহ্‌মদুল্লাহ্ সুফী: আমাদের বিশ্বাসঃ জেনারেল আউটরামের মন্তব্য ও স্যার রবার্ট গার্ডিনারের রিপোর্টে উল্লেখিত বক্তব্য অনুযায়ী 'শক্তিশালী ব্যক্তিদের প্রতিনিধি' এবং ওই মহাবিদ্রোহের 'চক্রান্তকারী' ইসলামী বিপ্লবের এসব স্বপ্নদ্রষ্টারাই শুধুমাত্র মুসলমানদের নয়, 'হিন্দুদের অসন্তোষকে'ও 'নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টা' করেছিলেন। নানা কারণে এ বিপ্লব প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। তাই লিখিত ইতিহাসে তাঁদের স্পষ্ট স্বীকৃতি না থাকারই কথা; কারণ, লিখিত ইতিহাস বরাবরই বিজয়ীদের ইতিহাস, বিজিতদের নয়। কিন্তু বিজয়ীদের লিখিত ইতিহাসেরও এত বিকৃতি কেন?!

যুদ্ধ-বিগ্রহ বিষয়ে চিন্তাভারাক্রান্ত মন নিয়ে 'সোহ্‌রাব-রুস্তম' নামে একটি নাটক লিখেছিলাম ১৯৬০ সালের দিকে, প্রধানত বেতারের জন্য। তখনও আমার মনে ক্রিয়াশীল রয়েছে সাতান্নর সেই বিপ্লব প্রয়াসের কথা। আমার বিশ্বাস তখন দৃঢ়তর হয়েছে এই সত্যে যে শক্তির দাপটে, বরং বলা চলে- স্বার্থবাদীদের চক্রান্তে শক্তির অপব্যবহারে, এই মাটির পৃথিবী বরাবরই নিপীড়িত হয়ে এসেছে। ক্রমে আমার এই প্রতীতি জন্মাল যে, 'সোহ্‌রাব-রুস্তম' কাহিনীর মা তাহ্‌মিনা যেন এই মাটির পৃথিবীরই প্রতীক এক মা। তদনুসারে সে-নাটকেও আনলাম কিছু পরিবর্তন। পরিবর্তিত অবস্থায় নাম দিলাম 'তাহ্‌মিনা'। এবার তা ছাপতে গিয়ে আবারও কিছু কিছু বর্ণনামূলক অংশ সংযোজিত হল। গানগুলির মত 'গল্প শোন' গদ্য কবিতাটিও ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যকার সময়ের রচনা, ছাপা হচ্ছে এই প্রথম।

আমাদের লোক-গীতিকার অন্যতম পালাগান 'আন্ধা বন্ধু' কিছুটা নিজের মত করে 'বাঁশী' নামে লিখেছিলাম ওই সময়েই। তা ছিল মনের চিন্তা-ভার কিছুটা লাঘব করারই এক প্রয়াস! আমার তখন মনে হয়েছিল, এই ধরণীর 'সুসভ্য' নিয়ন্তাদের অন্যায়-অবিচারধর্মী কার্যকলাপ প্রতিরোধে অক্ষম অসহায় জনসাধারণের মানস প্রতিনিধি গ্রাম্য কবিয়ালরা অগত্য বাধ্য হয়েই তাঁদের প্রতিভাকে কল্পরাজ্যে নিয়োজিত করে আসছিলেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চরিত্রলিপি

রুস্তম	ঃ	ইরানের মহাবীর সেনাপতি
গুদুর্য	ঃ	ইরানের অন্যতম সেনাপতি
ধুয়ারা	ঃ	ঐ
ফেরাবুর্য	ঃ	ঐ
পিরানবিসা	ঃ	তুরানের সেনাপতি
হামান	ঃ	তুরানের সেনানায়ক
কায়কাউস	ঃ	ইরানের সম্রাট
সামেঙ্গান-রাজ	ঃ	ইরাক প্রান্তের ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা
তাহ্‌মিনা	ঃ	সামেঙ্গান রাজকন্যা
সোহ্‌রাব	ঃ	রুস্তম-তাহ্‌মিনার পুত্র
রাজপুরুষ	ঃ	সামেঙ্গান রাজ্যের মন্ত্রী
সারিয়া	ঃ	তাহ্‌মিনার সহেলি (সখী)
আফ্রাসিয়াব	ঃ	তুরানের সম্রাট
গুলরুখ	ঃ	আফ্রাসিয়াবের কন্যা
বেহ্‌যাদ	ঃ	গুলরুখের স্বামী
নার্গিস	ঃ	সামেঙ্গানের এক তরুণী

এবং যাদুকর, লোক ও অন্যান্য

www.pathagar.com

।প্রথম পর্ব।

(কাস্পিয় সাগর–তীরে ঘুম থেকে জেগে উঠে রুস্তম বন্ধু–সাথী গুদুর্যকে জাগিয়ে তোলে)

রুস্তম ঃ বন্ধু গুদুর্য! (রুস্তমআশেপাশেতাকায়)

গুদুর্য ঃ (জেগে উঠে) কি, হল কি হে মহাবীর?

রুস্তম ঃ (দূরে অদূরে দেখে নিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে–) আমাদের অশ্ব কোথা গেল?

গুদুর্য ঃ (এদিক-ওদিক দেখে) ঠিকই তো, কোথাও যে দেখছি না!

(কিছু দূরে শব্দ করে গুদুর্যের অশ্ব)

ওই তো আমার অশ্ব!

রুস্তম ঃ (চোখে–মুখে ঔৎসুক্য) কিন্তু রাক্‌শ্‌?

গুদুর্য ঃ (এবার সে বেশ চিন্তিত হয়েই বলে–) তাহলে কি–

রুস্তম ঃ নিশ্চয় চুরি হয়ে গেছে।

গুদুর্য ঃ (কিছুতেই বিশ্বাস না করে) না না, এ যে অসম্ভব! ইরানের মহাবীর রুস্তমের বিখ্যাত রাক্‌শ্‌– চুরি করে নিয়ে যাবে– কার বুকে এতটা সাহস?

রুস্তম ঃ নিয়ে যেতে পারে বন্ধু, নিয়ে গেছে। আমরা এখানে সাধারণ বেশে শিকারে এসেছি। তোমাকে আমাকে কে চেনে এখানে, বল?

গুদুর্য ঃ (বেশ চিন্তিত কণ্ঠেই বলে–) কি করবে ভাবছ রুস্তম?

রুস্তম ঃ রাক্‌শের পদচিহ্ন ঠিক চিনি আমি।

গুদুর্য ঃ (রুস্তমের উদ্দেশ্যটা আন্দাজ করে নিয়ে বলে) সেই চিহ্ন–

রুস্তম ঃ ধরে ধরে সামনে এগোব। চল, আর দেরী নয়।

(ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে দু'জন এগোয়। গুদুর্যের ঘোড়ায় চড়ে দু'জন চলছে পাহাড়ের গা ঘেঁষে, লোকালয়পেরিয়ে।... একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়)

গুদুর্য ঃ এটা কোন্ দেশ ভাই?

লোক ঃ (দু'জনকে দেখে নিয়ে বলে–) সামেঙ্গান। আপনারা কারা?

রুস্তম ঃ আমরা শিকারী ভাই। আচ্ছা যান, আমরাও চলি।

(লোকটি চলে যায়)

গুদুর্য ঃ আমরা ইরান ছেড়ে এসে গেছি শত্রুর এ দেশে?

www.pathagar.com

রুস্তম ঃ ভয়-ভীতি দু'পায়ে মাড়িয়ে চল। আমার অশ্বকে চাই!

(সামেঙ্গানের রাজপ্রাসাদ, খুবই সাধারণ। রাজপ্রাসাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে রুস্তম ও গুদুর্য; ঘোড়াটি যাচ্ছে পেছনে পেছনে। হঠাৎ দু'জনের কানে ভেসে আসে নারী কণ্ঠ- অদূরে বাগানে ফুলগাছের আড়ালে অস্পষ্ট দুই নারী)

১ম নারী কণ্ঠ ঃ অবশেষে এসেছেন তিনি!

২য় নারী কণ্ঠ ঃ (কণ্ঠে অনেকটা বিস্ময় মিশিয়ে) এই সেই মহাবীর?

(মুখ চাওয়াচাওয়ি করে আবার চলতে থাকে রুস্তম ও গুদুর্য, ঘোড়াটি পিছনে পিছনে।... বেশ কিছু লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় দু'জন)

গুদুর্য ঃ আমরা বিদেশী।

রুস্তম ঃ (রাজপুরুষটিকে) রাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

রাজপুরুষ ঃ (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দু'জনকে দেখে নিয়ে-) পরিচয়?

(বাগানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অন্য দুই তরুণী)

১ম তরুণী ঃ আমরা যা শুনলাম- হুবহু তা বলি গিয়ে চল।

২য় তরুণী ঃ তা-ই চল; সখীসহ রাজকন্যা এখনো বাগানে।

(বাগানের অন্যত্র সামেঙ্গান-রাজ ফুল গাছের পরিচর্যা দেখছিলেন, পাশে সেই রাজপুরুষ)

সামে-রাজ ঃ রুস্তম? সামেঙ্গানে মহাবীর রুস্তম- কেন?

রাজপুরুষ ঃ আপনাকে বলবে তা নিজে। আমার সন্দেহ মনে-
পরিচয় সত্য নয়। মহাবীর রুস্তম হবে-

সামে-রাজ ঃ কি রকম হবে? দেখতে হাতীর মত? যত্বসব!
আমার সৌভাগ্য, সামেঙ্গানে সশরীরে মহাবীর!
যাও, যথাযোগ্য মর্যাদায় বীরকে বরণ কর।
অতঃপর সংবর্ধনা। বুঝতে পেরেছ? সংবর্ধনা।

রাজপুরুষ ঃ রাজকীয় সংবর্ধনা হবে? তুরানের বৈরী দেশ,
তার বাসিন্দাকে ...

সামে-রাজ ঃ (অসহিষ্ণু ভাবে-) বুঝেছি বুঝেছি। তুরান-সম্রাট
নাখোশ হবেন। ঠিক আছে, আমার এ পরিচয়
বাদ দাও। রাজা নই, মানুষ তো বটে! সংবর্ধনা
হবে ব্যক্তিগত, ঘরোয়া ব্যাপার। আমার অতিথি
আজ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বীর ইরানী রুস্তম!... যাও।

www.pathagar.com

(আনন্দবাদ্য বেজে ওঠে। অতিথির বেশে রুস্তম ও গুদুর্য হাসিমুখে অগ্রসর হয়। অপর দিক থেকে হাসিমুখে এগিয়ে আসেন সামেঙ্গান-রাজ, পেছনে রাজপুরুষ। অভ্যর্থনা শেষে সামেঙ্গান-রাজ অদূরে বাগানের দিকে হাত বাড়িয়ে অতিথিদের আমন্ত্রণ জানান। রুস্তমের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় একদিকে। অদূরে তার সামনে দাঁড়িয়ে এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণী, হাতে পুষ্পডালা। অন্য এক নারী (সখী) পুষ্পডালা হাতে এগিয়ে যায় গুদুর্যের দিকে। উৎসুক দৃষ্টিতে রুস্তমকে বলেন সামেঙ্গান-রাজ-)

সামে-রাজ ঃ কন্যা তাহ্‌মিনা।

তাহ্‌মিনা ঃ (মাথা নত করে) সুস্বাগত অতিথি মহান!

সামে-রাজ ঃ (মেহমানদারির তাগিদে মুখে গাম্ভীর্য এনে) মন্ত্রী! অন্যান্য অভ্যাগতজন…

রাজপুরুষ ঃ (ত্রস্তপায় কাছে এসে বলে—) যথাস্থানেসমাগত।

(তাহ্‌মিনা ফুল তুলে দেয় রুস্তমের হাতে। মুগ্ধ চোখে রুস্তম তাহ্‌মিনাকে দেখে)

তাহ্‌মিনা ঃ আমি মাতৃহারা, কোন ভাইবোন নেই। রাজপুরী বহুজনে পরিপূর্ণ নয়।

রুস্তম ঃ (মুগ্ধভাব সামলে নিয়ে) ফুলহাতে অন্যজন …

তাহ্‌মিনা ঃ আমার সহেলি-সখী। পুষ্পোদ্যানে চলুন অতিথি।

(দু'জনেই পা বাড়ায়।… সামেঙ্গান-রাজ ও গুদুর্য আসনে বসে কথা বলছেন। সেখানে গিয়ে আসন গ্রহণ করে রুস্তম। তাহ্‌মিনা এগিয়ে গিয়ে সখীসহ ভোজের আয়োজনে সামিল হয়)

গুদুর্য ঃ কাস্পিয়ার তীর থেকে ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন ধরে এসেছি এখানে। আমরা নিশ্চিত- অশ্ব আর চোর এখানেই আছে।

(কথাগুলো ঘাড় বাঁকিয়ে শোনে তাহ্‌মিনা, মুখে মৃদু হাসি)

সামে-রাজ ঃ (কথাটার যুক্তি বুঝে) থাকে যদি, অবশ্যই পাব। ভাবছি- কী সৌভাগ্য আমার! অবশেষে চৌর্য-সূত্রে বিশ্বখ্যাত অতিথির সাক্ষাৎ পেলাম। বন্ধু রূপে পরিচয় হল, এল সেবার সুযোগ।

রুস্তম ঃ (খোশ মেজাজের প্রত্যুত্তরে সসম্ভ্রমে) আমরাও ভাগ্যবান। মনে হয়- দৈবক্রমে ঘটে গেল সব!

www.pathagar.com

(তাহ্‌মিনা, সখী ও অন্যরা খাবারের আঞ্জাম নিয়ে এগিয়ে আসে।– দূরে রাজধানীর লোকজনের চোখেমুখে ঔৎসুক্য। শোনা যায় ভোজ ও পানপাত্রের আওয়াজ)

(একটা কোঠায় রুস্তম ও গুদুর্য। কোঠায় একটা মৃৎপাত্রে আগুন জ্বলছে নিভু নিভু হয়ে)

গুদুর্য : অভ্যর্থনা দেখে মনে হয়– আমরা দু'জনে যেন পরম আত্মীয়!

রুস্তম : (অন্য কি ভাবছে) হতে পারে, সব কিছু ভয় থেকে!

গুদুর্য : অনেকটা রাত, ঘুমুবার হয়েছে সময়।

রুস্তম : (নিজের ভাবনা ঝেড়ে ফেলে ব্যস্তভাবে বলে–) এস।

(তখনই শোনা যায় রাক্‌শের হ্রেষাধ্বনি)

গুদুর্য : আস্তাবলে সঙ্গী-সাথীসহ রাক্‌শ্‌ তো বেশ খুশী!

রুস্তম : এখন চোরকে ধরা।

গুদুর্য : (হাসিমুখে উত্তর দেয়) তা–ও হয়ে যাবে, যথাকালে।

(গুদুর্য চলে যায়। পায়চারী করে রুস্তম। – বাইরে শীতার্ত রাত, কুয়াশায় ঘেরা। – তাহ্‌মিনা দরজায় এসে দাঁড়ায়, রুস্তম অবাক)

রুস্তম : তাহ্‌মিনা!

তাহ্‌মিনা : (দরজা থেকেই) কিছু কথা আছে।

রুস্তম : (আরও বিস্মিত কণ্ঠে বলে রুস্তম) কথা! এই এত রাতে…

তাহ্‌মিনা : এমন কথাও থাকে, সময়ের সঙ্কোচ যার বাধা নয় প্রকাশের পথে।

রুস্তম : (তাহ্‌মিনার যুক্তি মেনে নিয়ে) বল, কি বলতে চাও।

তাহ্‌মিনা : আগুনটা নিভু নিভু। (তাহ্‌মিনা আগুনটার দিকে এগোয়)

রুস্তম : (রুস্তমও এগিয়ে গিয়ে) না না, আমিই উস্‌কে দিই।

(উস্‌কে দেওয়াতে আগুনটা আরও জ্বলে ওঠে। অগ্নি–পাত্রের একদিকে তাহ্‌মিনা, অন্যদিকে রুস্তম; দু'জনের চোখ–মুখের সামনেই জ্বলছে অগ্নি–শিখা)

তাহ্‌মিনা : সামেঙ্গান রাজগৃহে বসে হয়তো বা ভাবছেন– এখানের আবহটা রাজকীয় নয় কেন!

রুস্তম : (বিব্রতবোধ করেও স্বীকার করে সায় দেয়) তা–ই!

তাহ্‌মিনা : সবাই তো জানে– রাজধানী, রাজপুরী সর্বদেশে

www.pathagar.com

ছোট-বড় রাজারাজড়ার শক্তি-শান-শওকত
প্রকাশের উপযোগী থাকে।

রুস্তম ঃ (আরও মনোযোগী হয়ে বলে—) দুনিয়ার এই রীতি।
এখানে তা না থাকার কারণ কি শুধু সামেঙ্গান
বলদর্পী তুরানের প্রান্ত-রাজ্য বলে?

তাহ্‌মিনা ঃ (বিষণ্ণতাকে যথাসাধ্য দমন করে বলে—) অনেকটা।

রুস্তম ঃ মনে হয়- আরো কথা আছে!

তাহ্‌মিনা ঃ (সব কথা খুলে বলার উদ্দেশ্যে) বেশ কিছুদিন আগে-
সামেঙ্গান ছিল তুরানের এক স্বীকৃত স্বাধীন
রাজ্য। ক্ষুদ্র হলেও ফসলে সম্পদে ভরা। কিন্তু-
দেখা গেল সুকৌশলে সে-সম্পদে বাড়িয়েছে হাত
লোভী-ক্রুর তুরানীরা। কতবার ক্ষুদ্র সামেঙ্গান
তুরানকে মহৎ বলেছে, অনুরোধ জানিয়েছে
ন্যায়-নীতি প্রয়োগের।

রুস্তম ঃ (তিক্ত-অভিজ্ঞ কণ্ঠে বলে—) রক্তপানে অভ্যস্থ শার্দুল
কখনো কি থামে রক্তপানে?

তাহ্‌মিনা ঃ (রুস্তমের কথায় সায় দিয়ে বলে—) থামেনি তুরান। তাই-
সামেঙ্গান-রাজ অবশেষে বললেন রক্ষী দলে-

(দৃশ্য ভেসে ওঠে ঃ কুয়াশায় অস্পষ্ট রক্ষীদল
সমবেত। তাদের নির্দেশ দিচ্ছেন সামেঙ্গান-রাজ)

সামে-রাজ ঃ শকুনির গ্রাস থেকে রক্ষা কর নিজ অধিকার—
জন্মভূমি সামেঙ্গান এই চায় তোমাদের কাছে।

(অস্পষ্টতার মাঝেই সকলের অস্ত্র উত্থিত হয় একসঙ্গে।
তাদের সমন্বিত গর্জন "আ-"-এর সঙ্গে মিশ্রিত হয়
আকাশের মেঘগর্জন ও বিদ্যুতের ঝলক)

তাহ্‌মিনা ঃ অতঃপর সীমান্ত সংঘাত, হানাহানি, মৃত্যু-মাধুরী।
সামেঙ্গানে ধেয়ে এল তুরানের বিশাল বাহিনী,
বন্যার প্লাবনে যেন নিমজ্জিত হল সারাদেশ-
বিধ্বস্ত লাঞ্ছিত পরাজিত ক্ষুদ্র সামেঙ্গান।

(রুস্তমের বীরসত্তা যেন জাগ্রত হয়ে ওঠে)

অবশেষে রাজা তার দাঁড়ালেন গিয়ে নতশিরে
সীমান্তে। যেখানে জয়ী তুরান-সম্রাট তশরীফ

www.pathagar.com

এনেছেন, ডেকেছেন বিজিত রাজাকে কিছু কথা,
কিছু উপদেশ দিতে। যা হবার ছিল, তা-ই হল।
তুরানের মহামানী সম্রাট-সুমুখে হাঁটু গেড়ে
সামেঙ্গান-রাজ।

(ভেসে ওঠে এই সাক্ষাৎকারের দৃশ্য। তুরান-সম্রাটের সামনে হাঁটু গেড়ে সামেঙ্গান-রাজ। মুখে ক্রুর হাসি নিয়ে তুরান-সম্রাট সৌজন্যের ভাণ করেন। হাত ধরে প্রায় টেনে তোলেন সামেঙ্গান-রাজকে। অদূরে নির্বাক দাঁড়িয়ে সেই রাজপুরুষসহ অন্যান্য সামেঙ্গানবাসী। তুরান-সম্রাটের পেছনে সশস্ত্র তুরানীরা)

তুরান-সম্রাট ঃ (মুখে ভণ্ডের হাসি) না না, সে কি! আমরা তো বন্ধু,
একান্ত আপন। ভুল-ভ্রান্তি হয় মানুষের। হয়।
আমি সব ভুলে যেতে চাই। পরস্পর বন্ধু হয়ে
উপনীত হতে চাই উন্নতির চরম শিখরে।

(এ দৃশ্য মিলিয়ে যায়। পায়চারি করছে রুস্তম)

তাহ্‌মিনা ঃ ফিরছেন সামেঙ্গান-রাজ। দুপাশে দাঁড়িয়ে মূক
সামেঙ্গানবাসী। আসছেন রাজা, মুখে টানা হাসি-

(আবার ভাসে দৃশ্য ঃ দুপাশে সামেঙ্গানবাসী, মুখে হেঁ হেঁ হাসি নিয়ে রাজা বলছেন—)

সামে-রাজ ঃ ব্যবহার ভালই পেয়েছি। তুরানের খাঁটি মিত্র
আমরা এখন। দূর থেকে যারা দেখেছেন— আমি
হাঁটু গেড়ে বসে গেছি মিত্রের সম্মুখে— তারা ঠিক
জানেন না আমি কত যে ক্লান্ত ছিলাম! পা'গুলোতে
শক্তি ছিল না, তাই শেষে হাঁটু গেড়ে আরামসে
বসেই গেলাম···হেঁ হেঁ হেঁ···দু'দেশের মধ্যে কিন্তু
প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে শান্তি, চিরশান্তি বলা যায়।

(হেঁ হেঁ হেঁ- হাসি রাজার মুখে)

রুস্তম ঃ তার অর্থ ভাঁড় হয়ে ফিরলেন সামেঙ্গান-রাজ?

তাহ্‌মিনা ঃ ভাঁড়ের মুখের হাসি একবার শুধু গিয়েছিল
থেমে, যখন শুনলেন ফিরে রুগ্না মহিষী তাঁর
অর্থাৎ আমার আম্মা হঠাৎ করেই বেঁচে নেই!

(আবার এক দৃশ্য ভেসে ওঠে। নির্বাক সামেঙ্গান-রাজ। চোখে আঁচল দিয়ে তাহ্‌মিনা সম্মুখে দাঁড়িয়ে, অন্যান্যেরাও

www.pathagar.com

নীরব। এর মধ্যেই শোনা যায় তাহ্‌মিনার কথা)

কিছুক্ষণ পর পিতা যেই-সেই ভাঁড়। শুধুমাত্র
হাসিটা কান্নাই যেন! বললেন উপস্থিত জনে-

সামে-রাজ ঃ ভালই হয়েছে মরে। রাণীজি হলেই কি--নারী তো!
দুর্বল হৃৎপিণ্ড, তাই বন্ধ হয়ে গেছে। আরে-
আমি এক রাজা, আমার যে রাণী- তাঁকে হতে হবে
আমার মতই কঠিন-হৃদয়! হতে পারল না,
তাই মরে গেল! যাক, এতদিনে মুক্ত আমি-হেঁ হেঁ-

(তাহ্‌মিনার দিকে চেয়ে হঠাৎ রাজার হাসি থেমে যায়। নিজের ভাবধারাকে কোন রকমে আড়াল করে রাজা সরে যান তাহ্‌মিনার সম্মুখ থেকে। দৃশ্য মিলিয়ে যায়)

তাহ্‌মিনা ঃ সব কিছু আমি নীরবে দেখেছি, নীরবে বুঝেছি
যতটুকু বুঝবার!

রুস্তম ঃ (অস্থির কণ্ঠে বলে-) থাক, আমার অসহ্য লাগে।
শুনতে পারি না আমি মানুষের লাঞ্ছনার কথা,
উপভোগ করতে পারি না দাম্ভিকের ঔদ্ধত্য!

তাহ্‌মিনা ঃ আপনি রুস্তম, মহাবীর- তাই তো অধীর এত।

রুস্তম ঃ শক্তিমদমত্ত কোন রাজা বা সম্রাট যেই হোক,
আমি তার দর্পী হাত চিরতরে ভেঙে দিতে চাই!

তাহ্‌মিনা ঃ কতবার কত মুখে মহাবীর রুস্তমের কথা
শুনেছি তন্ময় হয়ে! দেখি নি তো কোনদিন! তাই
কত রাত জেগে, কত তন্দ্রা ঘোরে, মনে মনে কত
এঁকেছি মোহন ছবি!

রুস্তম ঃ (হঠাৎ বিস্মিত হয়ে বলে—) এঁকেছ মোহন ছবি? কার?

তাহ্‌মিনা ঃ মহাবীর রুস্তমের। (বলেই মাথা নত করে তাহ্‌মিনা)

রুস্তম ঃ (তাল-গোলপাকিয়ে) আমার মোহন ছবি! সত্যি?
যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত নয়- সুকোমল দেহ বুঝি তার
ফুলের মালায় ঢাকা? ওষ্ঠে মৃদু হাসি, পোষা পাখি
হাতে? হাঃ হাঃ হাঃ--ক্ষণেক অপেক্ষা কর। বন্ধু গুদুর্য!

(বেরিয়ে যায়। মুখে মৃদু হাসি তাহ্‌মিনার।- গুদুর্যের কক্ষের সামনে রুস্তম। গুদুর্যের নাক ডাকছে)

রুস্তম ঃ আহ্‌হা গুদুর্য! থামাও নাসিকা ধ্বনি। ঘুম ভেঙে

www.pathagar.com

কথা শুনে যাও। (অদূরে রাক্‌শের হ্রেষাধ্বনি-
অস্থির কণ্ঠে) কী মুস্কিল। একদিকে হ্রেষাধ্বনি...

(গুদুর্যের নাক ডেকে ওঠে)

অন্যদিকে-- গুদুর্য।

গুদুর্য : (ঘুম জড়িত কণ্ঠে) কে, কে ডাকছ আমাকে?

রুস্তম : (কিছুটা জোরে এবং দৃঢ়-অস্থির কণ্ঠে বলে ওঠে—) রুস্তম।
শিগগীর এস, কথা আছে।

গুদুর্য : (গুদুর্য বেরিয়ে এসে বলে—) কথা?

রুস্তম : (অধীর-চঞ্চল কণ্ঠে বলে—) মেয়েটির কথা।

গুদুর্য : মেয়ে?

রুস্তম : রাজকন্যা তাহ্‌মিনা। কি কথা বলছে জান?

গুদুর্য : জানি। (হাত ছড়িয়ে হাই তুলে ঘুম থেকে মুক্ত হয়ে নেয়)

রুস্তম : (বিস্ময়ে) না শুনেই জান?

গুদুর্য : (আরও সহজ হয়ে বলে—) না শুনেই যে কথাটি জানা
যায়, সে কথাই বলছে মেয়েটি! যাও, মন দিয়ে
শোন গিয়ে। আর- সে কথাকে উচ্চহাস্যে না-ভাসিয়ে
হৃদয়ে জড়িয়ে রাখ। এবং মেয়েটি যেভাবে বলে,
তুমিও সেভাবে কিছু কথা-মানে কিছু ভাব--কিছু--

(অদূরে রাক্‌শের হ্রেষাধ্বনি)

রুস্তম : আচ্ছা গুদুর্য, এত রাতে রাক্‌শের কি হয়েছে?

গুদুর্য : সঙ্গীকে বলছে কিছু। ভাল লাগছে তো! যাও বন্ধু।

(গুদুর্য দরজা বন্ধ করে। অগত্যা ধীরপায় রুস্তম
এগোয়।... তাহ্‌মিনার মুখে মৃদু হাসি। রুস্তম আসে)

রুস্তম : ঠিক আছে। আমার মোহন ছবি এঁকেছ, ভালই।
ওসব কথার আগে অন্য এক কথা আছে- শোন।
রাক্‌শের পদচিহ্ন ধরে ধরে আমরা এখানে।
কিন্তু রাক্‌শ্? সে তো কোন চিহ্ন ধরে এখানে আসে নি!
কেউ তাকে এনেছে নিশ্চয়!

(মুখের নিঃশব্দ হাসিতে খুবই বিজ্ঞতার ভাব)

তাহ্‌মিনা : (ক্ষণকাল নীরব থেকে বলে—) আমি তাকে আনিয়েছি।

রুস্তম : সে কি!!

তাহ্‌মিনা : (নিঃসঙ্কোচে) তা-ই, আমারই হুকুমে রাক্‌শ্ সামেঙ্গানে

www.pathagar.com

আজ।

রুস্তম ঃ (বিস্ময়ে) তুমি তাহ্‌মিনা, তুমি...তোমারই হুকুমে রাক্‌শ্‌ সামেঙ্গানে আজ?

তাহ্‌মিনা ঃ জানতাম- অশ্ব ছাড়া সামেঙ্গান পেতনা রুস্তমে।

রুস্তম ঃ তাহলে--গুদুর্য!

(আবার গুদুর্যের পরামর্শের জন্য যেতে উদ্যত হয়)

তাহ্‌মিনা ঃ (নিজের হাসি চেপে) থাক। আপনার উত্তর শুনুন।

রুস্তম ঃ (না যেয়ে থামে। চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে—) কেন, রুস্তমকে সামেঙ্গানে হঠাৎ এ প্রয়োজন কেন?

তাহ্‌মিনা ঃ একটি কুমারী মন রাত জেগে জেগে তন্দ্রাঘোরে কোন পুরুষের ছবি আঁকে কেন- নিজেকে শুধান।

(বলেই চলে যায় তাহ্‌মিনা। রুস্তম অবাক নির্বাক)

রুস্তম ঃ নিজেকে শুধাব? তাহলে কি তাহ্‌মিনা--এ্যাঁ!--গুদুর্য!

(কি এক অনুভবের উত্তেজনায় সবেগে বেরিয়ে যায় রুস্তম)

(প্রায়ান্ধকার প্রাসাদ-অলিন্দে দাঁড়িয়ে সামেঙ্গান-রাজ দেখেন তাহ্‌মিনা ও তার সখী প্রাসাদে প্রবেশ করছে।--আর ওদিকে রুস্তমের কোঠায় মুখোমুখি বসে কথা বলছে গুদুর্য ও রুস্তম)

গুদুর্য ঃ হয়ে গেছে।

রুস্তম ঃ (কিছু না বুঝে) হয়ে গেছে?

গুদুর্য ঃ (বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলে) চৌর্য-সূত্র স্পষ্ট হয়ে গেছে। একে বলে প্রেম।

রুস্তম ঃ (বিস্মিত কণ্ঠে বলে) প্রেম?

গুদুর্য ঃ (বিজ্ঞের মুখে এবার হাসি) এই প্রেম-ডোরে বন্ধু তুমি বন্দী হয়ে গেছ।

রুস্তম ঃ (অবাক-অস্থির কণ্ঠে) তুমি কি ভাবছ গুদুর্য... রুস্তম, মহাবীর, দুর্বল হয়ে গেছে তাহ্‌মিনার কাছে?

গুদুর্য ঃ তা না হলে গুদুর্যের কাছে এত ছুটাছুটি কেন?

রুস্তম ঃ কিন্তু এ যে লজ্জা, এ যে --

গুদুর্য ঃ (বিজ্ঞের হাসি মুখে এনে বলে—) পুরুষের পরম গৌরব! রমণী-হৃদয়... তাকে জয় করা রাজ্য জয় থেকে

www.pathagar.com

বহুগুণে শ্রেয় জেনো।

রুস্তম : (অনেকটা অসহায় কণ্ঠে) তাহলে গুদুর্য- তুমি চাও...

গুদুর্য : বরবেশে উপস্থিত হও তুমি বিবাহ বাসরে।

(বেজে ওঠে শাহ্‌নাই। ক্রমে জ্বলে ওঠে আগুনের শিখা। (তখন ওই অঞ্চলের লোকেরা প্রধানত ছিল অগ্নি-উপাসক।) সেই আগুনের দিকে দুই দিক থেকে এগিয়ে আসে বর ও কনে বেশী রুস্তম ও তাহ্‌মিনার হাতগুলো- এক জোড়া হাত অন্য জোড়া হাতকে ধরে।-বর-কনে রুস্তম-তাহ্‌মিনা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে।-প্রাসাদ-অলিন্দের প্রায়ান্ধকারে দাঁড়িয়ে একা সামেঙ্গান-রাজ...মুখে নীরব মৃদু হাসি, চোখে বেদনাশ্রু। মাঝে মাঝে তাঁর চোখে ভাসে সামেঙ্গান-রাণীর মুখ)

সামে-রাজ : তোমার কন্যার বিয়ে হল আজ! দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ
বীর জামাতা তোমার! এ যে কী আনন্দ! আমি একা
এ আনন্দ রাখব কোথায়! বহু দূর থেকে তুমি
প্রার্থনা করো- এ মিলন যেন চিরস্থায়ী হয়।

(ওদিকে নানা খণ্ড দৃশ্যে রুস্তম-তাহ্‌মিনার স্বপ্ন-মধুর মুহূর্তগুলো কেটে যাওয়ার চিত্র ফুটে উঠছে। হাসি-আনন্দে কেটে যাচ্ছে দিন-রাত।... এদিকে সামেঙ্গান-রাজ বাগানে নিজেই ফুল গাছের পরিচর্যায় রত। এমন সময় তাঁর কাছে এসে দাঁড়ায় গুদুর্য)

সামে-রাজ : আসুন অতিথি। বুঝলেন-পরিচর্যা না করলে
এই যে ফুলের গাছ, তাতেও ফোটে না ফুল।

(দু'জনই হাঁটতে থাকেন)

গুদুর্য : তবু রাজা হয়ে নিজ হাতে ফুল-ফল-বৃক্ষ-লতা
ইত্যাদির পরিচর্যা... মানে...ইয়ে রাজা-বাদশার
রীতিতে মিলে না।

সামে-রাজ : (হাসিমুখেই বলেন) যত বড় আর শক্তিশালী হলে
রীতিনীতি মিলে যেত, ততটা তো হতেই পারি নি!

(প্রাসাদ কক্ষের সামনে আসেন)

গুদুর্য : এই কয়দিনে যতটা জেনেছি- হতে পারলেও
হতেন না ইরান বা তুরানের বাদশার মত।

সামে-রাজ : আপনারা যাঁরা মহাবীর- বড় বড় মহামানী
বাদশাদের সঙ্গে থাকেন, জানেন অনেক কিছু।

www.pathagar.com

(প্রাসাদ কক্ষে ঢোকেন)

মনে হয় সে-জানাটা সুখকর নয়?

গুদুর্য : (দু'চোখে ভ্রূকুটি দেখা দেয়, দৃঢ়কণ্ঠে বলে) মোটেই না।
আমরা শক্তিই শুধু, নই শক্তির চালক। নই
মানুষের অকল্যাণ রোধে তার ব্যবহারকারী।

(দু'জনেই আসনে বসেন গিয়ে)

আমাদের শক্তি প্রয়োগে যাঁরা বাদশা-সম্রাট,
তাঁরা চান নিজের কল্যাণ, চান শুধু নাম-যশ
ঐশ্বর্য-বিলাস! যাক, বিদায়ের অনুমতি নিতে
এসেছি মহান রাজা!

সামে-রাজ : (পরিহাস-তরলকণ্ঠে) রাজা, তারও পরে মহান?

গুদুর্য : অভিজ্ঞতা কম নেই, মানুষ চিনি তো।

সামে-রাজ : (প্রাণ খুলে হেসে ওঠেন রাজা) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ...

(হঠাৎ হাসি থামিয়ে)

কিন্তু বিদায়ের অনুমতি?

গুদুর্য : (সাধারণ মানুষের মতই) বহুদিন ঘরছাড়া!

সামে-রাজ : আর জামাতা বাবাজী?

গুদুর্য : (হাসিমুখে বলে ওঠে—) তিনিও যাবেন, কিছু পরে।

সামে-রাজ : আনন্দের দিনগুলো ডানা মেলে উড়ে যায় যেন!

গুদুর্য : কিন্তু ইরানের কায়কাউস বাদশা নামদার
বেঁধে রেখেছেন ভোগ-বিলাসের দিনরাতগুলো।

(সামেঙ্গান-রাজের মুখে বিষাদের হাসি।—গুদুর্যের চোখে ভাসে ইরানের রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের বিলাস-কক্ষে নর্তকীর নাচ উপভোগ করছেন বাদশা কায়কাউস, সুরামত্ত কায়কাউস।... উদ্যানে আলাপরত দুই সেনানায়ক- যুয়ারা ও ফেরাবুর্য কথা বলে—)

যুয়ারা : রাতভর নূপুর-নিক্কণ, ওই সূরা আর নারী-
অসহ্য ফেরাবুর্য!

ফেরাবুর্য : (এ কথায় সায় দিয়ে) একদিকে বিলাস, অন্যদিকে
স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারে সিদ্ধহস্ত কায়কাউস!
যুয়ারা, জানিনা রুস্তম ও গুদুর্য কোথায়। জানি-
সুযোগের অপেক্ষায় সুচতুর তুরান-সম্রাট

www.pathagar.com

সদা-সচেতন। তাই ভাবি-

যুয়ারা : (অস্থির-চঞ্চল কণ্ঠে বলে ওঠে) চল, বাদশার কাছে।

(দু'জনে পা বাড়ায়।-সুরামত্ত কায়কাউস হেসে ওঠেন)

কায়কাউস : রুস্তম-গুদুর্য নেই, অন্যেরা আছেন। আমি আছি!
আমার শক্তির কাছে তুরান-সম্রাট তুচ্ছ অতি!

(কুয়াশার মধ্য দিয়েই চলে যাচ্ছে এক অশ্বারোহী। অশ্বারোহী অস্পষ্ট।... তুরানের এক প্রাসাদ-কক্ষে পায়চারি করছেন তুরান-সম্রাট আফ্রাসিয়াব। পুরো কক্ষটাই খুব একটা আলোকিত নয়। দেখে মনে হয়- এ যেন এক ষড়যন্ত্রের আবহ সৃষ্টিকারী কক্ষ। বার্তাবহ এসে অভিবাদন জানায় তুরান-সম্রাটকে)

আফ্রাসিয়াব : কি সংবাদ বার্তাবহ?

বার্তাবহ : (সম্রাটকে দেখে নিয়ে) সুরামত্ত ইরানের শাহ্,
রুস্তম ইরানে নেই, বীরবৃন্দ ভগ্ন-মনোরথ।
সকলেই তুরানের আক্রমণ আশঙ্কায়-

আফ্রাসিয়াব : (এতক্ষণ শুনছিলেন, এবার বলেন-) এস।

(অভিবাদন শেষে চলে যায় বার্তাবহ। পায়চারী করেন আফ্রাসিয়াব, স্বগত বলে যান-)

রুস্তম ইরানে নেই, কিন্তু প্রয়োজনে আসবে না
ইরানে- তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। সুরামত্ত
বিলাসী কায়কাউস- ভাগ্য গুণে পেয়েছে রুস্তমে।
কিন্তু এ তুরান-সম্রাট আফ্রাসিয়াব- তাঁর পাশে
নেই কোন তুরানী রুস্তম। তাই প্রত্যাশা আমার
মিটবে না যতদিন যোদ্ধারূপে থাকবে রুস্তম।

(খুশীতে ঝলমল গুলরুখ ও বেহ্যাদ আসে)

কন্যা গুলরুখ! স্বামীসহ এসময়ে ...কি খবর?

গুলরুখ : সুখবর জানাতে এসেছি। সামেঙ্গান-রাজকন্যা
তাহ্মিনা, সহেলি আমার- এতদিনে বিবাহিতা।

আফ্রাসিয়াব : ও! খুবই উত্তম খবর। জামাতার পরিচয়?

গুলরুখ : এই, তুমিই বল না।

আফ্রাসিয়াব : (চোখে মুখে ঔৎসুক্য) বেহ্যাদ!

বেহ্যাদ : (গুলরুখকে একবার দেখে নিয়ে) ইরানী রুস্তম।

www.pathagar.com

(অবাক হয়ে যান আফ্রাসিয়াব। ক্ষণপরে হেসে ওঠেন)

গুলরুখ : চল যাই, আনন্দের আয়োজন করতে হবে তো!

আফ্রাসিয়াব : তুমি যাও গুলরুখ। বেহ্‌যাদ থাক, কথা আছে।

(গুলরুখ চলে যায়)

বেহ্‌যাদ, এ কেমন হল?

বেহ্‌যাদ : (সম্রাট খুশী হননি বুঝে নিয়ে) সহেলির বিয়ে হল-
গুলরুখ আনন্দে অধীর! শুনলাম দৈবক্রমে—

আফ্রাসিয়াব : সত্যিই কি দৈবক্রমে?

বেহ্‌যাদ : (সম্রাটের ভাবান্তর দেখে) সামেঙ্গান-রাজ বা রুস্তম
কেউ জানত না তাদের সাক্ষাৎ হবে। রুস্তমের
অশ্ব চুরি হয়- তারই সন্ধানে গিয়ে সামেঙ্গানে
রুস্তম ও তাহ্‌মিনা—

আফ্রাসিয়াব : (চিন্তামগ্ন কণ্ঠে বলেন—) বুঝলাম। কিন্তু রুস্তম
রাজধানী থেকে বাইরে যে কেন, তার জান কিছু?

বেহ্‌যাদ : সুরামত্ত বাদশার ঈর্ষা অবহেলা রুস্তমকে
আহত করেছে জানি।

আফ্রাসিয়াব : (এ সংবাদে খুশী হয়ে) আর তাই বিভেদ-প্রাচীর
দু'জনকে পৃথক করেছে? এ প্রাচীর সুউন্নত হোক।
আর শোন, গুলরুখ-তাহ্‌মিনা সখ্যতার
সুদৃঢ় বন্ধনে কাছাকাছি থাক- এই আমি চাই!

বেহ্‌যাদ : ভবিষ্যতে—

আফ্রাসিয়াব : (আনমনে) ভবিষ্যতে ন্যস্ত হোক আমাদের আশা।

(আফ্রাসিয়াব তাকান বেহ্‌যাদের দিকে)

গুলরুখ চায় আনন্দের আয়োজন! আমি চাই
উৎসবের ব্যবস্থা হোক এই তুরান-প্রাসাদে।
একস্থানে শক্তির বিভেদ; শক্তি-বৃদ্ধি অন্য স্থানে।

(সঙ্গে সঙ্গেই আতশবাজি আরম্ভ হয়। তুরানের রাজধানীতে আনন্দোৎসব চলছে। আনন্দোৎসবের শেষ দিকে শোনা যায়- একটি ঘোড়া ছুটে চলছে, কাছে থেকে দূরে। আতশবাজিও আর দেখা যায় না, দেখা যায় রাতে দূরে-অদূরে অস্পষ্ট লোকালয়, পাহাড় ইত্যাদি। তারপর দৃশ্যগোচর হয় অস্পষ্ট

www.pathagar.com

সামেঙ্গান রাজপ্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সামেঙ্গান-রাজ হাসছেন, পাশে দাঁড়িয়ে অসহায় অবাক রাজপুরুষ)

সামে-রাজ ঃ আবার বল তো মন্ত্রী মহোদয়- হঠাৎ করেই তুরান-প্রাসাদে এত আনন্দোৎসব কেন? রোসো- অনেক হাসলাম কিনা, হাঁপিয়ে উঠেছি। দমটা স্বাভাবিক হোক।...হ্যাঁ, হয়েছে- বল।

রাজপুরুষ ঃ (ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েও সাহস নিয়ে বলে) আনন্দোৎসব- দেরীতে হলেও মা তাহ্‌মিনার বিয়ে হল কিনা...

সামে-রাজ ঃ মানে বিয়ে-টিয়ে হচ্ছিল না, হঠাৎই হয়ে গেল- সুখবর, তাই উৎসব? কিন্তু মন্ত্রী, জামাতা যে তুরানের মহাশত্রু বাবাজী রুস্তম! এ সংবাদে রাগটাগ না দেখিয়ে অনুরাগ দেখাচ্ছে যে বড়- কারণটা কি?

রাজপুরুষ ঃ (বিজ্ঞের মত) মহাবীর রুস্তমকে ইরান আর পাচ্ছে না... তা-ই।

সামে-রাজ ঃ (কিছুটা হতাশ কণ্ঠে) মন্ত্রী হিসাবে তুমি নৈরাশ্যজনক। রুস্তমকে ইরান না পায় যদি, পাবে কি তুরান?

রাজপুরুষ ঃ কি যে বলি, ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল।

সামে-রাজ ঃ (পরিহাসের কণ্ঠে হেসে ওঠেন) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ... তাহলেই বোঝ-বড়র পীরিতি কতটা জটিল! বলতে পারতে তুমি- তুরানের মনে কী যে আছে- তা শুধু অন্ধকার ভবিষ্যতই জানে।

রাজপুরুষ ঃ (রাজার হাঠৎ নৈরাশ্য লক্ষ্য করে বলে—) সত্যি, তা-ই।

(স্বল্পালোকিত কক্ষে মুখোমুখি বসে কথা বলছে আত্মমগ্ন রুস্তম ও তাহ্‌মিনা)

রুস্তম ঃ স্বপ্ন দেখে দেখে কেটে গেল কত দিন, কত রাত!

তাহ্‌মিনা ঃ শক্তিমত্ত মহাবীর যারা- তারাও কি স্বপ্ন দেখে?

রুস্তম ঃ এমনি দেখে না, কিন্তু কখনো মধুর স্বপ্ন যদি দেখা দেয় মোহিনী বাস্তব হয়ে- তখন তো কোন উপায় থাকে না!

তাহ্‌মিনা ঃ (খুশী হয়ে বলে—) আমি শুধু ভাবি- কি করে পেলাম এই অমূল্য সম্পদ!

www.pathagar.com

রুস্তম ঃ (পরিহাসের কণ্ঠে—) অমূল্য সম্পদ! পেয়ে গেছ?

তাহ্‌মিনা ঃ পেয়ে গেছি। শুধু তা-ই নয়, সৌভাগ্যের বারিধারা—

(তাহ্‌মিনা বলতে গিয়ে থেমে যায়)

রুস্তম ঃ মনে হয়— কি কথা বলতে গিয়ে সহসাই তুমি থেমে গেলে?

তাহ্‌মিনা ঃ (সলজ্জভাবে) সৌভাগ্যের বারিধারা—ঝিনুকের বুকে
কখনো যে রেখে যায় প্রণয়ের প্রত্যাশিত দান,
সে-দানেও ভাগ্যবতী আমি।

রুস্তম ঃ (আনন্দ-অধীর কণ্ঠে বলে ওঠে) তাহলে কি তাহ্‌মিনা—
তাহলে কি ঝিনুকের বুকে-

তাহ্‌মিনা ঃ (নতমুখী চোখ তুলে উত্তর দেয়) মুক্তা।

রুস্তম ঃ (পিতৃত্ব-গৌরবে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠে) সত্যি তাহ্‌মিনা?

(আনন্দে আত্মহারা রুস্তম বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে শূন্যে হাত ছোঁড়ে।—রাতের অস্পষ্টতায়ই একটি ঘোড়া আরোহী ছাড়াই দৌড়ে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে।—রুস্তম-তাহ্‌মিনার কক্ষে এখন দিনের আলো। স্বপ্নময় পরিবেশ আর নেই)

রুস্তম ঃ তাহ্‌মিনা! বাইরে সূর্যের আলো, কর্ম-মুখরতা!

তাহ্‌মিনা ঃ রাত যায়, আসে দিন। রাত দিন- এই তো নিয়ম।

(কিছুটা অস্থির রুস্তম এবার তাহ্‌মিনার মুখোমুখি দাঁড়ায়)

রুস্তম ঃ এবার আমার বিদায়ের পালা।

তাহ্‌মিনা ঃ (হৃদয়-তন্ত্রীতে যেন আঘাত লাগে) বিদায়ের পালা?

রুস্তম ঃ আমি তো পুরুষ, আমি সেই মহাবীর রুস্তম!
আমার কর্তব্য আছে!

তাহ্‌মিনা ঃ (অসহায়ের কণ্ঠে বলে—) কিন্তু আমি নারী তাহ্‌মিনা!
আমার স্বপ্নের পূর্ণ রূপায়ন এখনো যে বাকী!

রুস্তম ঃ আবার আসব ফিরে। স্বপ্নের মুক্তাকে দেখে যাব
দুই চোখ ভরে। ততদিন তুমি সামেঙ্গানে বসে
স্বপ্নকে লালন কর। আর- এই নাও উপহার।

তাহ্‌মিনা ঃ উপহার?

রুস্তম ঃ (বাহুর কবচ খুলে) পিতামহ মহাবীর সামের কবচ
এতদিন বাঁধা ছিল আমার এ সুদৃঢ় বাহুতে।
এ-কবচ মঙ্গলকর, শুভ। পুত্র-সন্তান যদি

www.pathagar.com

কোলে আসে, হাতে তার বেঁধে দিও এই সে-কবচ।
আর যদি কন্যা আসে-

তাহ্‌মিনা ঃ (রুস্তমেরনিরুৎসাহিতায়) যদি কন্যা আসে?

রুস্তম ঃ মাথার কেশে বা অন্য কোনখানে বেঁধে দিও এটা।

(তাহ্‌মিনার মুখে হঠাৎ রহস্যময় হাসি)

তাহ্‌মিনা ঃ কন্যারা কি পুত্রদের মত কাম্য নয়?

রুস্তম ঃ (ধরা পড়ে যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করে-) পার্থক্য যে আছে- আমার মতই তুমিও তা জান তাহ্‌মিনা।

(অদূরে রাক্‌শের হ্রেষাধ্বনি)

রাক্‌শ্‌ যে অধীর চঞ্চল! ডাকছে আমাকে যেতে!

(প্রাসাদের বাইরে পায়চারী করছেন সামেঙ্গান-রাজ।- রুস্তম-তাহ্‌মিনা নীরবে পরস্পরের হাত ধরে মুখোমুখি দাঁড়ায়।-প্রাসাদের বাইরে এবার রাজপুরুষ এসে দাঁড়ায় নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকা সামেঙ্গান-রাজের পাশে। তখনই তাদের সচকিত কানে ভেসে আসে রাক্‌শের হ্রেষাধ্বনি। সামেঙ্গান-রাজ ও রাজপুরুষ পরস্পরের দিকে তাকান। তাঁদের মুখে বিষাদের চিহ্ন আঁকা। শোনা যায় গতিময় অশ্ব-খুরধ্বনি।-প্রাসাদ-অলিন্দে দাঁড়িয়ে তাহ্‌মিনা শুনছে- দূর থেকে আরও দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে রাক্‌শের ছুটে চলার শব্দ)

www.pathagar.com

।দ্বিতীয় পর্ব।

(ভোর হয়েছে। সামেঙ্গান প্রাসাদের সামনে হাসিখুশী সামেঙ্গান-রাজ দাঁড়িয়ে, পাশে তাঁর রাজপুরুষ। পাশ ফিরে রাজপুরুষের দিকে তাকান সামেঙ্গান-রাজ)

সামে-রাজ ঃ দিনগুলো যেন পলাতক পাখী! দেখতে দেখতে
তাহ্‌মিনার কোল আলো করে পুত্র এসেছে মন্ত্রী-
পুত্র, রুস্তমের বেটা- তাহ্‌মিনার স্বপ্নের ধন।

রাজপুরুষ ঃ কি নামে ডাকব তাকে?

সামে-রাজ ঃ (বেশ বিজ্ঞভাবে বলেন-) সোহ্‌রাব, সোহ্‌রাব নামে।

(বলেই তাকান প্রাসাদ-অলিন্দের দিকে। সেখানে বাইরের পানে তাকিয়ে আছে তাহ্‌মিনা; বুকে জড়িয়ে রাখা শিশু সোহ্‌রাব। তাহ্‌মিনার দৃষ্টি অদূরে শস্য ক্ষেতের দিকে। শস্যক্ষেতে ফসলের সমারোহ।-অনেক সময় অতিক্রান্ত। ...তুরানের প্রাসাদ কক্ষ। স্বল্পালোকিত প্রাসাদ-কক্ষে পায়চারি করছেন আর স্বগতভাবেই বলছেন আফ্রাসিয়াব-)

আফ্রাসিয়াব ঃ এক দুই করে সময়ের বুক থেকে ঝরে গেল
ষোলটি বছর। তুরানের সৌভাগ্য যে এর মধ্যে
কায়কাউস ও রুস্তমের মধ্যেকার অসন্তোষ
কমে নি, বরং তা বেড়েই চলেছে। বাড়বে তা জানি।

(বেহ্‌যাদ আসে)

সংবাদ কিছু?

বেহ্‌যাদ ঃ (সম্মান জানিয়ে) ইরানের বাদশা খেয়ালীপনার
চরমে এখন। সেনাধ্যক্ষ সবে স্বার্থের সংঘাতে
নিয়োজিত। মহাবীর রুস্তম জন্মভূমি সীস্তানে
ঔদাসীন্যে ডুবে আছে।

আফ্রাসিয়াব ঃ (সহিংস ক্রুর হাসি মুখে এনে) জানি, সব জানি।

বেহ্‌যাদ ঃ (আফ্রাসিয়াবের মনোভাব লক্ষ্য করে বলে) কিন্তু ভাবি-
এমনটি কেন? সামেঙ্গানে পুত্র তার সোহ্‌রাব,
জায়া তাহ্‌মিনা- সকলকে ছেড়ে মহাবীর এত
উদাসীন কেন?

আফ্রাসিয়াব ঃ (মুখে ক্রুর হাসি) হয়তো কারণ আছে। হতে পারে

www.pathagar.com

সে-কারণ অজ্ঞাত তুরানে, ইরানে, সামেঙ্গানেও!

(বেহ্‌যাদের চোখে মুখে কিছুটা চিন্তা)

তুমি যাও, সর্বদিকে তৈরী হোক তুরান-বাহিনী।

বেহ্‌যাদ : সামেঙ্গানে যেতে চায় গুলরুখ।

আফ্রিসিয়াব : (শুনে ললাটে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে) হঠাৎ সেখানে?

বেহ্‌যাদ : বান্ধবীকে দেখে নাই বহুদিন।

আফ্রাসিয়াব : (কি যেন ভেবে নিয়ে বলে যান-) যেতে চায়, যাবে।
তুমিও একটা কথা ভেবে রাখ। ওই সোহ্‌রাব,
এখন সে বীর যুবা। যোদ্ধারূপে পিতৃ-সমতুল।
অন্যতম সেনাধ্যক্ষরূপে তুরানের বাহিনীতে
যোগ দিক সোহ্‌রাব- এটা আমি অবশ্যই চাই!
যাতে তা সহজ হয়- ব্যবহার সেদিকে গড়াক।

(উদ্দেশ্যটা উপলব্ধি করে চলে যায় বেহ্‌যাদ)

এবার কায়কাউস, সমাগত তোমার-আমার
শেষ খেলা, রণক্ষেত্রে আমাদের শেষ মুকাবিলা!

(চোখের দৃষ্টিতে পরিকল্পনার আভাস)

(ইরানের বিলাস কক্ষে চলছে নর্তকীর লাস্যনৃত্য। অর্ধ-শায়িত সুরামত্ত কায়কাউস তা উপভোগ করছেন। বিলাস কক্ষের বাইরে রাতের আঁধারে তিন সেনাধ্যক্ষের ছায়ামূর্তির একজন সামনে দাঁড়ানো এক নারী-ছায়াকে একটি পত্র দেয়।... নারী-ছায়া ভয়ে ভয়ে বিলাস কক্ষের পর্দা ফাঁক করে দাঁড়ায়। নর্তকীর নাচ থেমে যাওয়ায় কায়কাউস তাকান পর্দার দিকে)

কায়কাউস : (বিরক্ত কঠোর কণ্ঠে) কে?

(ভয়ে সেই নারী চলে যায়। অধিকতর দ্রুত ছন্দে আবার আরম্ভ হয় নাচ।—নারী-ছায়া ভয়ে ভয়ে দাঁড়ায় গিয়ে সেনাধ্যক্ষ-ছায়াদের সামনে। পত্রটা বাড়িয়ে ধরে)

ছায়ারা : (দৃঢ়কণ্ঠে একসঙ্গে বলে ওঠে-) আবার যাও।

(ভয়ে ভয়ে নারী-ছায়া পত্র হাতে আবার চলে যায়।—বিলাসকক্ষের পর্দা আবার ফাঁক হয়। সুরামত্ত কায়কাউস রক্তচক্ষু মেলে তাকান সেদিকে)

নারী : (সাহস সঞ্চয় করে কোনরকমে বলে—) জরুরী সংবাদ!

(অর্ধ-শয়ান থেকে সোজা হয়ে বসতে চেষ্টা করেন কায়কাউস। সঙ্গে সঙ্গে পর্দার ফাঁক বন্ধ হয়ে যায়,

www.pathagar.com

অদৃশ্য হয়ে যায় নারী-ছায়া। চরমে ওঠে লাস্য নৃত্য।— বাইরে সেনাধ্যক্ষ-ছায়াদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সেই নারী-ছায়া। পত্রটি বাড়িয়ে ধরে।

ছায়ারা ঃ (একটা ছায়া তা হাতে নেয়। সবাই বলে ওঠে-) জাহান্নামে যাক!
(বিতৃষ্ণা ভরে সেনাধ্যক্ষ-ছায়ারা স্থান ত্যাগ করে। নারী-ছায়াও নিজের পথ ধরে)

(দিন। এক পাহাড়ের পাদদেশে এক স্থানে দাঁড়িয়ে ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকে তাহ্‌মিনা-)

তাহ্‌মিনা ঃ সোহ্‌রাব!

(মায়ের এই ডাক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় চারদিক থেকে। তাহ্‌মিনা দেখে-একটা টিলার ওপার থেকে ক্রমে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে শিকারীবেশী তরুণ সোহ্‌রাবের মাথা থেকে সর্বদেহ। সোহ্‌রাবের মুখে হাসি। সোহ্‌রাব এগিয়ে আসে মায়ের দিকে)

(উদ্বিগ্নকণ্ঠে) এত দেরী হল?

সোহ্‌রাব ঃ (মায়ের উদ্বিগ্নতা লক্ষ্য করে বলে) শিকারে সময় লাগে।
সিংহের আস্তানা- সে তো বহুদূরে গহীন অরণ্যে!
তারপর তাকে পেয়ে মুকাবিলা করা- বাগে এনে
কাবু করা-সময় তো লাগবেই!

তাহ্‌মিনা ঃ (ছেলের কথা শুনে শঙ্কিত কণ্ঠে) এতটা সাহস!!

(মায়ের কথা শুনে সশব্দে হেসে ওঠে সোহ্‌রাব। তাহ্‌মিনা অবাক। তার চোখে ভাসে-সোহ্‌রাবের স্থানে দাঁড়িয়ে সশব্দে হাসছে যেন মহাবীর রুস্তম! সে দৃশ্য মিলিয়ে গেলে গম্ভীর কণ্ঠে বলে তাহ্‌মিনা-)

সেই মৃত পশুটা কোথায়?

সোহ্‌রাব ঃ (তাচ্ছিল্য ভরে উত্তর দেয়) টেনে আনছে সঙ্গীরা।

(সোহ্‌রাব ও তাহ্‌মিনা চলতে আরম্ভ করে। শস্যক্ষেতের পাশে বাগানে তারা থামে, কথা বলে)

তাহ্‌মিনা ঃ ওই দেখ সোহ্‌রাব, ফুলে ফলে সেজেছে পৃথিবী-
বিশ্ব-স্রষ্টার এই তো বিধান! চিরকালের জন্য
এ বিধান চলমান। মানুষের জন্যও তেমনি
এ জীবন-ধারা। এ জীবনে মানুষের কর্তব্য কি
জান?

সোহ্‌রাব ঃ (চকিতে) বল।

www.pathagar.com

তাহ্‌মিনা ঃ (কথার সূত্র ধরে) এই যে বিধান- একে চলমান রাখা।

(সোহ্‌রাব মায়ের দিকে তাকায়)

এ-বিধান চলমান ছিল এ দেশে- এই ক্ষুদ্র
সামেঙ্গানে। ভেঙ্গে দিল শক্তিমত্ত তুরান-সম্রাট।
ওরা- ওই লোভী-ক্রুর স্বার্থকামীরা এমনি করে
তছনছ করে দেয় সব। একাজে সফল তারা
বীরদের ব্যবহার করে।

সোহ্‌রাব ঃ (গুরুত্ব না দিয়েই বলে-) পারে যদি, ব্যবহার
করবেই!

তাহ্‌মিনা ঃ (সন্দিগ্ধ ভাবে) কথাগুলো তোমার কি ভাল লাগছে না?

সোহ্‌রাব ঃ মনে হয়- তুমি যেন পৃথিবীর মতই এক মা-
শান্তি চাও, স্বস্তি চাও। চাও এ-পৃথিবী ফুলেফলে
সুশোভিত হোক।

তাহ্‌মিনা ঃ (অস্থির কণ্ঠে বলে-) ওরা তা চায় না, শক্তিকে কব্জায়
রেখে ওরা সব ধ্বংস করে দিতে চায়! এ-মাটির
কোল শূন্য হয়ে যায়- যাক, তবু ওরা ফিরবে না!

সোহ্‌রাব ঃ ফিরে না কখনো। প্রসঙ্গটা তুলেছই যদি, শোন-
আমি চাই এই লোভ এই ক্রূরতার, আর এই
সর্বনাশা হিংস্র খেলার, চির অবসান হোক।

তাহ্‌মিনা ঃ চাও বটে, কিন্তু উপায়?

(প্রাসাদের সামনে এসে মা ও ছেলে দাঁড়ায়)

সোহ্‌রাব ঃ (মায়ের মুখোমুখি হয়ে) আমার যে-প্রশ্নটা তুমি
এতদিন চেপে গেছ- আজ তারই উত্তর চাই।

(সোহ্‌রাবের কণ্ঠে দৃঢ়তা)

আমি জানি- ইরানের সেনাপতি রুস্তম আমার
পিতা। কিছুদিন তিনি শুধু এখানে ছিলেন। কিন্তু
তারপর? আমাদের কোন যোগাযোগ নেই কেন?

(তাহ্‌মিনা মুখ ফিরিয়ে নিশ্চল)

জানতে চাই সোহ্‌রাবের খানদানী পরিচয়!

(তাহ্‌মিনা সোহ্‌রাবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলে-)

তাহ্‌মিনা ঃ আজই, এখানে দাঁড়িয়ে তার উত্তর পেতে চাও?

সোহ্‌রাব ঃ চাই। অনেকের বক্র দৃষ্টি আমাকে আহত করে।

www.pathagar.com

(অতীতে যেন ফিরে যায় তাহ্‌মিনা)

তাহ্‌মিনা ঃ ইরানের প্রান্তে অবস্থিত এক শহর, সীস্তান–

(উন্মোচিত হয় এক দৃশ্য। সেই ষোল বছর আগে প্রাসাদেরই সামনে কথা বলছে রুস্তম ও তাহ্‌মিনা। উল্লসিত কণ্ঠে কথা বলছে রুস্তম, শুনছে নির্বাক তাহ্‌মিনা)

রুস্তম ঃ সে–শহর বুকে নিয়ে যেই জনপদ– বীর্যশুল্কে
অধিকারী তার 'এই রুস্তমের পিতৃ–পুরুষেরা;
বীরত্বের মর্যাদাস্বরূপ ইরানের শাহী দান।
জাবুলস্তান আমার দেশ, পিতৃ–পুরুষের দেশ!
বিশ্বখ্যাত মহাবীর পিতা যাল, তাঁর পিতা সাম–
মহা মহাবীর পিতামহ রুস্তমের। পিতামহ
নেই আজ, আছে তাঁর খ্যাতি। খ্যাতিসহ আজো বেঁচে
বৃদ্ধ পিতা যাল আর জননী রুদাবা– বার্দ্ধক্যের
সেবার প্রত্যাশী। তাহ্‌মিনা, আমি যাব সেখানেই!

তাহ্‌মিনা ঃ তাঁদের সেবার অংশীদার হতে আমি কি পারি না?

রুস্তম ঃ তোমার এ–অবস্থায় নয়। যেয়ো, আসবে সময়।
সসম্মানে তুমি যাবে সীস্তানের বধূ তাহ্‌মিনা!

(দৃশ্য মিলিয়ে যায়। আজকের তাহ্‌মিনা আবেগোত্তেজিত কণ্ঠে বলে–)

তাহ্‌মিনা ঃ পিতা তোর বিশ্বখ্যাত মহাবীর সেই সে–রুস্তম!
আমি সামেঙ্গান–রাজকন্যা বিবাহিতা জায়া তাঁর।
নোস্ তুই লজ্জাজনক কোন অজ্ঞাতকুল পুত্র!

(সোহ্‌রাব উল্লসিত, উত্তেজিত)

সোহ্‌রাব ঃ শত্রুত্রাস মহাবীর রুস্তমের সীস্তান তাহলে
আমার নিজের দেশ! জন্মভূমি পিতৃ–পুরুষের!!
এই আমার খানদানী রক্ত–পরিচয়? রুস্তম...

তাহ্‌মিনা ঃ তাঁরই ঔরসজাত পুত্র তুই ওরে সোহ্‌রাব,
তাহ্‌মিনার স্বপ্নের ধন, মায়ের একক আশা!

সোহ্‌রাব ঃ কিন্তু আম্মা, এতদিন ধরে কেন এই মহামূল্য
গুপ্তধন থেকে সন্তানকে বঞ্চিত রেখেছ? কেন?

তাহ্‌মিনা ঃ বলে তো গেলেন তিনি সামেঙ্গানে ফিরে আসবেন।
বছরের শেষে সংবাদ পাঠালাম। কিন্তু কই,

www.pathagar.com

তাঁর কাছ থেকে আর তো খবর নেই! এ কি নয়
অপমান তোর এ মায়ের? নয় লজ্জা?

সোহ্‌রাব ঃ (মায়ের ক্ষোভের কারণ উপলব্ধি করে) শতবার!
কিন্তু তা জানলে আমি এতদিনে তাঁর মুখোমুখি
হয়ে কৈফিয়ত চাইতাম!

তাহ্‌মিনা ঃ (নিজের দুর্বলতা ঢেকে বলে—) পারি নি তা অভিমানে!

(মুখে ম্লান হাসি এনে সোহ্‌রাব বলে—)

সোহ্‌রাব ঃ ভয়ও ছিল— সোহ্‌রাবও যদি মা-কে ভুলে যায়!
অথবা রুস্তম যদি সোহ্‌রাবে নিয়ে যায় কাছে!

(সোহ্‌রাব আপন মনেই হেসে ওঠে)

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ আমার ভাগ্যের খেলা, নিয়তি-লিখন।

(পর মুহূর্তেই দৃঢ়কণ্ঠে আপন মনে বলে—)

ফলাফল কি হবে জানি না— পিছ পা' হব না তবু,
লড়ে যাব···লড়ে যাব।

তাহ্‌মিনা ঃ (ছেলের বুকে হাত রেখে) সোহ্‌রাব, ওরে সোহ্‌রাব!

(মায়ের ডাক শুধু শোনা যায়; দেখা যায়— মায়ের হাত পুত্রের পেশল বুকে পরশ বুলিয়েই যাচ্ছে)

(সামেঙ্গান-প্রাসাদের আঙ্গিনা পার হয়ে চিন্তিতভাবে প্রাসাদ-দুয়ার অতিক্রম করে তাহ্‌মিনা। তার কানে ভেসে আসে নিজেরই কণ্ঠস্বর)

তাহ্‌মিনা ঃ হঠাৎ করেই মনে এত ভয় কেন! এত ভয়
সোহ্‌রাবের কথা শুনে! আসছে কোন অমঙ্গল?

(বারান্দা পার হতে থাকে তাহ্‌মিনা)

পিতৃ-পুরুষের জন্য যত উল্লসিত সোহ্‌রাব
আমার ও আমাদের জন্য তত নয়! তাহলে কি···

(শয়ন-কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ায়)

ভুল? ভুল কি করেছি আমি? একটি মিথ্যার ভুল!
ভুলের বালুকা চরে মনোহর মহল গড়েছি?

(শয়ন-কক্ষে ঢুকে বিছানার দিকে তাকায়)

তাহ্‌মিনা ঃ পনের বছর আগে, শিশু সোহ্‌রাবে পাশে নিয়ে—

(পনের বছর আগেকার তাহ্‌মিনা বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে, তার একটা হাত পাশে শায়িত শিশু সোহ্‌রাবের দেহ ঘিরে রক্ষিত। হঠাৎ বিছানার পাশে দেখা দেয় যুদ্ধবেশী ভীষণ—

www.pathagar.com

দর্শন মহাবীর রুস্তম। টেনে নেয় শিশু সোহ্‌রাবকে। ঘুম ভেঙে যায় তাহ্‌মিনার। আতঙ্কে আঁতকে উঠে শিশুকে ধরতে যায়, পারে না। সোহ্‌রাবকে নিয়ে বেরিয়ে যায় রুস্তম। পরক্ষণেই দেখা যায় গোঁ-গোঁ শব্দ করে বিছানায় উঠে বসে তাহ্‌মিনা। পাশে তাকিয়ে দেখে শিশু সোহ্‌রাব আগের মতই ঘুমিয়ে আছে। শঙ্কিতা তাহ্‌মিনা সোহ্‌রাবকে বুকে জড়িয়ে ধরে উঠে দাঁড়ায়। আপন মনে বলতে থাকে-)

তাহ্‌মিনা ঃ না না, সোহ্‌রাব না থাকলে কি নিয়ে বাঁচব আমি?
তাকে আমি কিছুতেই হারাতে পারি না, পারি না- না!

(কান্নায় ভেঙে পড়ে। অতঃপর নিজেকে সংযত করে বলে-)

কিন্তু ছেলে হয়ে জন্মেছে যে, বড় হলে মহাবীর
পিতা তাকে নিয়ে তো যাবেই! নারীর দুর্বল হাত
কি করে রুখবে তাঁকে? মহাবীর তিনি, মহাবল!

(কণ্ঠ তার পরিহাস)

অথচ তাঁরই ধ্যানে কতকাল কেটেছে আমার!

(নিজেকে প্রশ্ন করার মত করে বলে-)

সে কি শুধু সামেঙ্গানের লাঞ্ছনার জন্যেই?
তা-ও যদি সত্য,তবে সে-স্বপ্নের একনিষ্ঠতায়
কৃত্রিমতা ছিল না তো! তবে কেন এ স্বপ্ন ভঙ্গের
জ্বালা নিয়ে কাটবে তাহ্‌মিনার সারাটা জীবন?

(কি যেন চিন্তা করে চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে)

পেয়েছি উপায়। তিনি যদি নির্মম হন, আমিও...

(বুকের শিশুকে বিছানায় শুইয়ে দাঁড়ায়। চোখে মুখে রহস্য)

সীস্তানে সংবাদ যাবেঃ পুত্র নয়, পুত্র নয়- কন্যা।
কেশে তার শোভা পাচ্ছে পিতৃদত্ত স্মারক কবচ!
এই কথা জানবে না কেউ-কেউ নয়, কেউ নয়।

(কক্ষের বাইরে দরজায় কান পেতে এক দাসী তা শুনছে।...শয়ন কক্ষে দাঁড়ানো আজকের তাহ্‌মিনা আপন মনে বলে-)

তাহ্‌মিনা ঃ ভুলই করেছি। সাধ করে ভুলের বালুকা চরে
মনোহর মহল গড়েছি। রুস্তমের বীর-রক্ত
প্রবাহিত সোহ্‌রাবের দেহে। সেই রক্ত ডাকছে
সোহ্‌রাবে। ডাকে সাড়া দেয় যদি সোহ্‌রাব?

(কক্ষ থেকে বেরিয়ে অলিন্দে দাঁড়িয়ে দেখে তাহ্‌মিনা-

www.pathagar.com

প্রাসাদের সামনে পায়চারি করছে সোহ্‌রাব। সোহ্‌রাব চিন্তিত, শুনতে পাচ্ছে নিজেরই কণ্ঠস্বর—)

সোহ্‌রাব ঃ দীর্ঘকাল হয়ে গেল, কোন যোগাযোগ নেই-
কেন? ভালবেসে বিয়ে করলেন, একক সন্তান
আমি তাঁর ...তবু কেন এই গরমিল? তাহলে কি
ভেবেছেন- সামেঙ্গান নামে মাত্র স্বাধীন হলেও
আসলে তা তুরানের! সেই সূত্রে তুরানীয় বলে
ইরানী পিতার এই ঘৃণা?...কিন্তু এত প্রেম-প্রীতি
এত ভালবাসা...তা-ও ভেসে যায় জাতিত্ব গৌরবে?
মানবিক আদর্শের কোন দাম নেই?...যা শুনেছি,
পুরোপুরি সত্য যদি হয়- তাহলে তো অকারণ
নয় অভিমান আমার মায়ের! এ যে অপমান।

(সামেঙ্গান-রাজ আসেন)

সামে-রাজ হঠাৎ এখানে?

সামে-রাজ ঃ (পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলেন) বেরিয়েছি ভাই
হাওয়া খেতে। তদুপরি শীতার্ত রাত- ভাবলাম,
মস্তিষ্কের গরমটা কমানোই ভাল- স্বাস্থ্য রক্ষা
হবে। কিন্তু দেখলাম- তরুণ নায়ক একা একা
পায়চারি করছেন আর ভাবছেন কিছু যেন।
সে-কিছুটা কি?

সোহ্‌রাব ঃ (পরিহাস ভরা কণ্ঠে) নায়িকার সন্ধানে বড়ই বিব্রত!

(দু'জনেই হেসে ওঠেন)

বৃদ্ধ রাজন ভাবছিলাম ..ইরান-তুরান আর
সামেঙ্গান, সব ক'টা রাজ্যকে একত্র করে দেব।

সামে-রাজ ঃ হাঃ হাঃ হাঃ...একত্র করে দেবে? তার মানে এক রাজ্য?
পার যদি, বড় ভাল হয়। আমি কিন্তু হব ভাই
সে-রাজ্যের মহা-সম্রাট। সামেঙ্গানের রাজা তুচ্ছ!
মনে বড় জ্বালা, তাই আমি হতে চাই বাদশাহ্‌-
মহা-সম্রাট! আরও ভাল হয়- হতে পারি যদি
এই পৃথিবীর অধিশ্বর, একচ্ছত্র অধিপতি।

সোহ্‌রাব ঃ পৃথিবীটা থাক, ছোট করে ভাব।...একি অসম্ভব?

সামে-রাজ ঃ ভাবতে থাক তুমি, আমি চলি হাওয়ার পেছনে।

(চলে যান সামেঙ্গান-রাজ। সোহ্‌রাবের দৃষ্টিতে চিন্তার

www.pathagar.com

আভাস। কিছু দূরে রাস্তায় কিছু লোকের সামনে ডুগডুগি বাজাচ্ছে এক যাদুকর। দেখা যায়- রাতের অন্ধকারে একটা কঙ্কাল এগিয়ে আসছে। আর চারদিক থেকে ভেসে আসছে নানা শব্দ- শেয়ালের ডাক, পৈশাচিক হাসি, দু'টি কুকুরের কামড়া-কামড়ির শব্দ ইত্যাদি। মশাল হাতে এগিয়ে আসে একজন। কঙ্কাল আর নেই, চারিদিকের শব্দও থেমে গেছে)

যাদুকর ঃ এতক্ষণ যা দেখলেন শুনলেন- সবই যাদু,
সবই এক ভানুমতীর খেল্। ওই যে শুনুন-

(একাধিক ঘোড়ার ছুটে আসার শব্দ)

সামেঙ্গানে আসছেন তুরানের মানী মেহ্মান।
এটা কিন্তু যাদু নয়, নিরেট বাস্তব। আসছেন
গুলরুখ...সম্রাট-তনয়া, সঙ্গে স্বামী বেহ্যাদ।
কেনআসছেন— তার কিছু জানে না এ যাদুকর।

(আবার ডুগডুগি বাজে।... ঘোড়াগুলো থামে প্রাসাদ প্রাঙ্গণের অন্ধকারে। ঘোড়ার চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে।-প্রাসাদ কক্ষে হাস্যোজ্জ্বল পরিবেশে কথা বলছে গুলরুখ ও তাহ্মিনা)

গুলরুখ ঃ কতদিন দেখি নি তোমাকে, তাই তো হঠাৎ আসা।

তাহ্মিনা ঃ এ আমার পরম সৌভাগ্য সহেলিয়া গুলরুখ।

(এই কক্ষেই নাশতার আয়োজন চলছে। দাসীদের কাজে তদারক করছে নার্গিস নামের এক চতুর্দশী কন্যা। বোঝা যায়, নার্গিস রাজ-পরিবারেরই একজন)

তারপর? তোমার খবর কি? সবই তো কুশল?

গুলরুখ ঃ কুশল। তোমাদের সকলেই তো ভাল আছ জানি।
সেই মহাবীর কোথায় এখন?

তাহ্মিনা ঃ (কিছুটা বিব্রত বোধ করে বলে—) হয়তো সীস্তানে,
অথবা অন্য কোথাও।

গুলরুখ ঃ (দৃষ্টিতে প্রশ্ন এনে বলে-) কেন, কোন যোগাযোগ নেই?

তাহ্মিনা ঃ কিছুদিন ধরে নেই। যাক, ওঁরা তো জীবনযোদ্ধা,
যাকে বলে সংসারী- সে রকম তো নন! মনোযোগ
তাই সংসার গড়ায় নয়, মনোযোগ রণক্ষেত্রে।

(নার্গিস কাছে এসে সম্মান জানিয়ে নাশতার প্রতি হাত বাড়িয়ে আমন্ত্রণ জানায় দু'জনকে। গুলরুখ নার্গিসকে দেখে নিয়ে বলে-)

গুলরুখ ঃ মেয়েটি কে তাহ্মিনা?

তাহ্মিনা ঃ (নার্গিসকে কাছে নিয়ে) বলতে পার- কন্যা আমার।

(নাশতার টেবিলে যেতে যেতে বলে-)

www.pathagar.com

যাও, আর কিছু আছে কিনা দেখ।

(নার্গিস দাসীদের নিয়ে চলে যায়)

গুলরুখ ঃ (তাহ্‌মিনার দিকে তাকিয়ে বলে-) বড় মিষ্টি মেয়ে।

(ওরা নাশতা খেতে আরম্ভ করে)

তাহ্‌মিনা ঃ তোমার পছন্দ হয়?

গুলরুখ ঃ (হাসিমুখে সায় দিয়ে) উপযুক্ত পুত্রবধু হবে।

(নার্গিস শরবত নিয়ে আসে। দু'জনেরই দৃষ্টি নার্গিসের উপর)

(অন্য কক্ষে আলাপরত সোহ্‌রাব, বেহ্‌যাদ ও সামেঙ্গান-রাজ)

বেহ্‌যাদ ঃ সোহ্‌রাব আর আপনার কাছে এক আবেদন নিয়ে এসেছি এখানে।

সামে-রাজ ঃ (বুদ্ধিহীনের মত হেসে) আবেদন কেন বলছেন- বলুন আদেশ।

বেহ্‌যাদ ঃ (বিনয়ের সঙ্গে) না না, সে কি! সামেঙ্গান আমাদের বন্ধু-রাজ্য, মিত্র! দু'টি রাজ্যই স্বাধীন, সার্বভৌম।

সামে-রাজ ঃ তা তো অবশ্যই, অবশ্যই! তা কথাটা কি বলুন।

বেহ্‌যাদ ঃ সোহ্‌রাব তো এ বয়সেই যোদ্ধারূপে খ্যাতিমান।

(সোহ্‌রাব নীরবে শুনছে। এবার সে তাকায় বেহ্‌যাদের দিকে)

আমাদের দু'টি রাজ-পরিবারে মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই তার খ্যাতি-যশে আমরা গর্বিত।

সামে-রাজ ঃ আপনাদের মহানুভবতায় অনেক আনন্দ পেলাম। সোহ্‌রাবের জন্য এ যে বিরাট সম্মান!

বেহ্‌যাদ ঃ সোহ্‌রাব যেন আরেক রুস্তম! তুরানে রুস্তম নেই। আমরা চাই- অন্য রুস্তম এই সোহ্‌রাব তুরানের সেনাপতি হয়ে তার মর্যাদা বাড়াক।

(এবার যেন সত্যি সত্যিই হেসে ওঠেন সামেঙ্গান-রাজ)

সামে-রাজ ঃ অতিশয় মহৎ প্রস্তাব... আকাশ-কুসুম যেন প্রস্ফুটিত হল মৃত্তিকায়! আমার তো সাধ্য নেই সোহ্‌রাবকে আত্মপ্রকাশের ব্যবস্থা করে দিই। আপনাদের আছে, তাই দিচ্ছেন। তবে- ব্যাপারটা যার, তার নিজ অভিমত... সোহ্‌রাব!

সোহ্‌রাব ঃ (বেহ্‌যাদ ও সামেঙ্গান-রাজকে দেখে নিয়ে) আমি রাজী।

(সোহ্‌রাবের দৃঢ়-সংযত কণ্ঠের উচ্চারিত বাক্যে কয়েক

www.pathagar.com

মুহূর্তের জন্য গম্ভীর হয়ে ওঠে কক্ষের আবহটা। পরক্ষণেই হেসে ওঠে বেহ্‌যাদ)

বেহ্‌যাদ ঃ অপূর্ব! তুরান-গৌরব সোহ্‌রাব!

সামে-রাজ ঃ (জোর করে হাসতে হাসতে বলেন-) চমৎকার!

(চলে যায় সোহ্‌রাব। সামেঙ্গান-রাজ চেষ্টা করে হাসতে থাকেন বেহ্‌যাদের দিকে তাকিয়ে।-অদূরে রাস্তার অন্ধকারে যাদুকরের ডুগডুগি বাজে, শোনা যাচ্ছে যাদুকরের ঘোষণা-)

যাদুকর ঃ চলে গেল- ভানুমতীর যাদুর খেল্ চলে গেল!
দেখতে চাইলে এক্ষুণি তাড়াতাড়ি ছুটে আসুন!

(সামেঙ্গান-রাজ ও বেহ্‌যাদ শোনেন- যাদুকরের ডুগডুগি বাজছেই)

(কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে তাহ্‌মিনা সূর্যোদয় দেখার অপেক্ষায় আছে। পেছনে এসে দাঁড়ায় গুলরুখ)

গুলরুখ ঃ এত সকালে এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছ সহেলি?

তাহ্‌মিনা ঃ দেখছিলাম সূর্যোদয়। পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না,
কুয়াশায় ঢাকা চারদিক!

গুলরুখ ঃ (তাহ্‌মিনার মনোভাব বুঝে) মনে হয়- তোমারও
কথাগুলো কুয়াশায় ঢাকা?

তাহ্‌মিনা ঃ (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে যায়) বুঝতেই পার- আমি
যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছি এক ঘন ঘোর কুয়াশায়!
সোহ্‌রাব চলে যাবে, সামেঙ্গানে আমি রব একা!

গুলরুখ ঃ কেন, সোহ্‌রাব আসবে, যাবে! তাছাড়া সামেঙ্গানে
আছেন তোমার স্নেহময় পিতা, আরো লোক!

তাহ্‌মিনা ঃ কিছু কিছু শূন্যস্থান বরাবর শূন্য থেকে যায়!

গুলরুখ ঃ তা অবশ্য। কিন্তু এইটুকু জেনে রাখ- সোহ্‌রাব
আমার মাঝে তোমার অনেকটা খুঁজে পাবে। তার
কোন অমঙ্গল তোমার মতই আমি বুক পেতে
নেব জেনো।

তাহ্‌মিনা ঃ (ভগ্ন কণ্ঠে বলে) জানি গুলরুখ, জানি। তবু কোথা থেকে
তীক্ষ্ণ এক কাঁটা যেন আমার এ বুকে এসে লাগে!

(আলিঙ্গনাবদ্ধ দুই বান্ধবী দেখে কুয়াশাচ্ছন্ন সূর্যটাকে)

(ওদিকে এক কক্ষে সোহ্‌রাব ও সামেঙ্গান-রাজ কথা বলছেন)

www.pathagar.com

সোহ্‌রাব : রাজী আমি যে কারণে-তোমাকে তা আগেই বলেছি।

সামে-রাজ : হ্যাঁ, বলেছ...সামেঙ্গান-তুরান-ইরান এক করে--- ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে কি সে-লক্ষ্যেই তুমি চাও তুরানের সেনাপতি হতে?

সোহ্‌রাব : (কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা এনে বলে-) মহাবীর রুস্তমকে পেতে চাই আমি। পিতারূপে আমার পিতাকে চাই। তারপর পিতা-পুত্র মিলে ওই দুই সম্রাটের হাত থেকে মানুষগুলোকে মুক্তি দিতে চাই। চাই আমার মায়ের মুখে প্রাণ খোলা হাসি এনে দিতে। ভাঁড়ের হাসিতে তুমি যে কান্না আড়াল কর, তাকে আমি মুছে দিতে চাই।

সামে-রাজ : (মুখে ম্লান হাসি এনে-) আর ওই কুমারী নার্গিস?

সোহ্‌রাব : তৈরী হোক নার্গিস সোহ্‌রাবের ভবিষ্যৎ হয়ে।

(বলেই বেরিয়ে যায় সোহ্‌রাব; অন্যদিক দিয়ে আসে রাজপুরুষ)

সামে-রাজ : মন্ত্রী এসেছ? দাও, মন্ত্রণা দাও কিছু।

রাজপুরুষ : (কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মত বলে-) কি সম্পর্কে?

সামে-রাজ : কি সম্পর্কে? তা তো জানা নেই! মস্তবড় যে সমস্যা- তার সমাধান, তোমার তো প্রশ্নই ওঠে না, কারো জানা নেই। বাকী রইল রাজ্যের ছোটখাটো কোন---

রাজপুরুষ : না না রাজন, তেমন সমস্যা কোন---

সামে-রাজ : (বেরাবরের সেই পরিহাস-তরল কণ্ঠে-) নেই! তাহলে ভালই আছি বলতে হয়। বুঝলে- ক্ষুদ্র রাজ্যের এই-ই হল মস্ত সুবিধা, বিশেষতঃ তুরানের মত যদি বন্ধু রাজ্য থাকে। আমাদের ভালমন্দ যত কিছু সমস্যাদি- সমাধান করছে তুরান। আমাদের শুধু রাজা-মন্ত্রী হয়ে অভিনয় করা। সোহ্‌রাব বসে বসে কাল কাটাচ্ছিল, নিয়ে যাচ্ছে সেনাপতি করে! ভাল উপার্জনও হবে, সুনাম কুড়াবে। তুরানের সেনাপতি- কত তার মর্যাদা!

রাজপুরুষ : কিন্তু রাজন, আমরা যে সোহ্‌রাবকে হারালাম!

সামে-রাজ : হারালাম কি হে? ছোট নদী, সাগরের সঙ্গে মিশে বিরাটের স্পর্শ পেলাম। এটাই তো মহা গৌরব!

www.pathagar.com

রাজপুরুষ ঃ কি জানি রাজন, হয়তো বা তা-ই... বুঝতে পারি নি!

সামে-রাজ ঃ আসলে কি জান? হারালাম বলে প্যান্ প্যান্ করা
তোমাদের রোগ। তোমরা অসুস্থ। আমার সুস্থতা
লক্ষ্য কর। রাণীজি ছিলেন- স্তব্ধ হল হৃৎপিণ্ড!

(নিজের মাথায় হাত লাগিয়ে বলেন)

কালো কেশে ভরা ছিল মাথা- প্রায় সব শেষ, ব্যস্।
তাই বলে আমি 'রাণীজিকে হারালাম, চুলগুলো
হারালাম' বলে হা হুতাশ করেছি কখনো? ওই
সোহ্‌রাবও তুরানে যাবে- যাক, হা হুতাশ নেই!

(বলে আপন মনেই হাসতে থাকেন)

রাজপুরুষ ঃ যেভাবেই কথাটা বোঝান, যতই হাসুন, জানি-
আপনার হাসির গায়ে কান্নার ছোঁয়া লেগে আছে!

সামে-রাজ ঃ আরে আরে! শেষতক তুমিও যে কবি হয়ে গেলে!

(আবার হেসে ওঠেন)

যাও, নিজের যা কাজকাম আছে তাতে মন দাও।
আর নার্গিসকে...এই তো নার্গিস নিজেই হাজির।

(নার্গিস আসে, চলে যায় রাজপুরুষ)

তারপর মহারাণী! চাঁদ মুখে হাসি নেই কেন?

(মুখে ম্লান হাসি এনে নার্গিস বলে-)

নার্গিস ঃ আসমানে এত কালো মেঘ- অকারণে হেসে হেসে
সেই মেঘ সরাতে পারলেন কই!

সামে-রাজ ঃ (হঠাৎই মুখভাব করুণ হয়ে আসে) চেষ্টা করেও
পারলাম না নার্গিস। সোহ্‌রাব তুরানে যাবেই!
তোমাদের তারুণ্যকে কিছুতেই বুঝতে পারি না।

নার্গিস ঃ চলুন আম্মার কাছে।

সামে-রাজ ঃ (আনমনেই আঁতকে ওঠেন) কেন?

নার্গিস ঃ (মনের কষ্ট জোর করে চাপা দিয়ে) দেখতে বিদায় দৃশ্য!

(সঙ্গে সঙ্গে নার্গিসের হাত ধরে সর্বহারার মত বেরিয়ে যান সামেঙ্গান-রাজ।—ওদিকে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে যাবার জন্য কিছুটা এগিয়ে ফিরে তাকিয়ে হাসিমুখে হাত তুলে বিদায় নেয় সোহ্‌রাব। তাহ্‌মিনা ম্লান হাসি মুখে এনে হাত তুলে নির্বাক দাঁড়িয়ে। নার্গিসসহ সামেঙ্গান-রাজ এ দৃশ্যই দেখেন নীরবে)

www.pathagar.com

তৃতীয় পর্ব

(স্বল্পালোকিত কক্ষে সারিয়া একা বসে আছে। নার্গিস কাছে আসে)

নার্গিস ঃ আম্মা কোথায়?

সারিয়া ঃ (অলিন্দ দেখিয়ে) ওই যে ওখানে।

নার্গিস ঃ (অলিন্দের কাছে গিয়ে ফিরে এসে) কি যেন ভাবছেন।

(সারিয়া অলিন্দের কাছে যায়। অলিন্দে দাঁড়িয়ে চিন্তামগ্ন তাহ্‌মিনা। তাহ্‌মিনার চোখে ভাসে আগেকার দৃশ্য- সোহ্‌রাব আবেগভরে কথা বলছে, শুনছে তাহ্‌মিনা)

সোহ্‌রাব ঃ মহাবীর পিতা, সী-মোরগ আঁকা তাঁর ঢালে! তিনি
সীস্তানে কি না- তা জানি না। সীস্তান- পিতৃভূমি সেই
সীস্তান! যেখানে নদীর নাম হেল্‌মান্দ্‌, যেখানে
হ্রদ যির্‌রা, হাসুন্‌। নদী-হ্রদে খেলা করে কত
মাছ-প্রাণী! কত পাখী সহসাই সেই জলে ডুব
দিয়ে ভেসে ওঠে। উড়ে চলে যায় এদিকে ওদিকে!

তাহ্‌মিনা ঃ পিতার কথাই শুধু ভাবছিস সোহ্‌রাব? আমি...
আমি তোর কেউ নই?

সোহ্‌রাব ঃ (চোখেমুখে ভাবান্তর হয়) কেউ নও? আমার জীবন
তুমি! জন্মদায়িনী তুমি সোহ্‌রাবের অস্তিত্ব, মা!
মা, মাটি আর মাটির মানুষ- সকলেরই জন্য
এই সোহ্‌রাব!

তাহ্‌মিনা ঃ (ছেলেকে ধরে) কিন্তু সোহ্‌রাব, আমার যে ভয়...

সোহ্‌রাব ঃ তোমার এ ভয়টাকে দূর করে দিতে চাই আমি।
অপেক্ষা করো, দেখবে- সহসাই পিতা-পুত্র মিলে
সামেঙ্গানে আসছি তোমার কাছে, আমার মায়ের কাছে।

(এ দৃশ্য মিলিয়ে যায়। তাহ্‌মিনার কানে ভেসে আসে- কাছে থেকে ঘোড়ার ছুটে চলার শব্দ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। সচকিত হয়ে ওঠে তাহ্‌মিনা)

(ওদিকে অন্য কক্ষে নার্গিসের সঙ্গে কথা বলছেন সামেঙ্গান-রাজ)

সামে-রাজ ঃ বুঝলে হে মহারাণী! সর্বদাই কানে ভেসে আসে
অশ্বখুর-ধ্বনি।

www.pathagar.com

নার্গিস ঃ (পরিহাসের কণ্ঠে) কত বড়বীর! তাই রণক্ষেত্রে
কখন কি করেছেন, তার স্মৃতি সর্বদাই জাগে!

সামে-রাজ ঃ আমি তো হামেশাই চিন্তাবিহীন হাসিখুশী থাকি,
তাই রণক্ষেত্রে আমিও যে একজন মহাবীর-
শৌর্যে-বীর্যে অতুলন, সকলেই এটা ভুলে গেছে।
আজকের তরুণেরা মহাবীর হয় কেউ কেউ,
তবে যুদ্ধের কৌশল তেমন জানে না।

নার্গিস ঃ (রাজার কথা শুনে মুখের হাসি চেপে বলে—) কৌশলের
নমুনাটা শুনি!

সামে-রাজ ঃ (উৎসাহের সঙ্গে) ধর, তুমি আমি দু'পক্ষের দুই
মস্ত মহাবীর। যুদ্ধে আগোয়ান। তোমার-আমার
বিশালবাহিনী পেছনে দাঁড়ানো। কি হয়, কি হয়-
থমথমে ভাব। আমরা দু'জন এগিয়ে এলাম।
পরস্পর বকাঝকা করলাম। কে কাকে সহজে
নিঃশেষ করে দেব- কণ্ঠ চড়িয়ে তা-ও বললাম।
তারপর সৌজন্যের রীতি অনুসারে দু'জনের
দু'হাতের তালু মিলালাম। এইভাবে।

(দু'জন দু'জনের হাতের তালু লাগিয়ে দেখান)

নার্গিস ঃ (বহুকষ্টে নিজের হাসি দমন করে বলে-) তারপর?

সামে-রাজ ঃ তারপর? সম্পূর্ণ পেছন ফিরে দে দৌড় দে দৌড়।
এই দৌড়ে বিজয়ী যে মহাবীর, যুদ্ধে জয়ী তিনি।

(নার্গিস হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে। সামেঙ্গান-রাজও সে-হাসিতে যোগ দেন। তারপরই নীরবতা- দু'জনের মুখই করুণ হয়ে ওঠে)

নার্গিস ঃ সোহ্‌রাবের কাছে এই যুদ্ধটা জীবনের খেলা!
এ-খেলায় জয়ী হতে সোহ্‌রাব পিছ পা' হবে না!

সামে-রাজ ঃ জানি, জানি রে নার্গিস! কিন্তু তুরানের অভিপ্রায়?
সেটা কি? শুধু উদারতা, অথবা ষড়যন্ত্র কোন!

(দু'জনের চোখেই জিজ্ঞাসা)

(একটা পাহাড়ী অঞ্চলে দাঁড়িয়ে কথা বলছে গুলরুখ ও বেহ্‌যাদ। দূর থেকে ঘোড়ার ছুটে আসার শব্দ। কাছে এসে ঘোড়া থামে)

গুলরুখ ঃ কে আসছে?

www.pathagar.com

বেহ্‌যাদ ঃ (লক্ষ্য করে নিয়ে) দূত। ··· বীর সোহ্‌রাব ···

দূত ঃ তুরান বাহিনী নিয়ে বীর সোহ্‌রাব ধাবমান
আমু দরিয়ার পানে।

বেহ্‌যাদ ঃ (ব্যগ্র কণ্ঠের জিজ্ঞাসা) মহাবীর রুস্তম কোথায়?

দূত ঃ ইরানের অধিপতি কায়কাউসের ব্যবহারে
ক্ষুব্ধ সেই প্রৌঢ় বীর এখন কোথায়- জানা নেই।
হয়তো বা পরিচয় অজানায় রেখে আশে পাশে
কোন শিবিরে আছেন।

বেহ্‌যাদ ঃ (খুবই অস্থিরতার সঙ্গে) যাও, অদূরে অপেক্ষা কর।

(দূত চলে যায়)

শাহ্‌যাদী, আমাকেও যুদ্ধে যেতে হবে।

গুলরুখ। ঃ (বেহ্‌যাদের হঠাৎ সিদ্ধান্তে বিস্মিত হয়ে) যুদ্ধে যাবে!

বেহ্‌যাদ ঃ গুলরুখ, তুরানের পক্ষ হয়ে ইরানের পথে
সোহ্‌রাবের যুদ্ধ অভিযান- নেতৃত্ব দিয়ে তাকে
ইরানে প্রেরণ- সব, সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যাবে,
ইরানের পক্ষে যদি রুস্তম না থাকে!

গুলরুখ ঃ (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেহ্‌যাদের দিকে তাকিয়ে) কথাগুলো···
মনে হয়, সব কিছু অকল্যাণে ঘিরে আছে যেন!
তাহলে কি ষড়যন্ত্রে আপতিত বীর সোহ্‌রাব?

বেহ্‌যাদ ঃ শাহ্‌যাদী, কর্তব্যের ক্ষণ বয়ে যায়।

গুলরুখ ঃ (ত্বরিতে ভেবে নিয়ে সিদ্ধান্তে এসে বলে—) বেহ্‌যাদ।
তুমি জান, সামেঙ্গান রাজকন্যা তাহ্‌মিনা-সখী,
বান্ধবী আমার?

বেহ্‌যাদ ঃ (প্রায় আনমনে) জানি।

গুলরুখ ঃ (ক্ষোভে প্রায় ভেঙ্গে পড়ে) বান্ধবীর পুত্র সোহ্‌রাব
মায়ের একক আশা।

বেহ্‌যাদ ঃ (অস্থির কণ্ঠে বলে ওরে) কি প্রশ্ন তোমার?

গুলরুখ ঃ (শাহ্‌যাদী প্রভুত্বসূচক কণ্ঠে বলে ওঠে) বেহ্‌যাদ!
খুলে বল, কোন্ অভিপ্রায়ে সামেঙ্গান-রাজপুত্র
তুরানের সেনাসহ প্রেরিত ইরানে?

বেহ্‌যাদ ঃ (প্রভুত্বসূচক কণ্ঠে দ্বিধান্বিত হয়ে বলে—) শাহ্‌যাদী!

গুলরুখ ঃ এইমাত্র বলছিলে-- ইরানের পক্ষে মহাবীর

www.pathagar.com

রুস্তম না থাকেন যদি-- সবই ব্যর্থ হবে, কেন?

বেহ্‌যাদ : আমি নিরুত্তর।

গুলরুখ : (কিছুটা আঁচ করে) বেহ্‌যাদ, রণাঙ্গণে যেতে চাও,
যাও। কিন্তু মনে রেখো- সর্বনাশ ঘটে যদি কোন,
বান্ধবীর জীবনের আলো যদি নিভে যায়, যদি
হীন কোন ষড়যন্ত্র কার্যকরী হয়, তবে জেনো-
তুরানের শাহী মহলেও বিপর্যয় অনিবার্য।

বেহ্‌যাদ : আনবে কে বিপর্যয়?

গুলরুখ : (ইস্পাত দৃঢ়কণ্ঠে বলে-) আমি, তুরানের শাহ্‌যাদী।

বেহ্‌যাদ : গুলরুখ! আমি শুধু নিমিত্তের ভাগী, আজ্ঞাবহ
সম্রাটের। বলবার থাকে যদি কিছু, শুনবেন
তুরানের সম্রাট আফ্রাসিয়াব, বেহ্‌যাদ নয়।

(বলেই চলে যায় বেহ্‌যাদ)

গুলরুখ : চলে গেল! তাহলে তাহ্‌মিনার ভাগ্যাকাশে কোন ...

(আকাশে গুড়গুড় মেঘ গর্জন হয়। চিন্তাক্লিষ্ট দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকায় গুলরুখ। - ওদিকে অলিন্দে দাঁড়িয়ে তাহ্‌মিনাও ভীত-বিহ্বল দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকায়। মেঘের গর্জন উচ্চতর হয়।- অন্য কক্ষে সামেঙ্গান-রাজ নার্গিসকে কাছে নিয়ে উদ্বিগ্নভাবে শুনছিলেন মেঘ-গর্জন। তা কমে এলে তিনি বলেন-)

সামে-রাজ : নার্গিস, গর্জন থেমে গেছে!

নার্গিস : (সোহ্‌রাবের জন্য ব্যাকুল কণ্ঠে) আর সেই রণাঙ্গণে?

(সামেঙ্গান-রাজ ম্লান হাসি মুখে এনে কাছে টেনে নেন নার্গিসকে)

(ওদিকে আমু দরিয়ার তীরে এখনো ভোর হয় নি। প্রায়ান্ধকারে হেঁটে যাচ্ছে সোহ্‌রাব। - শিবিরাভ্যন্তরে আধো-ঘুমে প্রৌঢ় সেনাপতি পিরানবিসা। পদশব্দ শুনে বিছানায় উঠে বসে পিরানবিসা। শিবিরে একটা আধারে জ্বলছে নিভু নিভু আগুন)

পিরানবিসা : কে? কে তুমি শিবিরে? এখনো আমু দরিয়ার তীরে
হয় নি প্রভাত! কথা বল। দুঃসংবাদ কোন, কিংবা ...

সোহ্‌রাব : আমি সোহ্‌রাব!

গিরানবিসা : (আগুনটা বাড়িয়ে) সোহ্‌রাব! সূর্যের উদয়-ক্ষণ

www.pathagar.com

এখনো অনেক দূরে!

সোহ্‌রাব ঃ (আগুনের কাছে গিয়ে) জানি, এখনো ভোরের বাকী।

পিরানবিসা ঃ বস। কি এমন হল যাতে···

সোহ্‌রাব ঃ (চিন্তামগ্ন সোহ্‌রাব বলে যায়) একটা আরযু আছে।

(পিরানবিসা সোহরাবের দিকে তাকায়)

আপনি জানেন– আমি সাধ্যমত অস্ত্রের সেবায়
তুরানের সম্রাটকে হয়তো বা সন্তুষ্ট করেছি।

পিরানবিসা ঃ তাই তুমি ইরানীয় অভিযানে বিশিষ্ট নায়ক!

সোহ্‌রাব ঃ এটাও জানেন– মহাবীর রুস্তম আমার পিতা।

(পরানবিসা নীরবে সম্মতি জানায়)

আমার প্রস্তাব ঃ দুই বাহিনীর মুকাবিলা থাক।
পরিবর্তে তার– ইরানের কোন বীর আর আমি
দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিয়োজিত হই। আমাদের হারজিত
দুপক্ষের হারজিত বলে গণ্য হবে।

পিরানবিসা ঃ (প্রস্তাবের কারণটা অনুধাবন করে বলে–) সোহ্‌রাব।
এভাবেই পেতে চাও পিতার সাক্ষাৎ? কিন্তু তিনি
রণক্ষেত্রে আসেন নি ইরানীয় বাহিনীর সাথে!

সোহ্‌রাব ঃ আপনি শুধু দেয়া–শর্তে প্রস্তাব পাঠান। ইরান
এ–সোহ্‌রাবের শৌর্য–কথা জানে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে কেউ
আসবে না। শুধু সেই মহাবীর, যেখানে থাকুন,
হাজির হবেন এসে ইরানের মর্যাদা রক্ষায়।

পিরানবিসা ঃ আসলেও হিতে যদি বিপরীত হয়?

সোহ্‌রাব ঃ (মুখে ম্লান হাসি এনে বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে) কোন দুঃখ
থাকবে না তাতে। জীবন তো মৃত্যুরই পূর্বরূপ!

(মুহূর্তে আবেগময় হয়ে ওঠে সোহ্‌রাব)

নায়ক পিরানবিসা! স্বপ্ন দেখি আমি, পিতা–পুত্র
মিলনের স্বপ্ন দেখি রোজ! অপরূপ যুদ্ধ–সাজে
আমি সোহ্‌রাব সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর। আর তিনি
অপার বিস্ময়ে বীরপুত্রকে চিনে বুকে নিচ্ছেন
বিপুল গৌরবে!

(বেহ্‌যাদ এসে শিবিরের বাইরে দাঁড়ায়)

পিরানবিসা ঃ (উপায়ান্তর না দেখে) শান্তিকালে সীস্তানে যাবে না তবে?

www.pathagar.com

সোহ্‌রাব ঃ সশস্ত্র সমরে যাব, একা। জানি, পিতা আসবেন।

পিরানবিসা ঃ হৃদয় আমার আশঙ্কায় ভরা, কালো ছায়া যেন
যুদ্ধক্ষেত্র ঘিরে নামে। সোহ্‌রাব তোমার বয়সী ...

সোহ্‌রাব ঃ পিতৃতুল্য সমর-নায়ক! আমার প্রার্থনা ...

পিরানবিসা ঃ (আশঙ্কাকে কোন রকমে দমন করে বলে—) কিন্তু ...
একক যুদ্ধের জন্য সম্রাটের অনুমতি চাই।

(শিবিরাভ্যন্তরে ঢোকে বেহ্‌যাদ)

বেহ্‌যাদ ঃ সেই অনুমতি সম্রাটের হয়ে আমিই দিলাম।

পিরানবিসা ঃ মহামানী বেহ্‌যাদ!

বেহ্‌যাদ ঃ (পিরানবিসাকেবলে—) সম্রাটের প্রতিনিধি আমিই এখানে।

পিরানবিসা ঃ সোহ্‌রাব! পূর্ণ হোক উদ্দেশ্য তোমার।

বেহ্‌যাদ ঃ (সম্রাটসুলভ ভঙ্গিতেই বলে ওঠে বেহ্‌যাদ) পূর্ণ হোক!

পিরানবিসা ঃ দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য এ আরযী তোমার- মনযুর!

সোহ্‌রাব ঃ (সোল্লাসে) নায়ক পিরানবিসা!

বেহ্‌যাদ ঃ (সোল্লাসে বলে ওঠে ওঠে বেহ্‌যাদ) সোহ্‌রাব!!
(ভেসে আসে তুরানী বাহিনীর সমবেত কণ্ঠের উল্লাস—) জয়
সোহ্‌রাব!!

(সামেঙ্গান প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে ছোট একটা অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। অগ্নির পাশে নিবিষ্ট মনে বসে আছেন সামেঙ্গান-রাজ। অদূরে দাঁড়িয়ে তাহ্‌মিনা, সারিয়া ও নার্গিস। সামেঙ্গান-রাজের অদূরে দাঁড়িয়ে রাজপুরুষ। সামেঙ্গান-রাজ দেখছেন আগুনের ওপাশে যুদ্ধ-সাজে দাঁড়িয়ে সোহ্‌রাব।— ইরানী শিবিরের সম্মুখে কথা বলছে সেনানায়ক ফেরাবুর্য ও যুয়ারা। দূর থেকে ভেসে আসছে তুরানী বাহিনীর ঘোষণা— "সোহ্‌রাব! সোহ্‌রাব!!")

যুয়াবা ঃ ফেরাবুর্য! এ যে দেখি তুরানের দাম্ভিক আহ্‌বান!

ফেরাবুর্য ঃ প্রতিযোগী আহ্‌বান যুয়ারা। উচ্চশির নত হবে
যদি তা গ্রহণে আজ ব্যর্থ হয় ইরান-বাহিনী।

যুয়ারা ঃ কেন, ব্যর্থ হবে কেন?

ফেরাবুর্য ঃ (কিছুটা অস্থিরতার সঙ্গে) সোহ্‌রাবে মুকাবিলা করে-
কোথায় এমন বীর ইরানীয় বাহিনীতে আজ?

যুয়ারা ঃ তাহলে কি—গুদুর্য কোথায়? কেন তাকে দেখছি না?

www.pathagar.com

ফেরাবুর্য : প্রস্তাব শুনেই তিনি বেরিয়ে গেছেন–হয়তো বা রুস্তমের খোঁজে!

যুয়ারা : (উল্লসিত কণ্ঠে বলে–) রুস্তম! মহাবীর সেই রুস্তম!!

(পিঠে হাত রেখে যুয়ারাকে ভরসা যোগায় ফেরাবুর্য–)

(ওদিকে একটি ঘোড়ার দ্রুত ছুটে আসার শব্দ শুনে নিজের শিবির থেকে বেরিয়ে আসে প্রৌঢ় রুস্তম। ঘোড়া থামে। ডাকতে ডাকতে ত্রস্তপায় কাছে আসে গুদুর্য)

গুদুর্য : রুস্তম! মহাবীর রুস্তম!

রুস্তম : (বন্ধুকে চিনে উল্লসিত কণ্ঠে) ও! বন্ধু গুদুর্য! তুমি!!

(দুইজন আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়)

কতদিন পরে দেখা!

গুদুর্য : (তেমনি আবেগের সঙ্গে) কতদিন পর!

রুস্তম : (শিবিরাভ্যন্তরের দিকে হাত বাড়িয়ে) এস, এস।

(দু'জনে শিবিরে প্রবেশ করে)

খোশ আমদেদ। খবর কি? বস।

গুদুর্য : (মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায়) বসার সময় নেই।

রুস্তম : কেন? আমার খিমায় এসে তুমি বসবে না? খানাপিনা আনন্দ...

গুদুর্য : (বন্ধুর মুখোমুখি হয়ে) না, এসময় আনন্দের নয়। এক মহা প্রয়োজনে প্রার্থী আমি তোমার খিমায়।

রুস্তম : না বসেই বলবে তা?

গুদুর্য : (বন্ধুর দিক থেকে ফিরে) নিশ্চয় জান– তুরানী আর ইরানী বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি?

রুস্তম : (গুদুর্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে) শুনেছি তা।

গুদুর্য : নায়ক পিরানবিসা দম্ভ ভরে দ্বৈরথ যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছে। তুরানী তরুণ সোহ্রাব– নাম তার হয়তো শুনেছ! রণক্ষেত্রে সোহ্রাব তুরানের পক্ষ হয়ে আসছে একাকী।

রুস্তম : (কৌতূহল ভরে গা'ছাড়া ভাবে বলে–) তাই নাকি?

গুদুর্য : মুকাবিলা করে তার– ইরানীয় বাহিনীতে আজ কে আছে এমন বীর? তোমার সকল শৌর্যের

www.pathagar.com

বীরত্ব গরিমা যেন মূর্তিমান সোহ্‌রাবে!

রুস্তম ঃ (সায় দিয়ে আর কণ্ঠে পরিহাস নিয়ে) বটে!

গুদুর্য ঃ সোহ্‌রাব যেন সেদিনের তরুণ রুস্তম!

রুস্তম ঃ (বেশ কিছুটা উত্তেজিত কণ্ঠেই বলে ওঠে) বটে!

গুদুর্য ঃ সোহ্‌রাব সিংহ-হৃদয়, বীরত্বে তুলনাহীন,
সূর্য-তেজে গরীয়ান বীর।।

রুস্তম ঃ (উত্তেজিত, কিন্তু সংযত কণ্ঠে) ধন্য তার জন্মদাতা!

গুদুর্য ঃ সোহ্‌রাব তারুণ্যে প্রখর। বয়োবৃদ্ধ ইরানের
বীরবৃন্দ যত। প্রতিযোগী আহ্বানের উত্তরে
সকলের দৃষ্টি আজ রুস্তমের প্রতি।

রুস্তম ঃ (এবার পুরোপুরিভাবে পরিহাসের কণ্ঠে) তাই নাকি?

গুদুর্য ঃ স্বাভাবিক নয়?

রুস্তম ঃ (অবহেলা ভরে) ইরানের বীরবৃন্দ যদি আজ
সত্যি বৃদ্ধ, রুস্তম তো আরো বৃদ্ধ, যুদ্ধ থেকে দূরে!

গুদুর্য ঃ সব সত্য, তবু তো কথার শেষ এখানেই নয়!

রুস্তম ঃ সম্রাটের বাহিনীতে আছে কত বীর। তবু আজ
সোহ্‌রাবে যুদ্ধে দিতে রুস্তমের প্রয়োজন কেন?

গুদুর্য ঃ প্রয়োজন সম্রাটের নয়, প্রয়োজন ইরানের।
ইরানের মর্যাদার চেয়ে বড় হবে অভিমান?

রুস্তম ঃ নয় বন্ধু, নয়- অভিমান নয়। এটা অভিযোগ।

গুদুর্য ঃ নিরর্থক নয় অভিযোগ। প্রত্যুত্তরে আমি কেন,
নির্বাক সমগ্র ইরান!

রুস্তম ঃ (ঔদাসীন্য ভরা কণ্ঠে) অস্তে যাবে এক সূর্য,
পুনরায় হবে এক নব-সূর্যোদয়। চিরকাল
এই রীতি। এই রীতি মানব না কেন? জান বন্ধু,
জান? সোহ্‌রাবের কথা শুনি। অন্তরে সাধ জাগে
সোহ্‌রাব যদি আমারই সন্তান হত!

গুদুর্য ঃ (রুস্তমের ভাবালুতায় বিস্মিত হয়ে বলে-) রুস্তম!
বীরের হৃদয়ে এত কাব্য-চিন্তা কেন?

রুস্তম ঃ (ভাবালুতার সঙ্গে করুণ সুরও যুক্ত হয় বলে-) কাব্য-চিন্তা?
না না, এ শুধুই সাধ! পুত্র তো নেই! দূর সামেঙ্গানে
শুধু কন্যা এক! বীরশ্রেষ্ঠ রুস্তমের আওলাদ-

www.pathagar.com

উত্তরাধিকারী কই?

গুদুর্য : (সান্ত্বনার সুরে বলে-) কন্যাও তো সন্তান রুস্তম!

রুস্তম : কন্যা যদি পুত্র হত, আমি জানি- সেও হত ওই
সোহ্‌রাবেরই মত গরীয়ান। বীরত্ব-গৌরবে
সেই হত দ্বিতীয় রুস্তম।

গুদুর্য : (রুস্তমের হাত ধরে বলে-) সকলের সব আশা
পূর্ণ কি হয় রুস্তম?

রুস্তম : (হতাশাব্যঞ্জক কণ্ঠে) হয় না তা জানি বন্ধু, জানি।

গুদুর্য : তবে?

রুস্তম : (আনমনে) চাঁদের সুষমা নিয়ে, রূপের মাধুরী নিয়ে
সামেঙ্গান-রাজকন্যা তাহ্‌মিনার মত কন্যাটি
এক ফালি চাঁদ! কিন্তু তাতে রুস্তমের কিবা লাভ?
বীরশ্রেষ্ঠ রুস্তমের জন্য চাই সূর্যের গরিমা!

গুদুর্য : তাহলে রুস্তম, নারীর মতই খিমার আড়ালে
'পুত্র নেই' এই দুঃখে কাটাবে সময়? আর ওই
তুরানের সোহ্‌রাব ইরানের উচ্চ মর্যাদাকে
হেয় নত করে অবজ্ঞার হাসি হেসে ফিরে যাবে
বিজয় গৌরবে?

রুস্তম : (উত্তেজিত হয়ে) যাবে, যাক। আমার কি তাতে বল?

গুদুর্য : রুস্তমের কিছু নয় তাতে? ইরানের অপমান
রুস্তমের অপমান নয়?

রুস্তম : (তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে) নয় বন্ধু, নয় নয়!

গুদুর্য : কেন নয়? ইরান-গৌরব তুমি, সকল কালের
তুমি বীরশ্রেষ্ঠ বীর।

রুস্তম : (হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠে) এই কথা সম্রাটের নয়।

গুদুর্য : ইরানের মানুষের এই কথা, সকলের কথা।

রুস্তম : জানি এটা নীতি-বাক্য, শুধু মন ভোলাবার ছল।

গুদুর্য : ছল-কথা নয়। সকলে বিশ্বাস করে- ইরানের
গৌরব-আকাশে স্থির সূর্যসম চিরকাল তুমি!
আর কেউ নয়, আর কেউ নেই, শুধুই রুস্তম!

(যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে ওঠে রুস্তম। গুদুর্য তা-ই চাইছিল এতক্ষণ)

রুস্তম : রুস্তম, রুস্তম! আমি যেন শুধু মাত্র প্রাণহীন

www.pathagar.com

শৌর্য এক গাদা, বীরত্বের এক নিষ্ফল রূপ!

গুদুর্য ঃ নিষ্ফল এক গাদা শৌর্যমাত্র নও তুমি রুস্তম!
গৌরবমুখর এক শৌর্য-প্রেরণা তুমি। তাই-
কি চেয়েছ, পেয়েছ কি...সে-হিসাব মিলাবার মত
সাধারণ তুমি নও!

রুস্তম ঃ (সংযত কণ্ঠেই বলে-) সে-হিসাব মিলাব না আমি?

গুদুর্য ঃ সে-হিসাব মিলাবে না তুমি। রুস্তমের অবস্থান
বহু উর্ধে। তাই বন্ধু, কত কিছু না দিয়ে তোমাকে
কত কিছু নিয়ে যেতে প্রার্থী হয়ে আসি। মহাবীর!
প্রতিদ্বন্দ্বী বিনা তুরানের সোহ্‌রাব যদি আজ
ফিরে যায়, দুনিয়ার মানুষেরা বলবে না তবে-
রুস্তম বীরত্বে কৃপণ? শৌর্য-খ্যাতি সঞ্চয় করে
শুধু কৃপণের মত?

রুস্তম ঃ (উত্তেজিতকণ্ঠে) না, না!!

গুদুর্য ঃ (উত্তেজিত করার লক্ষ্যে) দুনিয়া কি বলবে না-
তরুণের কাছে যদি বীর-খ্যাতি খর্ব হয়ে যায়
সেই ভয়ে রুস্তম কাতর?

রুস্তম ঃ (সিংহের মত গর্জে ওঠে) আ- না!! কারো শৌর্য-ভয়ে
রুস্তম কাতর নয়। জঙ্গের প্রান্তরে চিরদিন
রুস্তম নির্ভীক। চিরদিন রুস্তম সিংহ-হৃদয়।

গুদুর্য ঃ রুস্তম সিংহ-হৃদয়।

রুস্তম ঃ (পূর্বের মতই বলে যায়) বীরত্বের হীন কৃপণতা
জানে না রুস্তম।

গুদুর্য ঃ (উল্লসিত ভাবে) জানে না, জানে না!!

রুস্তম ঃ (রুস্তম এখন যেন উত্তেজনার ক্রীড়নক) গুদুর্য, গুদুর্য!
এই রাত্রি শেষে জানবে দুনিয়া- রুস্তমের কাছে
প্রতিদ্বন্দ্বী- বয়োবৃদ্ধ কিংবা তরুণ, সিংহ-শাবক
কিংবা শালপ্রাংশুদেহী- তুচ্ছ, অতীব নগণ্য সবে!

গুদুর্য ঃ মারহাবা মহাবীর, মারহাবা! শৌর্য-সিংহ তুমি
চিরশ্রেষ্ঠ বীর এ রুস্তম!

রুস্তম ঃ (হঠাৎ শান্ত কণ্ঠে বলে-) তবে শুধু এক শর্তে।

গুদুর্য ঃ এক শর্তে?

www.pathagar.com

রুস্তম ঃ (আনমনে) রণক্ষেত্রে রুস্তমের নাম উচ্চারিত হবে না কখনো। রুস্তমের পরিচয়ে নয়- কোন মর-জীবনের যোদ্ধার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে রুস্তম অংশ নিয়েছিল, বিশেষতঃ এক তরুণের সাথে, দুনিয়া তা জানবে না।

গুদুর্য ঃ (খুশীতে সম্মত হয়ে বলে—) তাই হবে বন্ধু, তাই হবে।

(রুস্তম নিজের বর্মটাকে চেপে ধরে)

আজ আমার কী যে উল্লাস! যে কোন নামেই হোক, তরুণ সোহ্‌রাবে যুদ্ধ দানিবে রুস্তম! রুস্তম!!

(গুদুর্যের উল্লাস)

(সামেঙ্গান। তৈজসপত্র পড়ে যাওয়ার ঝন্‌ঝন্ শব্দে চমকে ওঠেন সামেঙ্গান-রাজ)

সামে-রাজ ঃ নার্গিস!

(ত্রস্তপায় আসে নার্গিস)

নার্গিস ঃ (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) দাদু। রাজা!

সামে-রাজ ঃ (নার্গিসের কাছে গিয়ে) কি যেন কি ভাঙল রে নার্গিস?

নার্গিস ঃ ভেঙেছে তৈজসপত্র। পড়ে গেছে।

সামে-রাজ ঃ (অকারণ শঙ্কাটাকে ঢাকতে বলেন) শব্দটা হঠাৎ বুকে এসে লাগল রে!

নার্গিস ঃ (কি যেন ভেবে নিয়ে) বুকটাকে শক্ত কর দাদু!

(নার্গিস সামেঙ্গান-রাজের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়)

(রণাঙ্গনের একাংশে দাঁড়িয়ে সোহ্‌রাব, পিরানবিসা, বেহ্‌যাদ ও অন্যান্যরা)

পিরানবিসা ঃ ওই আসে, ওই- ইরানের মহাবীর।

(রুস্তম ধীর ও দৃঢ় পায় এগিয়ে আসছে)

বেহ্‌যাদ ঃ (দূরে রুস্তমকে দেখে নিয়ে বলে ওঠে) সোহ্‌রাব!

পিরানবিসা ঃ সময় আগত সোহ্‌রাব!

সোহ্‌রাব ঃ (দেহমনে বীরের দৃঢ়তায়) আমি, আমিও প্রস্তুত।

(দৃঢ়পায় অগ্রসর হয় সোহ্‌রাব। অদূরে সৈন্যদের জয়ধ্বনি-"সোহ্‌রাব, সোহ্‌রাব"-সোহরাবকে আসতে দেখে আপন মনে বলে রুস্তম-)

রুস্তম ঃ সোহ্‌রাব! ধীর, তবু দৃঢ় পায় আসছে যে- ওই

www.pathagar.com

সোহ্‌রাব? খুবই তরুণ, বড় কচি-কচি মুখ!
দীর্ঘ ঋজু দেহ, শালপ্রাংশু- যেন রূপের কুমার!

সোহ্‌রাব : স্বাগত হে বীরশ্রেষ্ঠ।

রুস্তম : (মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে) সুস্বাগত। সোহ্‌রাব তুমি?

সোহ্‌রাব : আমি সোহ্‌রাব। (সোহ্‌রাবও মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে রুস্তমকে)

রুস্তম : (প্রশংসার দৃষ্টিতে) এতটা তরুণ! এই মৃত্যু ভরা
রণক্ষেত্রে কেন সোহ্‌রাব? এই পৃথিবীটা বড়
স্নিগ্ধ মধুর। কিন্তু মৃতের কবর অন্ধ শীতল।

(রুস্তমের ভাবান্তর হয়। নিজেকে দেখিয়ে বলে-)

রক্তাক্ত কত যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় আমি নির্ভীক।
পরাজয় জানি না কখনো, শত্রু ফিরে নি জীবিত।
সোহ্‌রাব, তুমি এ মৃত্যুর পথে ছুটে এলে কেন?

(মুগ্ধ দৃষ্টিতে রুস্তমকে দেখছিল সোহ্‌রাব)

সোহ্‌রাব : আমারি পোষিত স্বপ্ন এতদিনে সম্মুখে আমার!!

রুস্তম : শোন সোহ্‌রাব, তুরানী শিবির ছেড়ে চলে এস
ইরানে, আমার কাছে। পুত্রসম যুদ্ধ কর তুমি
আমার পতাকা তলে। ইরানে সোহ্‌রাব নেই। একি,
কি দেখছ নির্নিমেষ চোখে সোহ্‌রাব?

সোহ্‌রাব : (সোহ্‌রাব যেন কি এক স্বপ্ন ঘোরে বলে ওঠে) আপনাকে।
বীরদেহ, গর্বোন্নত ওই শির, অর্ধ-পক্ক কেশ,
শক্তি-সংহত কণ্ঠ...আপনিই কি বীরশ্রেষ্ঠ সেই
রুস্তম?

রুস্তম : (চমকে) আমি রুস্তম? এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি।

(রুস্তম পুরোপুরি বদলে যায়; পিতৃত্বের লেশমাত্র নেই। হয়ে যায় এক মহাবীর শুধু)

চেহারায় এত মনোহর, তবু এত মিথ্যাশ্রয়ী
ধূর্ত অহঙ্কারী। রণসাধ বুঝি রুস্তমের সাথে?
তা-ও তুমি আশা কর? তারুণ্যের অহঙ্কারে আর
উচ্চকণ্ঠ ধূর্ত স্পর্ধায় মৃত্যুকে করেছ আহ্বান!
তাই যুদ্ধ দাও, আর অহঙ্কারী মুখে মেখে নাও
পরাজয় কলঙ্ক-কালিমা।

সোহ্‌রাব : (সোহ্‌রাবও তেমনি বলে ওঠে) সোহ্‌রাব, পরাজয়-

www.pathagar.com

দু'টি শব্দ একসাথে উচ্চারিত হয় নি কখনো।
বয়োবৃদ্ধ হলে জানি শক্তি ও বাক্যের ভারসাম্য
নষ্ট হয়ে যায়।

রুস্তম ঃ (ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে-) উদ্ধত যুবক! রেখে যাও আজ
আমু দরিয়ার তীরে অহঙ্কারী দেহ। ভেসে যাবে
গ্রীষ্মের জোয়ারে। (অস্ত্র চেপে ধরে)

সোহ্‌রাব ঃ (দৃঢ় হাতে অস্ত্র ধরে) নন যদি মহাবীর রুস্তম-

(অস্ত্রে অস্ত্রে আঘাতের শব্দ)

(সামেঙ্গানের প্রাসাদ-কক্ষে আলো-আঁধারিতে কথা
বলছেন সামেঙ্গান-রাজ ও নার্গিস। দু'জনের
দৃষ্টিতেই চরম উদ্বিগ্নতা)

সামে-রাজ ঃ নার্গিস!

নার্গিস ঃ (সঙ্গে সঙ্গে) রাজন!

সামে-রাজ ঃ (আরও কাছে গিয়ে) তুই সত্য শুনেছিস?

নার্গিস ঃ (আবেগে সামেঙ্গান-রাজের হাত ধরে বলে-) সত্য, সত্য।
আম্মা তাঁর সহেলিকে বলেছেন--

সামে-রাজ ঃ (তবু যেন এ কথা রাজার বিশ্বাস হয় না) রুস্তমজানেন-

নার্গিস ঃ জন্মেছিল পুত্র নয়, কন্যা।

সামে-রাজ ঃ (মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়) এক কন্যা জন্মেছিল!!

(সামেঙ্গান-রাজের কানে ভেসে আসে এলোমেলো-বিশ্রী শব্দ)

(রণাঙ্গনে শিবিরের সামনে দাঁড়িয়ে পিরানবিসা। হামান আসে)

হামান ঃ নায়ক পিরানবিসা!

পিরানবিসা ঃ (স্বপ্নোত্থিত কণ্ঠে বলে-) কে? বন্ধু হামান- এস, এস।

হামান ঃ আজকের দ্বন্দ্বযুদ্ধ মীমাংসাহীন। তবু বলব-
অতুলন শৌর্য সোহ্‌রাবের!

পিরানবিসা ঃ (নিজেও তা-ই ভাবছিল যেন) হ্যাঁ, তুলনাবিহীন।
ইরানীয় বীর নাজেহাল হতে হতে বেঁচে গেল।
কিন্তু হামান, কে ওই বীরশ্রেষ্ঠ? নয় কি রুস্তম?

হামান ঃ আমি নিশ্চিত- ইনি রুস্তম।

পিরানবিসা ঃ (চিন্তাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে-) রণক্ষেত্রে বেহ্‌যাদ
ছুটে এল কেন? বেহ্‌যাদ চায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ হোক।

www.pathagar.com

হামান ঃ চায় না সে ওঁরা পরিচিত হোক।

পিরানবিসা ঃ (চিন্তার শেষে সিদ্ধান্তে এসে গিয়ে) ষড়যন্ত্র-জাল।

(তখনই সেখানে আসে বেহ্‌যাদ)

বেহ্‌যাদ ঃ সম্রাট আফ্রাসিয়াব চান না···কখনো রাজনীতি
বাহিনীতে আলোচিত হোক। দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলাকালে
সোহ্‌রাব একা রবে নিজের শিবিরে। (চলে যায়)

হামান ঃ (নিজেদের মধ্যেকার আলাপে শঙ্কিত হয়ে) বেহ্‌যাদ-

পিরানবিসা ঃ চলে গেল হুকুম জানিয়ে।

হামান ঃ (বিষণ্ণ কণ্ঠে বন্ধুকে ডাকে-) নায়কপিরানবিসা!
ওই দুই মহাবীর সম্রাটের দুই চক্ষুশূল।

পিরানবিসা ঃ ওরা চায়, রুস্তম অথবা সোহ্‌রাব ধ্বংস হোক।

(অন্ধকার নামে।—ওদিকে সামেঙ্গান-প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে তাহ্‌মিনা দেখছে- চাঁদকে ঘিরে ধরছে এসে একটা কালো মেঘ)

(সৈন্যদের কোলাহলে রণাঙ্গন অশান্ত। তুরানী বাহিনীর জয়ধ্বনি। মাটিতে শায়িত রুস্তমের গলা ধরে আছে সোহ্‌রাব, ডান হাতে তার উদ্যত খঞ্জর)

রুস্তম ঃ সোহ্‌রাব তুমি প্রাণ নিতে পার, ইচ্ছা কর যদি।
কিন্তু মানো যদি ইরানের সুপ্রাচীন যুদ্ধ-রীতি···

সোহ্‌রাব ঃ সুপ্রাচীন যুদ্ধ-রীতি?

রুস্তম ঃ (রুস্তমের চোখে ছলনা) প্রথমে যে পরাজিত, তাকে—
তাকে হত্যা করা ইরানের রীতি নয়।

সোহ্‌রাব ঃ (বিস্মিত হয়েও কি ভেবে নিয়ে ছেড়ে দেয়) দিলামসুযোগ।

(রুস্তম উঠে দাঁড়ায়)

যাও বীর, কাল ভোরে রণক্ষেত্রে শেষ ফলাফল!

(মাথা প্রায় নত করে রুস্তম চলতে গিয়ে ফিরে তাকায় সোহ্‌রাবের দিকে।... শিবির সম্মুখে অস্থির পিরানবিসা ও হামান)

হামান ঃ মিথ্যা কথা, এ শাঠ্য ছলনা। জয়ী ছিল সোহ্‌রাব।

পিরানবিসা ঃ এই যুদ্ধ-রীতি ইরানে কখনো নেই ও ছিল না।

(দু'জন দু'জনের দিকে তাকায়)

(সামেঙ্গানের প্রাসাদ-কক্ষে অস্থির দিশাহারা তাহ্‌মিনা, পাশে সারিয়া। বাইরে ঝড়ো হাওয়া)

www.pathagar.com

তাহ্‌মিনা : একটি ভুলের বিন্দু দেখা দিল এত মেঘ হয়ে?

(আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়)

সহেলি সারিয়া, চল, পরে নিই পুরুষের বেশ।
অশ্ব সাজাতে বল। অস্ত্র নাও হাতে। (অস্ত্র হাতে নেয়)

সারিয়া : (এই পরিস্থিতিতে কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে বলে-) তাহ্‌মিনা!

তাহ্‌মিনা : কার সাধ্য মায়ের এ বুক থেকে ছেলে কেড়ে নেয়?

সারিয়া : তাহ্‌মিনা!

তাহ্‌মিনা : (উন্মত্ত কণ্ঠে) কার সাধ্য, কার??

সামে-রাজ : (ব্যস্ত হয়ে ডাকতে ডাকতে আসেন) তাহ্‌মিনা! তাহ্‌মিনা!!

(আকাশে বজ্রপাত হয়)

(রণাঙ্গন। সৈন্যদের কোলাহল, জয়ধ্বনি)

রুস্তম : জীবনের শেষ যুদ্ধ এই! সোহ্‌রাব, হয় তুমি
নয় আমি--সহ্য কর ইরানীর শেষ অস্ত্রাঘাত!!

(বাইরে জয়ধ্বনি--"রুস্তম, মহাবীর রুস্তম!"
সোহ্‌রাব চমকিত)

সোহ্‌রাব : কে, কে? রুস্তম!!! আ--(অস্ত্রাঘাতে পড়ে যায় সোহ্‌রাব)

রুস্তম : (পৈশাচিক উল্লাসে বলে-) এই তোর মরণ-আঘাত!

(শিবির সম্মুখে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে হামান ও
পিরানবিসা। ... এদিকে পতিত সোহ্‌রাব ভগ্নকণ্ঠে বলে--)

সোহ্‌রাব : এটা অন্যায়। এর প্রতিফল তুমি নিশ্চয় পাবে।

রুস্তম : প্রতিফল দেবে কে?

সোহ্‌রাব : (মৃত্যু-কাতরকণ্ঠে) দেবেন আমার পিতা রুস্তম।

রুস্তম : বারবার কি বলছ তুমি? আমি নিজেই রুস্তম।
আমার তো কোন পুত্র নেই!

সোহ্‌রাব : (মৃত্যু-কাতর মুখে বিস্ময়) তুমি বীরশ্রেষ্ঠ পিতা!!

রুস্তম : না না না, পুত্রহীন রুস্তম। সামেঙ্গানে এক কন্যা-

(নিজ বাহু বাড়িয়ে ধরে সোহ্‌রাব)

সোহ্‌রাব : এই দেখ, আমার বাহুতে বাঁধা কার নামাঙ্কিত
এ-কবচ? এটা কার?

রুস্তম : (কবচ খুলে নিয়ে দেখে) আমারই তো! কিন্তু তাহ্‌মিনা-

www.pathagar.com

(ঝড় ওঠে আকাশে।... নির্বাক রুস্তম সোহ্‌রাবের দিকে তাকিয়ে আছে।– এদিকে ঝড়ের মাঝেই নিজ কক্ষে ব্যাকুল কণ্ঠে ডেকে ওঠে তাহ্‌মিনা–)

তাহ্‌মিনা ঃ সোহ্‌রাব!!

(ঝড়ের মাঝেই ঘোড়ার ছুটে আসার শব্দ এসে থামে। ডাকতে ডাকতে সেই কক্ষে আসে গুলরুখ), পেছনে সামেঙ্গান–রাজ)

গুলরুখ ঃ (তাহ্‌মিনাকে) সব শেষ!

সামে–রাজ ঃ (তাহ্‌মিনার কাছে গিয়ে) ওরে তাহ্‌মিনা! মা আমার!!

(তাহ্‌মিনাকে ধরে নির্বাক দাঁড়িয়ে আছে সারিয়া, গুলরুখ ও নার্গিস। কক্ষের এক কোণে নির্বাক দাঁড়িয়ে সামেঙ্গান–রাজ। ততক্ষণে ঝড় থেমে আসে। ... রণক্ষেত্র। সূর্য উঠেছে। বিপর্যস্ত রুস্তম মৃত পুত্র সোহ্‌রাবকে নিজ কাঁধে বহন করে এগিয়ে যাচ্ছে নবোদিত কিন্তু কুয়াসাচ্ছন্ন সূর্যটার পানে।... তাহ্‌মিনা অলিন্দে গিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। সামেঙ্গান–রাজও মেয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। তাঁদের চোখে ভাসে-- শস্যহীন ফাটা–ফাটা মাটি...)

www.pathagar.com

গল্প শোন

গল্প শোন। এমন এক
বীর সেনানীর গল্প এটা,
যুদ্ধ যিনি করেছিলেন
কলম দিয়ে। কার বিরুদ্ধে?
যারা ছিল এই বাঙলার
স্বাধীনতা হরণকারী;
যারা ছিল ওই বিদেশী
বেনিয়াদের দালাল-দোসর;
যারা ছিল জন্-মানুষের
মান-ইয্যত খেলাফকারী;
সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার
ধারক এবং বাহক রূপে
উপন্যাসে, কাব্য-গাথায়
মুসলমানদের হেয় করে
যারা ছিলেন 'মহামানব'!
যুদ্ধে ওরা সবাই ছিল
ওই সেনানীর বিপরীতে
প্রবল-প্রতাপ প্রতিপক্ষ।

সেই সেনানীর জন্ম কোথায়?
পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে,
আঠার শ' আশি সালের
তেরই জুলাই। নাম ছিল তাঁর
ইসমাইল হোসেন, সৈয়দযাদা।
সিরাজগঞ্জের সন্তান, তাই
সিরাজী তাঁর নামের ভূষণ।
আব্বা সৈয়দ আব্দুল করিম,
আম্মা বেগম নূর-ই-জাহাঁ।
সিরাজগঞ্জেই লেখাপড়া;
তার পরে তো বাকী জীবন
নিজের জাতির উন্নয়নে
কলম-কালির যুদ্ধ শুধু।

এই যে জাতির বীর সেনানী-
তাঁরও তো এক শৈশব ছিল।
সে-শৈশবে ছোট্ট বালক
সিরাজী তার মায়ের মুখে
গল্প শোনে। মা-কে প্রশ্ন ঃ
দেশের মানুষ গরীব কেন?
মায়ের উত্তরঃ সেসব কথা
দুঃখ-দিনের রূপকথা যে!
একদিন তো সবই ছিল-
সোনার বাঙলা, হাসিগানে
সুখী স্বদেশ এ বাঙলাদেশ!
সেদিন তো এই দেশটিতে
সকল মানুষ স্বাধীন ছিল --
তারপরই দেশটা জুড়ে
সর্বনাশা দুর্যোগ এল।
ধনের লোভে বিদেশ থেকে
বণিক-দস্যুর জাহাজ এল;
জাহাজভরা সৈন্য এবং
অস্ত্রশস্ত্র সবই এল।
ভিড়ল জাহাজ ঘাটে ঘাটে।
বণিক-দস্যু লক্ষ্য করে-

www.pathagar.com

কোথায় কোন্ গোপন স্থানে
শয়তানদের লীলা-খেলা,
কোথায় কার সর্বনাশের
ষড়যন্ত্র সঙ্গোপনে!

বিদেশের ওই দানবেরা
অতি অল্পেই খুঁজে পেল
এদেশীয়শয়তানদেরে।
শয়তানেরাও বিদেশীদের
দালালীতে মহাখুশী!
ষড়যন্ত্র পাকা হল।
তারই ফলে পলাশীতে
নবাব সিরাজ পরাজিত।
ইংরেজ হল এইনা দেশের
জানমালের হর্তাকর্তা।
অল্প দিনে এই দেশটার
রীতিনীতি সব কিছুই
বদলে গেল। এই বাঙলায়
চালু হল নতুন শাসন।
সৃষ্ট হল ইংরেজদের
আরও দালাল- নয়া নূতন
জমিদার আর বুদ্ধিজীবী।
সর্বদিকে বাঙলা হল
ইংরেজদেরই পদানত।

মাস পেরিয়ে বছর গেল,
বছর গিয়ে শতবর্ষ।
হরেক রকম শোষণ আর
লুটতরাজে এই বাঙলার
মানুষ হল সর্বহারা।
এই ব্যাপারে দালালেরা
ইংরেজদেরবন্ধু-সাথী।

অন্যদিন তার আব্বা বলেনঃ
শুধু কি ওই বণিক-দস্যু
এবং তাদের দালালেরা?
তাদের সাথে জুটল এসে
সাহেব-মেম পাদ্রীরা সব।
সর্বহারা জনগণের
মাঝে তারা ঘুরে বেড়ায়-
মিষ্টি কথায় বোঝায় তাদেরঃ
বাজে ধর্ম ছাড় সবাই।
খৃষ্টধর্ম বহুত ভাল,
গ্রহণ কর। দেখবে তখন
তোমাদের সব দুঃখ-দৈন্য
দূরে যাবে, সুখের পথে
পা' বাড়াবে। এমনি করে
পরাধীন এ জাতির ভাগ্যে
নামল রাতের গহীন আঁধার।
নিজের বলে গর্ব করার
কিছুই তাদের রইল না আর।

দিন বয়ে যায়, বছর গড়ায়।
স্কুল-ছাত্র ইসমাইল হোসেন-
গুরুজনদের জিজ্ঞাস করে ঃ
পরাধীন এই জাতির ভাগ্য
বদলে দিতে এলেন না কেউ?
উত্তর শোনেঃ এসেছিলেন।

www.pathagar.com

সেই পলাশীর পরে পুরা
এক শ' বছর ধরে সে কি
জীবন-মরণ মুক্তি-প্রয়াস!
সংগ্রামীদের বুকের রক্তে
লাল হয়েছে দেশের মাটি।
মীর কাশিম ও টিপু সুলতান,
মজনু শাহ্ আর ফকিরেরা-
সন্ন্যাসীরা, শমশের গাজী,
তিতুমীর ও শরী'তুল্লাহ্,
আরও কত, কত যে নাম,
কত শহীদ, কত আলেম,
হিন্দু-মুসলিম যোদ্ধা কত,
কত শত বীর মুজাহিদ-
স্বাধীনতা ফিরে পেতে
প্রাণ দিয়েছে অকাতরে!
অবশেষে আঠার শ'
সাতান্ন আর আটান্নতে
জন-জোয়ানদের অভ্যুত্থানে
আকাশ-বাতাস উঠল কেঁপে।
ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে
দেশপ্রেমিকের তাজা রক্তে
লেখা হল দেশ-মুক্তির
রক্তস্নাত মহাপ্রয়াস।
সে-প্রয়াসও ব্যর্থ হল।
দেশের বুকে বসল জেঁকে
ইংরেজ আর দালালেরা।

ক্রমে ক্রমে তরুণ মনে
স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগে।
ক্রমে ক্রমে তরুণ মনে
নতুন সত্য কথা বলে।
কি সে সত্য, নতুন সত্য?
ইংরেজরা এক শ' বছর
এদেশটাকে শাসন আর
শোষণ করেই যায় নি শুধু।
সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির
বিষ ঢুকিয়ে মনগুলোকে
চরমভাবে বিষিয়ে দিল।
বিষাক্ত এ সাম্প্রদায়িক
মনের যারা, তাদের কথাঃ
মুসলিম রাজ্য ধ্বংস করে
ইংরেজের এ রাজ্য শাসন
বিধাতারই মহান আশীষ।
দালাল শ্রেণীর হিন্দুদেরে
ইংরেজেরা মন্ত্র দিলঃ
মুসলমানের সঙ্গে আবার
এক-জাতিত্বের কথা কেন?
দেশ শাসনের যোগ্য হলেই
হিন্দুদেরে এই দেশটার
হর্তাকর্তা বানিয়ে দিয়ে
ইংরেজ তো চলেই যাবে।
এই মন্ত্রই জপ করে
চলল নতুন দালালেরা।

তার ফলে এই দাঁড়াল-
একই দেশে ক্রমে ক্রমে
দেখা দিল দু'টি জাতি।
একটি জাতি সুযোগভোগী,
আর অন্যটি সুযোগহারা।
মুসলমানরা হয়ে গেল

www.pathagar.com

সুযোগহারা অন্তর্ভুক্ত।
শিক্ষা-দীক্ষা অর্থবিত্ত
জীবন-চর্চার সর্বদিকেই
মুসলমানরা অন্ধকারে।
অন্ধকারের মানুষেরা
ভুলেই গেল নিজ পরিচয়,
ভুলে গেল ইতিহাস আর
নিজ ঐতিহ্যের সকল কথা।

নিজের জাতির এই যে দশা-
তার অবসান করবে কারা?
সহসাই তার মনে হল-
অন্ধকারের বুকে যেন
আলোর আভাস! তাহলে কি
সুপ্তি ভেঙে জাগরণের
চলছে প্রয়াস জাতির মাঝে?
জাগরণের আযান ধ্বনি
শোনা যাচ্ছে? - শোনা যাচ্ছে!
ওই তো ডাকেন আমীর আলী,
খোদা বক্‌স্ ও আবদুল লতিফ,
মেহেরুল্লাহ্ এবং ওই
আফগান বীর জামালুদ্দীন!
অন্ধরাতের নিশিজাগর
তারকারা ওই যে ডাকেন!!

এই তো সময়, ভোরের আকাশ
রক্তিমাভ! এই তো সময়
জাগরণের, মুক্তি-যুদ্ধের!
তৈরী হলেন বীর সেনানী।
নিজের জাতির মুক্তি-লক্ষ্যে
এ-জীবন তাঁর উৎসর্গীত!
কলম-যুদ্ধে তিনি হলেন
দুঃখ-দিনের নকীব- নেতা।
চলল বীরের বিরামবিহীন
অনলবর্ষী লেখমালা।
উপন্যাসে, কাব্য-গাথায়,
প্রবন্ধে আর প্রচারণায়
তিনি হলেন অজেয় বীর।

অস্ত্রশস্ত্রের যুদ্ধ ক্ষেত্রেও--
হ্যাঁ, সেখানেও গিয়েছিলেন।
তুরস্কেতে বলকান ফ্রন্টে-
উনিশ শত বার সালে
যুদ্ধাহত সৈনিকদের
সেবাকার্যে রত হলেন।
ফিরে এলেন তুর্কী-রাজের
'গাজী' খেতাব ভূষণ করে।
আমরা জানি- গাজী তিনি
তাঁর জীবনের সকল দিকেই!

তোমরা যখন বড় হবে
খুঁজে খুঁজে জেনে নিয়ো
এই সেনানীর অনেক কথা।
কত যে তাঁর কীর্তি-গাথা।
স্বল্পকালের জীবন-কথার
সকল কথাই জেনে নিয়ো।

www.pathagar.com

।বায়ান্ন।

রাত্রির চোখে ঘুম নামে
নামে ঘুম নামে
নামে ঘুম নামে।
দিগন্ত ছেয়ে ওই–
ঘনবন ছেয়ে ওই
ঘুম নামে
নামে ঘুম নামে
নামে ঘুম নামে।।
হিমেল হিমেল রাতে চম্পাবতীর কেশে
ঘুমায় মনের ভাষা।
আকাশের পারে জেগে রয় কত
চাঁদিনী রাতের আশা।
একটি ঘুমেল হাত
খুঁজে পেয়ে আন হাত
যেন থামে
থামে যেন থামে
থামে যেনথামে।।
বনান্তে নীড়ে ওই
শুকশারী জাগে ওই
শেষ যামে
ধীরে উষা নামে
ধীরে উষানামে।।

www.pathagar.com

।তিপ্পান্ন।

ঘুম জড়ানো গাঁয়ের ধারে
কাজলা নদীর বাঁকের পারে
আমার দেশের সূর্য ওঠে ওই!
শিশির ঝরা ধানের ক্ষেতে
সোনা রোদের আঁচল পেতে
মনে বনে প্রভাত আসে ওই!!
জাগে পাখী, কিষাণ জাগে
না'য়ের পালে বাতাস লাগে
ঝিকিমিকি অনুরাগে জাগে নদীর পানি,
রাখালিয়া গানে গানে
কার নয়ানে স্বপ্ন আনে
দখিনায় বাঁশীর তানে হয় যে জানাজানি।।

কোথায় জাগে রাত্রি কারও
বহুদূরে, দূরে আরও—
স্বপ্নলোকের প্রান্ত ছুঁয়ে ওই!!

।চুয়ান্ন।

আমার দেশের আকাশ নামে হিজলতলীর গাঁয়।
মেঘের তরী নোঙর ফেলে শান্ত-শীতল ছায়।।
মাঠে ঘাটে অস্তবেলার শতেক অনুরাগে,
পায়ে চলার পথে পথে স্বপ্ন-স্মৃতি জাগে।
ঘরে ঘরে মাটির পিদীম জাগে মৃদুল বায়।।
আমার দেশের ঘরে ঘরে
মায়ের অবুঝ মন,
সন্তানেরই কল্যাণাশায়
জাগেসারাক্ষণ।।
দোয়েল কোয়েল কতই পাখী সেই না আমার দেশে
সকাল-সন্ধ্যা গান গেয়ে যায় চারণেরই বেশে।।
কত নদীর সাতনরী হার তার বুকে জড়ায়।।
আমার দেশের আকাশ নামে হিজলতলীর গাঁয়।

www.pathagar.com

।পঞ্চান্ন।

ও আমার দেশ, আমার দেশের মাটি!
প্রাণের চেয়ে দামী সে যে সোনার চেয়ে খাঁটি।।
দুঃখে-সুখে তোমার বুকে
আমার যত খেলা,
এই শ্যামলেই জমে কত
আশার স্বপ্ন-মেলা।
তোমার বুকেই কান্নাহাসির যায় এ জনম কাটি'।।
আমার দেশের মাটি।
ছায়া ঢাকা পাখী ডাকা চিরশ্যামল বেশ,
মাঠে মাঠে সোনা ফলায় সে যে আমার দেশ!!
যুগে যুগে বুলবুলিতে
গেল রে ধান খেয়ে,
যুগে যুগে এই মাটিতে
বর্গী এল ধেয়ে।
তবু তোমার বুকে সাজাই স্বপ্ন পরিপাটি।।
আমার দেশের মাটি।
স্বপ্ন যদি ভাঙে তবু ভাঙে না তো আশা।
আঁধার পারে আলোর পাখী বাঁধবে আপন বাসা।।
ঘুমের ছেলে জাগবে আবার
পাড়া জুড়াবে না,
শোধিবে তার আপন জনের
অন্ধ রাতের দেনা।
মুক্ত ভোরে হাসবে এ দেশ আঁধার যাবে কাটি'।।
আমার দেশের মাটি।

www.pathagar.com

ছাপ্পান্ন।

মায়ের মতই বক্ষ-সুধার নির্যাস দিয়ে তুমি,
লালন করেছ এই দেহখানি হে মোর জন্মভূমি।
ভরেছ জীবন শত কামনায়
হাসি গানে আর স্নেহ-সুষমায়,
ফুলে ফলে ভরে সাজায়ে রেখেছ জীবনের মৌসুমী।।
মায়ের মতই তুমি যে আমার
আল্লা'র রহমত,
মায়ের মতই আযাদী তোমার
সুমহান আমানত।।
তাই তো দেশের পুণ্য মাটিতে
রচি ইতিহাস বক্ষ-শোণিতে,
মরণ-বিজয়ী মুজাহিদ আমি সত্যের পথ চুমি'।।

।সাতান্ন।

কোথায় তুমি সুপ্তি মগন আলোর লগন এল।
রাতের পাখী জাগল নীড়ে আঁখি তোমার খোল।।
মেঘে মেঘে আকাশ ছাওয়া
ঝড় বুঝি ওই আসে,
প্রাণে প্রাণে নতুন চাওয়া
ঝড় বুঝি ওই আসে!
নতুন দিনের সূর্য ওঠার এবার সময় হোল।।
ঈষাণ কোণে বৈশাখী মেঘ
ডাকছেই গুড়ু গুড়ু,
তরীর পালে হাওয়ার মাতন—
যাত্রার ক্ষণ শুরু!
উত্তাল ঢেউ মত্ত মাতাল, এবার নোঙর তোল।।
অনেক অন্ধ রাতের কান্না
মিশেছে উদাস বায়,
অনেক প্রাণের শত উচ্ছ্বাস
ডেকে গেছে নিরালায়!
দিগন্তে দিন ডাকছে এবার, দ্বিধা-সঙ্কোচ ভোল।।

www.pathagar.com

বাঁশী

বাংলাদেশের মনমাতানো লোক-গীতিকার কথা ও সুর যে অঞ্চলের আকাশবাতাস মুখর করে রাখে, বন-কোয়িলার কুহু ধ্বনি যে অঞ্চলের মন-কোয়িলাকে উন্মনা করে, যে অঞ্চলের অবুঝ বাঁশী মানুষকে করে ঘরছাড়া, সে অঞ্চল ময়মনসিংহের অঞ্চল, মোমেনশাহীর অঞ্চল। এ অঞ্চলে যেমন পাহাড় আছে, তেমনি আছে সায়রসম হাওর। সেই অঞ্চলের এক পালাগান-- বুদ্ধু নামের এক পাহাড়ী হাজং কবিয়াল আর মঙ্গলনাথ নামের এক হাওরী ভিখারী কবিয়াল যার নাম দিলেন 'আন্ধা বন্ধু', আমরা দিলাম তার এক নয়া নাম 'বাঁশী'।

নিরক্ষর নিঃসম্বল গ্রাম্য কবিয়াল যে সুর-লোকের মন নিয়ে এই পালাগান বাঁধলেন, ধরা-লোকের নীতিবান মন নিয়ে এ বাঁশীর সুরকে ধরা যায় না; বড় জোর তাকে অনুভব করা যায় শুধু। সেই অনুভবে সাধারণ মানুষ এ বাঁশীর পরিণতিতে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে পারেঃ কাল তো গরল বাঁশী না বাজিব আর!

*　　*　　*　　*

সেদিন সেই বাঁশীর সুর শোনা যায় পথে পথে। যারা শোনে, তারা কয়-

ভোর গগনে খইরা মেঘ রে সিন্দুর তার গায়।
রাজপন্থে কোন্ বা জনে বাঁশীটি বাজায়!!

বাঁশী বাজায় এক তরুণ অন্ধ ভিখারী। লোকেরা মুগ্ধ হয়ে শোনে, বাঁশরীয়াকে দেখে আর বলাবলি করে-

কাঞ্চন বরণ অঙ্গ তার যেন গোরোচনা।
না দেখ্যাছি অত রূপ কি দিব তুলনা।।

বাঁশী বাজায় অন্ধ ভিখারী আর মনে মনে কয়-

কোন্ বা দেশের ভাইটাল নদী বহিছে উজানী।
পাড় ভাঙ্গান্যা নদীর কূলে ঢেউয়ের কানাকানি।।
ভোর বিয়ানে ডালিম কলি ফুটলো ডালতরা।
কেমুন জানি আসমান জমিন কেমুন চান-তারা।।
কেমুন জানি সোনার দেশে সোনার মানুষ আছে।
তার পরিচয় জানার বাইরে রইলো আমার কাছে।।

বাঁশী বাজায় আর আগাইয়া যায় অন্ধ ভিখারী। আগাইয়া যায় জন্-মানুষের বাড়ীর আঙিনায়, রাজবাড়ীর সামনে। বাঁশী থামায়, ভিক্ষা চায় বাঁশরীয়া-

www.pathagar.com

ভিক্ষা দেও গো গিরহবাসী এই অভাগ্যারে।
খাড়া আছি অন্ধ আমি তোমরার দুয়ারে।।

রাজবাড়ীর অঙ্গনে তখন ভোরের আলো। ভোরের আলো রাজপুরীতে। বাঁশীর সুরে ঘুম থনে জাগে কিশোরী রাজকন্যা। রাজপুরীর ধাই-সাথী রাজকন্যার কাছে আসে, কয়-

শুন শুন রাজার কন্যা কহি যে তোমারে।
কাঞ্চন পুরুষ এক তোমরার দুয়ারে।।
দেখিতে সুন্দর পুরুষ শ্যাম শুকপাখী।
কোন্ বিধাতা করলো তার অন্ধ দুই আঁখি।।
কাঞ্চাসোনা রূপ তার না যায় পাশুরা।
এক নয়ানে ঝরে হাসি আর নয়ানে ধারা।।

রাজকন্যা আপন মনে কয়-

না জানি অন্ধের বাঁশী কিবান যাদু জানে।
মনে হয় ঘরের মন বাইরে টাইন্যা আনে।।

কথাবার্তা চলে রাজকন্যা আর ধাই-সাথীর মধ্যে-

"দেখবে যদি সুন্দর কন্যা চল ত্বরাতরি।
কিবা ভিক্ষা দিবা তারে লও সঙ্গে করি।।"

"কিবা দিব তারে ধাই কও তো আমারে।
এমুন না সুরের বদল কি হইতে পারে!!
সোনার কপাট রূপার খিল রাজার ভাণ্ডার।
বাপের আগে কইয়া লো ধাই খুইল্যা দেও দ্বার।।"

"ধূলা মানিক একই কথা তাতে কিবান আছে।
আগে জান কি দিলে ওই অন্ধের দুখ্ ঘোচে।।"

"দেহে যত সয় লো ধাই অন্তরে না সয়।
কি ধন দিলে কও অন্ধের মন খুশী হয়।।"

"দিবারাত্রি অন্ধের কাছে সকলি সমান।
ওর দুঃখ ঘোচে যদি দিষ্টি কর দান।।"

www.pathagar.com

"শুন শুন ওলো ধাই কহি যে তোমারে।
দুই নয়ান তুইল্যা আমার দিয়া আইস তারে।।"

কিন্তু তা কেমন করে হয়? রাজকন্যার ধাই-সাথী নীরব।

রসিক জন কয় দিলে কি হবে নয়ন।
অন্ধের দুঃখ ঘোচে যদি দিতে পার মন।।

ওইদিকে রাজাও এর মধ্যে-

ঘুম থনে উঠল রাজা বাঁশীর সুর শুনি।
মধুভরা এমুন বাঁশী শুনলো পুনঃপুনি।।
ভোরের বাতাস পাগল হইল ঘরে থাকা দায়।
এমুন কইর‍্যা কেমুন জনে বাঁশরী বাজায়!!

বাঁশরীয়ার খবর আনতে লোক পাঠায় রাজা। ---

খবরিয়া কয়, রাজা শোনেন বিবরণ।
সোনার মানুষ বাজায় বাঁশী পাগল কইরা মন।।

রাজা ক'ন— লইয়া আইস তারে। আইলো যখন অন্ধ ভিখারী, তখন রাজার সঙ্গে চলে তার কথাবার্তা-

"সুন্দর পন্থের মানুষ কহি যে তোমারে।
কোন্ বা দুঃখে বেড়াও তুমি পন্থে পন্থে ঘুরে।।
কোন্ বা দেশে ঘর তোমার কোথায় বসতি।
কে বা তোমার মাতাপিতা কে বা পন্থের সাথী।।"

"বাপ নাই মাও নাই, নাই সোদ্দর ভাই।
তীর্থের না কাউয়ার মতই উড়িয়া বেড়াই।।"

"শুন শুন নবীন পান্থ কহি যে তোমারে।
আইজ হইতে কর বসত এই না রাজ্যপুরে।।
ভিক্ষার ঝুলি ছাড় তুমি ঘরে বইসা খাও।
আইজ হইতে হইলাম আমরা তোমার বাপ-মাও।।
ভরা ভাণ্ডারের ধন দুয়ার থাকবো খোলা।
গলায় পরিবা তুমি মানিক্যের মালা।।

www.pathagar.com

অঙ্গেতে পরিবা তুমি রাজার ভূষণ।
সর্বাঙ্গে গাঁথিয়া দিব রত্নাদি কাঞ্চন।।
মন্দিরে থাকিবা তুমি উত্তম বিছানে।
ঘুম থনে জাগব আমি তোমার বাঁশী শুনে।।
এক কন্যা আছে আমার পরাণের পরাণ।
তাহারে শিখাইবা তুমি ওই না বাঁশীর গান।।
এই দুই কর্ম তোমার আর কিছু না জান।
সকল সুখ পাইবা কেবল নাই সে দুই নয়ান।।
তুমি থাক আমার পুরে।"

রাজার এই ব্যবস্থায় রাজী হয় অন্ধ ভিখারী।... যথা সময়ে পরিচয় হয় রাজকন্যার সঙ্গে।

"যে দেশে জনম তোমার সে দেশের লোকে।
কি নাম রাখিল তোমার, কি বলিয়া ডাকে।।"

"নাম নাই কন্যা আমার থান নাই সংসারে।
পাগল বলিয়া লোকে উপহাস করে।।
পাগল আমার নাম, পাগল আমার বাঁশী।
পন্থে পন্থে গান গাই হইয়া উদাসী।।"

"তোমার বাঁশী শুইন্যা বুঝি মানুষ পাগল হয়!
নাগরিয়া লোকে তোমায় তেই সে করে ভয়!!"

কি উত্তর দিবে অন্ধ বাঁশরীয়া? নিজ কর্তব্যে মন দেয় সে। কয়—
ধর লো কন্যা শিক্ষা ধর।
সুরে সুরে গানের কথা প্রকাশ তুমি কর।।

আরম্ভ হয় অন্ধ আর রাজকন্যার সুরের মায়া সৃষ্টি!—দিনের পর দিন যায়। মাসের পর মাস গড়ায়, বছরের পর বছর। যেখানে চলে এই সুরের শিক্ষা, তার চার পাশে ফুলের বাগান। বাগানে গাছে গাছে অনেক ফুল, ফলের গাছে অনেক পাখী! অনেক পাখীর কুজন! ফুলে ফুলে ভোমরদের গুঞ্জন! কথা কয় অন্ধ বাঁশরীয়া আর রাজকন্যা—

www.pathagar.com

"মানুষ জানি কেমুন কন্যা, কেমুন মুখের হাসি।
শব্দ শুনি নাই সে দেখি মনের দুঃখে ভাসি।।
যেই মুখে চান্দের হাসি না দেখি নয়ানে।
রূপের কথা শুনি আর বুঝি তা ধেয়ানে।।
তরুলতা পুষ্প আমার সামনে বাগান ভরা।
আসমানেতে নিতুই জাগে চান-সুরুজ-তারা।।
সবার উপর তোমার সাড়া অন্তরেতে পাই।
ধেয়ানেতে আছ কন্যা দিষ্টিতে যে নাই।।"

অন্ধ বাঁশরীয়ার এমনি কথায় সাড়া দিয়ে ওঠে রাজকন্যার আকুল মন! কয় রাজকন্যা-

"আমার নয়ানে বন্ধু দেখিয়ো সংসার!
এমতে ঘুচবো তোমার আঁখির আন্ধার!!"

রাজকন্যার কথা শোনামাত্রই অন্ধ বাঁশরীয়ার কানে হাজারো ভোমরের গুঞ্জন! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কাকের কা-কা শব্দ। ভোমর-গুঞ্জন আর নাই। তার কল্পনায় ধরা দেয় নিজের পরিচয়। নিজেকে সামলে নিয়ে কয় বাঁশরীয়া-

"বিধুরা রাজার কন্যা বুইঝ্যা কথা কও।
দুঃখ ভরা ডালা কন্যা মাথায় ক্যান্ লও।।
চিরসুখে আছ কন্যা দুঃখ নাই সে জান।
সরল পন্থ ছাইড়্যা ক্যান্ যাও কাঁটা-বন।।"

কারও বুঝতে বাকী থাকলো না যে, ভালবাসার জালে তারা আজ বন্দী! বাঁশরীয়ার কাছে এই বন্দীত্ব অসঙ্গত মনে হলেও রাজকন্যা যেন তাকে বরণ করতেই ব্যাকুল। বাঁশরীয়ার কথায় কন্যার উত্তর-

"কিসের রাজত্ব সুখ তাহাতে কি হবে।
মনের দাবীরে কও কেবা পুরাইবে।।"

"শান্ত কর রাজকন্যা শান্ত কর মন।
বাঁশীর গান শিক্ষা তোমার হইল সমাপন।।
সাধ কইর‍্যা ক্যান্ কন্যা পর দুঃখের মালা।
না বুইঝাছ কন্যা তুমি পিরীতের জ্বালা।।"

www.pathagar.com

রাজকন্যার মনের অবস্থা রাজার মনেও পষ্ট। কিন্তু... না, এর বিহিত রাজাকে করতেই হবে। অন্ধ বাঁশরীয়া রাজা-রানীর খুবই প্রিয়। কিন্তু...

পুষ্প কাননে ভোমর করে আনাগোনা।
উদ্যানে আসিতে রাজা কন্যায় করে মানা।।
বৈশাখ মাসেতে দেখ গাছে নয়া পাতা।
পুরীতে ঘটক আসে লইয়া নতুন কথা।।

খেলা ঘর ভাইঙ্গা গেল মালা হইল বাসি।
দিনে দিনে ফুরাইলো চাম্পামুখের হাসি।।
ঢোল বাজে ডগর বাজে নাচে ডগরিয়া।
কোন্ দেশের রাজপুত্র কন্যা যায় নিয়া।।
আইজ হইতে রাজার রাজ্য হইল অন্ধকার।
আইজ হইতে পাগল বাঁশী না বাজিব আর।।
"বিদায় দেন রাজ্যের রাজা, বিদায় দেন মা।
কর্তব্যের শেষ হইল, আর থাকব না।।"

"শুন শুন পাগল পান্থ বলি যে তোমারে।
এইখানে বসতি কর আমার রাজপুরে।।
ভাণ্ডারের ধন আছে সুখের নাই সীমা।
বাইরে আছে বাপ সুহৃদ ঘরে আছে মা।।
সুন্দর রাজার কন্যা বিয়া করাইব।
জলটুঙ্গী ঘর এক বানাইয়া দিব।।
শতেক দাসী দিব তোমার সঙ্গতি করিয়া।
সুখেতে রাজত্ব কর এইখানে থাকিয়া।।"

"শুন শুন ওগো রাজা কহি যে তোমারে।
তোমার মত সুহৃদ নাই এ ভব সংসারে।।
আর জন্মের বাপ ছিলা মাও ছিলা রানী।
গুণের যতেক কথা কি কব বাখানি।।
কি করিব রাজ-রাজত্বে হইলাম উদাসী।

www.pathagar.com

ঘরে থাকতে না দেয় মন আমার পাগল বাঁশী।।
রাজা বিদায় দেও আমায়।"

নদীর সোতের মত সময় গড়ায়। বছরের পর বছর যায়। কি করে অন্ধ বাঁশরীয়া?

রাজবাড়ী রাজা-রানী সকলি ছাড়িয়া।
পথে পথে অন্ধের বাঁশী উঠিল বাজিয়া।।
বনে কান্দে পশুপঙ্খী সেই বাঁশী শুনিয়া।
কোন্ অভাগীর ভাবের পাগল দিয়াছে ছাড়িয়া!!
বাজিতে বাজিতে বাঁশী রাজ্য ছাড়াইল।
দূরের কোন্ রাজার দেশে কান্দিয়া উঠিল।।

কোন্ রাজার দেশ? ঘুরতে ঘুরতে এতদিন পরে কোথায় আইলো অন্ধ বাঁশরীয়া?

আরেক রাজ্যের কথা শুন দিয়া মন।
রাজ্যবাসী যতেক লোক ঘুমে অচেতন।।
পাতে ঘুমায় ফুলের কলি পুষ্পেতে ভোমরা।
রাজার বুকে শুয়ে রানী এক ফুলের ছড়া।।
পাহাড় ঘুমায় বন ঘুমায় কেবল জাগে নদী।
আর জাগে বিরহিনী চউক্ষে নাই নিদি।।
হেনকালে অন্ধের বাঁশী উঠিল বাজিয়া।
ডালে ঘুমায় কোইল পঙ্খী উঠিল জাগিয়া।।
ঘরের নারী জাইগ্যা উঠে পাগল বাঁশী শুনি।
মন্দিরে পশিল রাজার ওই না বাঁশীর ধ্বনি।।
"জাগ চন্দ্রমুখী কন্যা কত নিদ্রা যাও।
ভোরের কলি ফুটলো কন্যা আঁখি মেল্যা চাও।।
শুন শুন কিবা বাঁশী কোন্ জনে বাজায়।" ...
"জাইন্যা আইস কেমুন জনে এমুন গান গায়।।"

নীরব রইলা সুন্দর কন্যা দুই আঁখি ঝরে।
অনেক দিনের ভোলা বাঁশী ডাকিছে আমারে!!
বনের বাঁশী নয় তো ইহা মনের বাঁশী হয়।
ছোট কালের যত কথা জাগাইয়া তোলয়!!

www.pathagar.com

এই বাঁশী শুইন্যা ফুটতো কুসুমের কলি।
বন্ধু মোরে শিখাইত মিঠা মিঠা বুলি।।
ভুলি নাই ভুলি নাই বন্ধু তোমার বাঁশীর ধ্বনি।
মনের গহীনে আইজও সেই বাঁশী শুনি!!
কি করিব রাজভোগে সুখ সুবিস্তরে।
বনের পঙ্খী ভইর‍্যা রাখছে সোনার পিঞ্জরে।।

রাজাও জানলো– রাজপথে এক অন্ধের বাঁশী এমনি করে বাজে।... রাজা সংযত হয়। চিন্তা-ভাবনার পরে কয়–

"শুন শুন সুন্দর কন্যা কহি যে তোমারে।
অন্ধেরে কি করবো দান কও তো আমারে।।"

দুই নয়ান ঝুরে কন্যার ধীরে ধীরে কয়।
"দাসীরে তা জিজ্ঞাস করা উচিত না হয়।।
তুমি তো রাজ্যের রাজা রাজ্য দিতে পার।
যাহা ইচ্ছা দিবা তুমি আমায় ক্যান্ ধর।।"
রাজা কয়, "কন্যা তুমি যাহা দিতে কও।
তাহা দিব যদি তুমি তাতে খুশী হও।"
"সত্য কর ওগো রাজা সত্য কর তুমি।"
রাজা কয়, "তিন সত্য করিলাম আমি।।"
নয়ান মুইছ্যা কন্যা কয়, "যদি নহে আন।
ধর্ম সাক্ষী ওগো রাজা আমায় কর দান।।"

আসমানে গুড়ু গুড়ু মেঘের ডাক। কারও মুখে আর কোন কথা নাই। নির্বাক রাজা নতমুখ।

আর এইদিকে? রাত্রি নিশাকালে আসমানে চান্দের আলো। তখন–

বনের নদী উজান বয় তীরে চাম্পা ফুল।
বাজিয়া চলিছে বাঁশী সেই না নদীর কূল।।

হঠাৎ বাঁশী থামে। উৎকর্ণ হয় বাঁশরীয়া। মনে তার জিজ্ঞাসা–

চরণে নূপুর বাজে রুনু ঝুনু ধ্বনি।
বহুদিনের ভোলা শব্দ আইজ কানে শুনি!!

www.pathagar.com

দাণ্ডাইলো অন্ধ পান্থ বাঁশী হাতে লইয়া।
নেউরের শব্দ আমায় কিবান দিল কইয়া!!
অনেক দিনের ভোলা কথা আইজ পড়ে মনে।
স্বপ্নের মত এই সে নেউর বাজতো তার চরণে!!

অন্ধের মনে আর দ্বিধা নাই। এই নেউরের শব্দ যে তার কানে গাঁথা আছে! কয় সে–

"সেই কন্যা যদি গো তুমি খুইল্যা কও কথা।
ক্যান্ বা আইজ জাগলো আবার ভোলা দিনের ব্যথা!!"

"আমি বন্ধু সেই যে সেই কন্যা অভাগিনী।
যার নেউর তোমার কানে বাজে রিনিঝিনি!!"
চমকিত অন্ধ ভাবে– ক্যান্ এমুন হইল।
অল্পবুদ্ধি কন্যা হায় রে কি কাম করিল!!
"শুন কন্যা শুন– তুমি ঘরে ফির‍্যা যাও।
এমুন সুখের ঘর ক্যান্ বা ভাঙ্গাও।।
সোনার থালে খাইবা অন্ন পিন্‌বা পাটের শাড়ী।
আমি হইলাম বনের পঙ্খী তুমি রাজার নারী।।
কন্যা ঘরে ফির‍্যা যাও।"

"বনের শারী নাহি চায় সোনার পিঞ্জরা।
ভোগে কি করিব বন্ধু হইলাম জ্ঞানহারা।।
রাজ্য সুখে সুখ দেহার, মন নাহি চায়।
দেহমন ভিন্ন হইলে পরাণ রাখা দায়।।"

"বান্ধিয়া সোনার ঘর আগুনে না পোড়।
মনেরে সম্বরি কন্যা যাও নিজ ঘর।।"

"সত্য কথা প্রাণবন্ধু কহি যে তোমারে।
তোমার দারুণ বাঁশী থাকতে না দেয় ঘরে।।
বাঁশী হইল গরল জ্বালা বাঁশী হইল কালা।
এই বাঁশী শুনিলে বাড়ে আগুনের জ্বালা।।"

www.pathagar.com

কন্যার কথায় অন্ধ দিশাহারা! কি করবে সে এখন? মুহূর্তে অন্ধ বাঁশরীয়া মনস্থির করে। কয়–

"শুন অল্পবুদ্ধি কন্যা কহি যে তোমারে।
বিসর্জন দিলাম বাঁশী, তুমি যাও ঘরে।।
আর না বাজিবে বাঁশী কানেতে দংশিয়া।
ওই দেখ যায় বাঁশী ঢেউয়েতে ভাসিয়া।।"

কিন্তু ফিরে যাওয়ার জন্য তো কন্যা ঘর ছাড়ে নাই! শক্ত মনের বিশ্বাসে কন্যা কয়–

"বাঁশী নাই তুমি আছ মনের রতন।
আমারে না লও সাথে লইয়া যাও সে মন।।
বন্ধু যে যত বুঝাও–
আমার মনের বুঝ হইয়াছে উধাও।।
সদয় না হইয়া বন্ধু নিদয় যদি হও।
ত্যজিব এ ছার প্রাণী দাণ্ডাইয়া রও।।"

এইবার? এইবার কি উত্তর দিবে অসহায় বাঁশরীয়া?... শেষ সিদ্ধান্ত নেয় সে। কয়–

"অল্পবুদ্ধি কন্যা তুমি ফির‍্যা যাও ঘরে।
আইজ হইতে আমি নাহি থাকিব সংসারে।।
এইখানে দাণ্ডাইয়া দেখ নদীর কত পানি।
নিজ চউক্ষে দেখ্যা নিভাও জ্বলন্ত আগুনি।।"
এতেক বলিয়া অন্ধ ঝাইপ্যা জলে পড়ে।
কন্যা কয়, "পরাণ বন্ধু লইয়া যাও মোরে।।"

আসমান হইতে নদীর জলে তারা যেন খসে।
জোয়ারিয়া গাঙ্গের ঢেউয়ে শাপলা ফুল ভাসে।।

ভাসিতে ভাসিতে দু'য়ে গেল সমুদ্দার।...
কাল তো গরল বাঁশী না বাজিব আর!!
বাঁশী না বাজিব আর!

www.pathagar.com

জীবন বৃত্তান্ত

নাম ঃ এম. ওবায়দুল্লাহ সাহিত্যিক নাম ঃ আসকার ইবনে শাইখ

জন্ম ঃ ৩০ মার্চ, ১৯২৫ সাল জন্ম-জেলা ঃ ময়মনসিংহ

শিক্ষা

১৯৮৩ ঃ পিএইচ. ডি.(সমাজ-পরিসংখ্যান... ডেমোগ্রাফি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫১ ঃ এম. এসসি. (পরিসংখ্যান), পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কর্ম-পরিচিতি

১৯৮৪-'৯০ ঃ প্রফেস্যর, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আই. এস. আর. টি.), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭৮-'৮৩ ঃ পরিচালক, ঐ

১৯৬৭-'৮৪ ঃ সহযোগী অধ্যাপক, ঐ

১৯৫১-'৬৭ ঃ প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা

পি-এইচ. ডি. থিসিসঃ

বিষয় - Incidence of Induced Abortion in Rural Bangladesh

প্রকাশিত নিবন্ধ ঃ

(ক) আন্তর্জাতিক জার্নালে	৫	
(খ) দেশীয় প্রথম শ্রেণীর জার্নালে	৪৪	৪৯
(গ) বিদেশী অর্থ সাহায্যে রিসার্চ রিপোর্ট		১১

থিসিস-তত্ত্বাবধানঃ

(ক) মাষ্টার ডিগ্রীর জন্য	২১
(খ) পি-এইচ. ডি. ডগ্রীর জন্য	১

www.pathagar.com

সাহিত্য–কর্ম (আসকার ইবনে শাইখ নামে)

প্রকাশিত ঃ (ক) সামাজিক নাটক–নাটিকা ১৮

[বিরোধ (১৯৪৭); পদক্ষেপ (১৯৪৮); বিদ্রোহী পদ্মা (১৯৪৯); দুরন্ত ঢেউ (নাটিকা সংকলন, ১৯৫১); শেষ অধ্যায় (১৯৫২); অনুবর্তন (১৯৫৩); বিল-বাওড়ের ঢেউ (১৯৫৫); এপার–ওপার (১৯৫৬); প্রতীক্ষা (১৯৫৭); প্রচ্ছদপট (১৯৫৮); লালন ফকীর (১৯৫৯) ইত্যাদি।

(খ) ঐতিহাসিক নাটক–নাটিকা ৫৬

[অগ্নিগিরি (১৯৫৭); তিতুমীর (১৯৫৭); রক্তপদ্ম (১৯৫৭); অনেক তারার হাতছানি (১৯৫৭); কর্ডোভার আগে (১৯৮০); রাজপুত্র (১৯৮০) ইত্যাদি; এবং **"রাজ্য-রাজা-রাজধানী"** শিরোনামে ১৪টি নাটিকার সংকলন (১৯৮১) ঃ একটি বিশ্বাস; গোরক্ষ–বিজয়; রাজা হরিশ্চন্দ্র; গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস; নির্বাচিত সম্রাট; সিংহাসন; বিদ্রোহী কৈবর্ত; সাগরের ঢেউ; রক্ত গোলাপ; অশ্বারোহী; বিদ্রোহী তুগরল; সুলতান ও সুফী; আযান; ও জাম–জামরুলের স্বপ্ন;

এবং

"মেঘলা রাতের তারা" শিরোনামে ১১টি নাটিকার সংকলন (১৯৮১)ঃ পলাশীর পথে; পলাশী; পলাশীর কান্না; অন্ধ রাতের ডাক; মন্বন্তর; বিদ্রোহ; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; রেনেসাঁ; বাঁশের কেল্লা; ঝড়ের ডাক; ও ঝড়ের রাতে।

তাছাড়া

"কন্যা-জায়া-জননী" শিরোনামে দুই খণ্ডে ৩১টি নারীচরিত্রভিত্তিক নাটিকার সংকলন (১৯৮৭) ঃ নাম–না–জানা মা; কবি রহিমুন্নিসা; নবাব-নন্দিনী যীনাতুন্নিসা; গদীনশীন বেগম; সিরাজ– বেগম লুৎফুন্নিসা; সিরাজ–দুহিতা; ফরহাদ বানু; মন্নুজান; সুলতানা রাজিয়া; চাঁদ সুলতানা; মহিলা–নবাব; বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত; নূরজাহান; শাহ্‌যাদী জাহানারা; বেগম উদয়পুরী; বিজাপুরের বড়ে সাহেবা; শাহ্‌যাদী জেবুন্নিসা; ক্রন্দসী কবি গন্না; বেগম হাসরত মহল ইত্যাদি]

(গ) কিশোর কাব্য–নাট্য ও রূপকথা ৬

[দৃষ্টিফুল (১৯৬২); কন্যা ডালিমফুলী (১৯৬২); বাদুড় (১৯৬৩); মুক্তি অভিনব (১৯৮২); ইত্যাদি]

(ঘ) নবজীবনের গান

(একাত্তর–পূর্ব দেশাত্মকবোধক গানের সংকলন সম্পাদনা, ১৯৫৯) ১

www.pathagar.com

(ঙ) অন্যান্য গ্রন্থ

কালো রাত তারার ফুল	
(ঐতিহাসিক গল্পের সংকলন, ১৯৮২)	১
বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি	
(প্রবন্ধ গ্রন্থ, ১৯৮৬)	১
মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা	
(ইতিহাস গ্রন্থ, ১৯৮৭)	১
বাংলা সাহিত্যের ক্রম-বিকাশ প্রসঙ্গে	
(প্রবন্ধ গ্রন্থ, ১৯৯১)	১
প্রফেস্যর গলব্রেথ, প্রফেস্যর হেইলব্রোনার ও প্রফেস্যর বার্লির ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ, এবং প্রেসিডেন্ট জনসনের লেখা ও বক্তৃতা সংকলনের অনুবাদ (১৯৬১-৬৫)	৫
মোট সংখ্যা ঃ	৯০

অপ্রকাশিত ঃ

সামাজিক ও ঐতিহ্য-ভিত্তিক লোকনাট্য	২৬
প্রাচীন বাংলার উদ্ভব-কথা (সেন আমল পর্যন্ত)	১
বাংলায় ইসলাম (বাংলায় ইসলামের রূপ ও প্রকৃতি)	১
ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত (ইতিহাস গ্রন্থ)	১
স্বাধীন সুলতানী বাঙ্গালার কথকতা	১
অন্যান্য	২

টেলিভিশনে ৩০টির মত নাটক ও ৮টি নাট্য-সিরিজ এবং রেডিও-তে ৫০টিরও বেশি নাটক প্রচারিত। ১৯৪৭ সালে 'বিরোধ' নাটক প্রকাশের মাধ্যমে নাট্যকার হিসাবে আসকার ইবনে শাইখের আত্মপ্রকাশ। তখন থেকে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত নাটক-নাটিকা, দেশাত্মবোধক গানের সঙ্কলন-সম্পাদনা, ইতিহাসের গল্প, ইতিহাস, অনুবাদ ও অন্যান্য প্রবন্ধ-গ্রন্থের সংখ্যা ৯০। সামাজিক, ঐতিহ্য-ভিত্তিক লোকনাট্য, গীতিনাট্য ও অন্যান্য অপ্রকাশিত গ্রন্থ-সংখ্যা ৩২। 'বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি' নামক প্রবন্ধ-গ্রন্থে লেখক পরিচিতি প্রসঙ্গে জনাব তোফা হোসেন বলেন ঃ "- জনাব শাইখ মঞ্চ-রেডিও-টেলিভিশনের জন্য নিয়মিত নাটক লিখে আসছেন এবং নির্দেশনা করছেন। এদেশের মানুষের মন ও মানস, তাদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও চেতনা, তাদের জীবন সংগ্রাম

www.pathagar.com

ও আশা-বাসনার প্রতিফলন তাঁর নাট্যকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি অনলস নাট্যকর্মী। বাংলা নাটকের উন্নয়নে তাঁর অবদান অসামান্য। চারদিকে আজ নাট্য-প্রয়াসের যে শুভ কর্মচাঞ্চল্য বিদ্যমান, তার সূচনাকারীদের প্রধান পুরুষ জনাব শাইখ। পঞ্চাশ দশকের আরম্ভ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বাইরে এবং ৭০ সাল থেকে ৮০ সাল পর্যন্ত স্বগৃহে 'নাট্য একাডেমী' স্থাপন করে তিনি বহু উৎসাহীকে হাতে-কলমে নাট্য বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি একজন সফল অভিনেতাও।"

সাহিত্য পুরস্কার ঃ বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬১), একুশে পদক (১৯৮৬), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পুরস্কার (১৯৮৭), টেনাশিনাস (টেলিভিশন নাট্যশিল্পী ও নাট্যকার সংসদ) পুরস্কার, (১৯৮৯) এবং বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার (১৯৯১)।

ঠিকানা ঃ আসকার ইবনে শাইখ
২৫ গ্রীন কর্ণার, গ্রীন রোড
ঢাকা - ১২০৫
ফোন (বাসা) ঃ ৮৬১৩২০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com